আধুনিক বাংলাদেশের স্থপতি শেখ হাসিনাকে

ডিজিটাল বাংলাদেশের স্বপ্নটা আমার মাঝে যতোই থাকুক, যতো দীর্ঘ সময় ধরেই আমি একে লালন করে থাকিনা কেন, এটি জাতীয় পর্যায়ে আলোর মুখ কখনোই দেখতো না, যদি ১২ ডিসেম্বর ২০০৮ শেখ হাসিনা ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার কথা না বলতেন। তিনি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভানেত্রী না থাকলে সম্ভবত এটি ১১ ডিসেম্বর ২০০৮ অনুষ্ঠিত কার্যনির্বাহী কমিটির সভায় এটি বাতিল হয়ে যেতো। যদি তিনি দেশের প্রধানমন্ত্রী না হতেন তাহলে সম্ভবত বর্তমানের মন্ত্রী, উপদেষ্টা, সচিব ও সরকারের আমলারা কেউ ডিজিটাল বাংলাদেশ শব্দটি উচ্চারণ করতোনা। খুব সঙ্গত কারণেই ডিজিটাল বাংলাদেশ বইটির এই সংস্করণটি তার জন্য নিবেদিত।

রিনকি, তন্বী ও বিজয়

তোমাদের জন্য আমার সন্তানেরা,
আমার এই তিন সন্তানের জন্য একটি ক্ষুধা-দারিদ্র ও বৈষম্য মুক্ত ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তোলা আমার জীবনের শেষ লক্ষ্য। বইটি, বই এর ধারনাটি এবং এর ফলাফল; সবই তোমাদের জন্য।

বেটা সংস্করণ বা দ্বিতীয় প্রকাশের পূর্বকথা

ডিজিটাল বাংলাদেশ বই-এর প্রথম প্রকাশ হিসেবে আলফা সংস্করণ প্রকাশের আগেই এর অধিকাংশ কপি অনলাইনে বিক্রি হয়ে যায়। এ ছাড়াও নির্দিষ্টজনদের কাছ থেকে মতামত পাবার জন্যও বইটির কয়েকশ কপি বিণামূল্যে বিতরণ করা হয়। উপরন্তু বইটির হাজার হাজার কপি অনলাইনে ডিজিটাল ফরমাটে বিতরণ করা হয়। এরই মাঝে খুব দ্রুত পাল্টাতে থাকে দৃশ্যপট। ফলে শীঘ্রই এর বেটা সংস্করণ প্রকাশ অনিবার্য হয়ে ওঠে। এরই মাঝে তথ্যপ্রযুক্তি নীতিমালা-২০০৯- মন্ত্রীসভায় অনুমোদিত হওয়ার আলোকে এর বঙ্গানুবাদ আমার হাতে পৌছায়। বাজেট নিয়েও সভা-সমাবেশ ও অনেক কথা হয়েছে এর মাঝে। সংসদে বাজেট পাস হয়েছে। চারপাশে ডিজিটাল বাংলাদেশ নিয়ে আলোচনা হয়েছে ব্যাপকভাবে। অনেক সভা, সমাবেশ, কর্মশালা ও বৈঠকের ফলে সেইসব আলোচনার তথ্য ও উপাত্ত দিয়ে বইটিকে আরও সমৃদ্ধ করার সুযোগ তৈরী হয়েছে। সরকারের প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয়ের একসেস টু ইনফরমেশন শাখা এরই মাঝে ইউএনডিপির সহায়তায় ডিজিটাল বাংলাদেশ বিষয়ক একটি ধারনাপত্র তৈরী করেছে এবং সেটি সরকারের কেবিনেট সচিব অনুমোদনও করেছেন। এরই মাঝে আমি অনেকটা সময় ইন্টারনেটে ব্যয় করতে পেরেছি। বিশেষত ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার যে লক্ষ্য; সেই জ্ঞানভিত্তিক সমাজের সংজ্ঞা সম্পর্কে অনেক নতুন কথা জানা গেছে।

ঘটনাচক্রে ২০০৯ সালের জুলাই মাসে আমি মালয়েশিয়া ও সিঙ্গাপুর সফর করি। আমি আবার দেখে আসি মালয়েশিয়ার মাল্টিমিডিয়া সুপার করিডোর। একই বছরের আগস্ট মাসের প্রথম ও দ্বিতীয় সপ্তাহে আমি কম্পিউটার সমিতির হয়ে থাইল্যান্ড, মালদ্বীপ ও শ্রীলঙ্কা সফর করি। এই সফরে আমি থাইল্যান্ড, মিয়ানমার, ভিয়েতনাম, সিঙ্গাপুর, মালদ্বীপ, শ্রীলঙ্কা ও মালয়েশিয়ার তথ্যপ্রযুক্তির সর্বশেষ অবস্থাটি জানতে পারি। একই সাথে থাইল্যান্ডের নেট বে ও মাল্টিমিডিয়া এশিয়ার ধ্যান ধারনা ও প্রযুক্তি আমাকে দারুণভাবে প্রভাবিত করে। শ্রীলঙ্কার লঙ্কা গভ নেটওয়ার্ক, ডিস্ট্রিক্ট অফিস ও নেনাশালা দেখে আমার কাছে মনে হয়েছে এখনও যদি আমরা আমাদের চলার গতিটা আর একটু বাড়াতে পারি তবে আমরা খুব সহসাই আমাদের প্রতিবেশিদেরকে ছাড়িয়ে যেতে পারবো। আমার ইচ্ছা আছে ভিয়েতনাম দেখার। কারণ এসোসিওর বিভিন্ন সামিট থেকে ধারণা হয়েছে যে, ভিয়েতনাম হলো এই অঞ্চলের নতুন আইসিটি টাইগার। সেই অভিজ্ঞতা আমি বইটির পরের সংস্করণের জন্য জমা রাখছি।

সবাই জানেন, এটি বইটির প্রথম প্রকাশ নয়। বরং একে আলফা সংস্করণের পর বেটা সংস্করণ বলা ভালো। যারা এর প্রথম সংস্করণ পড়েছেন তাদের কাছেও এটি একেবারেই নতুন বই বলে মনে হবে। নতুন অধ্যায় যুক্ত করা ছাড়াও এতে নতুন মতামত ও চিন্তার প্রতিফলন ঘটানো হয়েছে। ”ডিজিটাল বাংলাদেশ কেন” এই অধ্যায়টি সম্পূর্ণ ঢেলে সাজানো হয়েছে। প্রচুর নতুন তথ্য এতে যোগ করা হয়েছে। যদিও বইটির প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণে মূল ধারণার কোন পরিবর্তন হয়নি, তথাপি একে অনেক বিস্তৃত ক্যানভাস বলা যায়। “ডিজিটাল বাংলাদেশ কেমন করে” এই অধ্যায়টি সম্পূর্ণ নতুন করে যুক্ত করা হয়েছে।

দিনে দিনে এটি আমার কাছে আরও স্পষ্ট হচ্ছে যে, দুনিয়ার তৃতীয় যুগটি নিয়ে দুটি স্পষ্ট স্রোতধারা রয়েছে। পুজিবাদী সমাজে একে যেভাবে দেখা হয় সমাজতান্ত্রিক শিবিরে সেভাবে এর মুল্য নেই। আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশে এমন কর্মসূচীর লক্ষ্য ভিন্ন পরিণতি আনতে পারে। যদি এটি একটি সাম্যবাদী সমাজের আঙ্গিকে বাস্তবায়িত হয় তবে এটি দেশের সকল মানুষের জীবনমান উন্নত করবে। কিন্তু এটি এমন হতে পারে যে, **ডিজিটাল বাংলাদেশ কিছু ধনী লোককে আরও বেশি ধনের মালিক করে তুলতে পারে বা সমাজে ধনী ও গরীবের পার্থক্যটা অনেক বেশি করে দিতে পারে।** যেহেতু গরীব মানুষ পুজিবাদী সমাজে জ্ঞান আহরণ করার সক্ষমতা রাখেনা সেহেতু জ্ঞান তাদেরকে শোষণ করার হাতিয়ারে পরিণত হতে পারে। এই সংকট অতিক্রম করে বেরিয়ে আসার জন্য রাজনৈতিক অঙ্গীকার থাকা জরুরী।

বলা যেতে পারে, প্রথম প্রকাশের পর প্রাপ্ত মতামতগুলো (খুবই কম) আমার কাছে যতোটা গ্রহণযোগ্য হয়েছে তা আমি এই বইতে প্রতিফলিত করেছি। এর কাঠামোগত পরিবর্তনও ব্যাপকভাবে করা হয়েছে। প্রথম প্রকাশের সময় যারা সহায়তা করেছেন তাদের কথা বলে পুনরুক্তি করতে চাইনা। বরং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে চাই দেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতি। বিশেষতঃ এই কথাটি বলা দরকার যে, ডিজিটাল বাংলাদেশ বইটি প্রকাশের বিষয়টি আদৌ বাস্তবায়িত হতো না যদি আধুনিক বাংলাদেশের স্থপতি শেখ হাসিনা এই শব্দযুগল উচ্চারণ না করতেন। এজন্য তার কাছে আমি চিরঋণী।

মোস্তাফা জব্বার

৩১ আগস্ট ২০

প্রথম প্রকাশের পূর্বকথা

হাওরের কাঁদা মাখা জলে ভেজা পা শহরে যেদিন ফেলেছিলাম সেদিনই মনে হয়েছিলো, সব মানুষ সমান নয়, সব মানুষের প্রতি রাষ্ট্র বা সরকার সম আচরণ করে না। আইন সবার জন্য সমান নয় বা বিচার সকলের জন্য নয়; এমনটি গ্রামে থাকতেও দেখেছি। পেশীশক্তির কাছে মেধাশক্তিকে পরাস্ত হতে দেখার অভিজ্ঞতা আমাদের কারও কম নয়। কিন্তু আমরা সকলে বৈষম্যটা অনুভব করিনা। মানুষে মানুষে বৈষম্য, জাত-পাতে বৈষম্য, স্থান-কাল-পাত্রে বৈষম্য, শহরে-গ্রামে বৈষম্য, ধনী-গরীবে বৈষম্য, শিক্ষিত-অশিক্ষিতে বৈষম্য; এমন হাজারও বৈষম্যের প্রভাবে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠা মানুষেরা প্রতিকারের প্রত্যাশায় একাত্তরে যুদ্ধে গিয়েছিলাম। শেকল ভাঙ্গার যুদ্ধ থেকে ক্লান্ত দেহে ফিরে এসে আবার সেই বৈষম্যের শেকলে বন্দী হলাম।

অশিক্ষা-কুশিক্ষা, দারিদ্র, অপচিকিৎসাসহ সকল ধরনের অপশাসন ও অপসংস্কৃতির নিস্পেষণে পিষ্ট হয়ে পুরো জাতির মুক্তির জন্য যা ভাবলাম তার নাম ডিজিটাল বাংলাদেশ। আমার সৌভাগ্য হয়েছিলো বাংলাদেশ রাষ্ট্রের জন্মের সাথে যুক্ত থাকার। সেটি এক মহান স্বপ্ন ছিলো। রাষ্ট্রটি জন্ম নেবার পর আমি এবং আমার মতো কোটি কোটি মানুষ আরও একটি স্বপ্ন দেখেছে। সেই স্বপ্নই ডিজিটাল বাংলাদেশ। সুদীর্ঘ সময় জুড়ে আমার মাঝে ডিজিটাল বাংলাদেশ নামের স্বপ্নটি বেড়ে ওঠেছে আপন গতিতে। সুবিধা ছিলো যে সেই ভাবনাগুলো প্রকাশ করার অনেকগুলো সুযোগ ছিলো আমার। দৈনিক জনকণ্ঠ, দৈনিক সংবাদ, দৈনিক ভোরের কাগজ, দৈনিক করতোয়া পত্রিকাগুলোতো ছিলোই, মাসিক কম্পিউটার জগৎ, টেকনোলজি টুডে, কম্পিউটার বিচিত্রা ও কম্পিউটার বার্তার মতো সাময়িকীও আমার সেই ভাবনাগুলোকে প্রকাশ করেছে।

২০০৭ সালের জানুয়ারীতে সামরিক শাসনকে নেপথ্যে রেখে ফখরুদ্দিনের যে সরকার ক্ষমতায় আসে তারা একটি নতুন রাজনীতিরও সন্ধান করে। বলা যেতে পারে, ডিজিটাল বাংলাদেশ ধারণার কালি কলমের প্রকাশ এরপর। সুদীর্ঘ সময় জুড়ে এই ধারণাটি বিকশিত হবার পথে এক সময়ে এটি বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতির শ্লোগানে পরিণত হয়। এরপর এটি আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহার হয়ে শেখ হাসিনার দ্বিতীয় সরকারের অঙ্গীকারে পরিণত হয়।

কিন্তু সত্যি কথা হচ্ছে ডিজিটাল বাংলাদেশ স্বপ্নটির সম্পূর্ণ অংশ এখনও লেখা সম্ভব হয়নি। শুধুমাত্র প্রস্তাবনা বা ধারনার অংশটি লেখার পরই এটি সাধারণ মানুষের আলোচনার জন্য প্রকাশের সিদ্ধান্ত নিই আমি। ২০০৭ সালের শুরু থেকে তিলে তিলে লাইনের পর লাইন লিখতে লিখতে এক ধরনের ভ্রান্তির মাঝে পড়ে যাবার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। পরিবর্তনশীল বাংলাদেশের ঘটনাপ্রবাহ ২০০৭ ও ২০০৮ সালে এতো দ্রুত বদলেছে যে লেখায় তার সাথে তাল সামলানো কঠিন ছিলো। ২০০৯ সালের মে মাসের মাঝামাঝিতে বাজেটকে সামনে রেখে বইটিকে আপডেট করা আরও কঠিন কাজ। এমন হতে পারে যে বইটির মাঝে কোথাও পুরানো তথ্য রয়ে গেছে যা আপডেট করা প্রয়োজন ছিলো। এমন ত্রুটি থেকে থাকলে তার জন্য ক্ষমা চাই। বইটির বর্তমান সংস্করণের প্রধান উদ্দেশ্য এর পূর্ণাঙ্গ সংস্করণ প্রকাশে সহায়তা পাওয়া বা পাঠক-নীতিনির্ধারক-পণ্ডিত ও সংশ্লিষ্ট সকল মহলের মতামত পাওয়া।

কম্পিউটার সফটওয়্যার প্রকাশ করার সময় আমরা এর আলফা, বেটা, রিলিজ ক্যান্ডিডেট ১ ও ২ ইত্যাদি সংস্করণ প্রকাশ করি। আমরা জানি, সৃজনশীল কাজ মানেই ভুলের সুযোগ থাকা। তাছাড়া পুরো দেশ, জাতি ও তার ভবিষ্যৎকে নিয়ে একটি মানুষের চিন্তার ফাঁক থাকতেই পারে। সেজন্যই আমি এই বইটিকে আলফা সংস্করণ বলতে চাই। বাজেটোত্তর কালে এর বেটা ও তারও পরে আরসি-১/২ সংস্করণ প্রকাশিত হবে।

তবে একটি কথা স্পষ্ট করে বলা দরকার যে এটি সরকারের বা সরকারী দলের আওয়ামী লীগের প্রকাশনা নয়। এই বইতে ক্ষেত্র বিশেষে সূত্র উল্লেখ করা ছাড়া যেসব মতামত প্রকাশ করা হয়েছে তার সবই একমাত্র আমার। এর দায়-দায়িত্ব সম্পূর্ণই আমার।

আমি এ সম্পর্কে অন্যের মতামতকে শ্রদ্ধার সাথে স্বাগত জানাবো। তবে বইটির দায়িত্ব আমার বলে এর মতামতও আমারই থাকবে। আমি নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করছি এজন্য যে 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' নামক আমার একার ভাবনাটি দেশের বৃহত্তম ও প্রাচীনতম একটি রাজনৈতিক দলের জাতীয় শ্লোগানে পরিণত হবার পর একটি জাতীয় স্বপ্নে রূপান্তরিত হয়েছে। এমন সৌভাগ্য খুব বেশি মানুষের হয় না।

৮৭ সালে কম্পিউটারে বাংলা ভাষা প্রয়োগ করার পর বিশ্বের সকল প্রান্তের বাংলা ভাষাভাষীদের কাছ থেকে যতোটা সম্মান ও মর্যাদা পেয়েছি সেটিই এক জীবনের বড় পাওনা। ১৯৮৭ সালের ১৬ই মে শুরু করা সেই ঘটনার দিনেই এই বইটি প্রকাশিত হচ্ছে; কাকতালীয় হলেও দুয়ের মাঝে আমি একটি যোগসূত্র খোঁজে পাই। বইটিতে কিছু ছবি ব্যবহার করা হয়েছে। ছবিগুলোর সাথে ডিজিটাল বাংলাদেশ ধারনার উদ্ভব, বিকাশ ও প্রসারের সম্পর্ক রয়েছে। বইটিতে যুক্ত করা যায় এমন কিছু পরিসংখ্যান, গ্রাফ ও চার্ট এর বেটা সংস্করণে যুক্ত করা হবে।

এটি প্রকাশের সময় আমি আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহার প্রণেতাবৃন্দ, নির্বাচন পরিচালনা কমিটি ও মিডিয়া টীম, বিশেষতঃ বর্তমান অর্থমন্ত্রী মুহিত ভাই, প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা ইমাম ভাই, শ্রদ্ধেয় মশিউর ভাই, বন্ধুবর লেনিন, শ্রদ্ধেয় শেখরদা, বন্ধু হারুন হাবিব, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ আরেফিন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য ডঃ হারুনর রশিদ, ও প্রধানমন্ত্রীর প্রেস সচিব আবুল কালাম আজাদসহ বিপুল সংখ্যক মানুষের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। বইটি রচনার পেছনে আমার ফেসবুকের প্রায় ৫ হাজার বন্ধু ও ডিজিটাল বাংলাদেশ গ্রুপের ৩৭৩৫ জন বন্ধুর উৎসাহকে প্রশংসা করতে হয়। যেসব মিডিয়া আমার লেখাগুলোকে প্রকাশ করার সুযোগ করে দিয়েছে সেইসব মিডিয়াকে ধন্যবাদ।

এই বইটি ডিজিটাল বাংলাদেশ বই-এর প্রথম অংশ। এর সাথে কেমন করে ডিজিটাল বাংলাদেশ; এমন অন্তত একটি অংশ যুক্ত হবে। আমার ইচ্ছে আছে ২২ নভেম্বর ২০০৯ অনুষ্ঠিতব্য প্রথম ডিজিটাল বাংলাদেশ সামিট-এ বইটির প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হবে। আমি এটিও আশা করি যে সামিট পরবর্তী একটি সংস্করণও আমি ২০১০-এর ফেব্রুয়ারীর আগেই প্রকাশ করতে পারবো।

বইটি প্রকাশ করার ক্ষেত্রে বন্ধুবর জালাল, স্নেহাস্পদ রাব্বানী, আনোয়ার, নাসির, লুবনা, কণা, সুপ্তি ও জেসমিনের সহায়তার কথা অবশ্যই উল্লেখ্য।

বইটি সম্পর্কে লিখিত ও মৌখিক মতামত পাঠালে কৃতজ্ঞ থাকবো।

মোস্তাফা জব্বার

১২ মে ২০০৯

প্রথম অধ্যায়
ডিজিটাল বাংলাদেশের স্বপ্ন

যিনি যে ভাবেই দেখুন না কেন, যে ভাষাতেই এর প্রকাশ ঘটুকনা কেন, ডিজিটাল বাংলাদেশ স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের কোটি কোটি মানুষের এক অপূর্ণ স্বপ্নের নাম। স্বাধীনতার প্রায় চার দশক পর এই জাতি তার অতীতের সকল সাফল্য-ব্যর্থতাকে অনুভব করেছে এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ নামে রূপকল্প তৈরী করেছে। এই রূপকল্প তাকে সন্ধান দিয়েছে তার স্বপ্নের দেশের। বলা যায়, একাত্তরে দেশ স্বাধীন করার পর ২০০৮ সালের শেষ প্রান্তে এই জাতি আবার নতুন করে এক স্বপ্নের ঠিকানায় নৌকা ভাসিয়েছে। সেই স্বপ্নই ডিজিটাল বাংলাদেশ।

সেই স্বপ্নটা এমন সুন্দর: স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীতে বাঙালী সমাজে জ্ঞানই শক্তির কেন্দ্র হবে বলে শক্তি ও অর্থের-বিত্তের চাইতে জ্ঞানের প্রভাব কেবল বেশি নয়, নিরঙ্কুশ থাকবে। অর্থ বা পেশির বলে কেউ সমাজে জ্ঞানকে হেয় করতে পারবেনা। এই সময়ে সমাজ ও রাষ্ট্রের কাঠামোর একটি বিশাল পরিবর্তন হবে। সমাজে শিক্ষক, গবেষক, আবিষ্কারক এবং জ্ঞানী ও পণ্ডিত ব্যক্তিরা সকলের চেয়ে বেশি সম্মানিত হবেন। সমাজে শারিরীক শক্তিবান ও ধনবানদের চাইতে জ্ঞানীদের মর্যাদা হবে অনেক বেশি। এই সময়ের মাঝে জীবনের সকল ক্ষেত্রেই নতুন একদল জ্ঞানকর্মী তৈরী হবে। এখন যারা তিরিশ বছর বয়সের নীচে তারা হবে সেই জ্ঞানকর্মী। এই জ্ঞানকর্মীরা সমাজ ও রাষ্ট্রের সর্বত্র নেতৃত্ব দেবে। পেশী শক্তি ও অর্থবিত্তের আধিপত্য একবারে বিলীন হবে। জ্ঞানীদের সংখ্যা বেশী বলে সাধারণভাবে বাংলাদেশের একুশ শতকের ইতিহাস তারাই রচনা করবেন। অর্থনীতি ডিজিটাল ও জ্ঞানভিত্তিক বলে কৃষি ও শিল্পের চাইতে মেধাভিত্তিক সেবা ও শিল্প-কারখানার প্রসার
বেশি হবে। বাণিজ্য হবে ডিজিটাল। কাগজের টাকার স্থান নেবে প্লাস্টিকের টাকা। শোরুমগুলোতে মানুষের ভীড় হবেনা-কেনাকাটা হবে অনলাইনে। ততোদিনে দোকানপাট আর মার্কেটনির্ভর ব্যবসা-বাণিজ্য ওধাও হয়ে যাবে।

মানুষ তার ঘরে বসে পছন্দমতো পণ্য কিনবে। কাগজের টাকা যাদুঘরে থাকবে। টেক্সিচালক, বাস চালক, মাছ-মুরগীর ব্যবসায়ী, চানাচুরওয়ালা ও অন্য ফেরিওয়ালারা ক্রেডিট কার্ড গ্রহণ করবে। উৎপাদন ব্যবস্থা যাবে বদলে। শ্রমঘণ বিপজ্জনক শিল্প কারখাণায় মানুষের কাজ হবে কেবল নিয়ন্ত্রণ করা। যন্ত্রপাতি করবে উৎপাদন। মানুষ করবে সেই উৎপাদন ব্যবস্থার মনিটরিং। কৃষি কাজ পর্যন্ত চিপস নির্ভর হবে। কৃষিতে কাজ করবে শতকরা বড়জোর সাত ভাগ লোক। ষাট ভাগের বেশি লোক কাজ করবে সেবাখাতে। বাকীরা (৩৩ ভাগ) কাজ করবে মেধাভিত্তিকসহ অন্যান্য শিল্প-কল কারখানায়। বস্তুগত সম্পদের চাইতে মেধাজাত সম্পদ সৃষ্টির প্রতি সকলের বেশি আগ্রহ থাকবে। মেধার বিকাশ, সংরক্ষণ ও সৃজনশীলতাই হবে নীতি ও নৈতিকতার কেন্দ্র। রাষ্ট্র মেধা সংরক্ষণে কার্যকর ভূমিকা পালন করবে। দেশে-বিদেশে বাংলাদেশের জ্ঞানভিত্তিক সৃষ্টির বিশাল বাজার তৈরী হবে। প্রচলিত কৃষি-শিল্প-ব্যবসা-বাণিজ্যসহ সবকিছুতে বাঙ্গালীর বিজ্ঞান চর্চা ও প্রযুক্তি উদ্ভাবনের কল্যাণে তথা মেধার স্পর্শে বস্তুগত মূল্যের চাইতে মেধাজাত মূল্য সংযোজন অনেক বেশি হবে। নারী ও তরুণরা এইসব কাজে সবেচেয়ে বেশি সক্রিয় থাকবে। যেহেতু কাজের চরিত্র হবে মেধাভিত্তিক সেই কারণে এখন যারা শারিরীক শক্তির জন্য সক্রিয়ভাবে কাজ করতে পারেন না তারাও মেধাজাত কাজ বলে অত্যন্ত প্রবলভাবে তাতে জড়িত হতে পারবেন। সমাজের বয়স্করা প্রধানত অভিভাবকত্ব এবং অবসর জীবনে অভ্যস্ত হয়ে পড়বেন। বেশির ভাগ মানুষ তাদের নিজের বাড়ীতে বসেই মেধাজাত সম্পদ সৃষ্টি বা সেবাদানে সক্ষম হবেন। অর্থনীতি হবে চাঙ্গা। দুই ডিজিটের নিচে প্রবৃদ্ধি হবে না। বিশ্বের সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত দেশের অপবাদ ঘুচবে। সমাজে ডিজিটাল কাজের প্রক্রিয়া এমন হবে যে দুর্নীতি করার সুযোগ থাকবেনা। । প্রশাসনে স্পীড মানির প্রয়োজন থাকবে না। কাজ হবে আপন গতিতে। টিআইবির অফিস তালাবন্ধ হয়ে যাবে। দেশজুড়ে বিরাজ করা তাদের শাখা অফিসগুলো বন্ধ হয়ে যাবে। পুলিশ এসএমএস বা ই-মেইলে মামলা গ্রহণ করবে। তারা ঘুষ কাকে বলে জানবেনা। কাস্টমস অফিসাররা ডিজিটাল পদ্ধতিতে কাজ করবেন। তারাও ঘুষ কাকে বলে জানবেন না। নিজেদের অর্থ দিয়ে আমরা আমাদের উন্নয়ন করতে থাকবো। দাতারা আমাদের জন্য প্রেসক্রিপশন দিবে না-বরং বলা যায় দিতে পারবেনা। কারণ দাতাদের সহায়তা আমাদের প্রয়োজন হবেনা। আমরা আমাদের বাজেট নিজেরাই দেশিয় বা অভ্যন্তরীণ আয় থেকেই যোগান দিতে পারবো। বরং তখন আমরা দুনিয়াকে দেখিয়ে দেবো জ্ঞানভিত্তিক সমাজের রূপরেখা কেমন হয়। আমাদের জ্ঞানভিত্তিক সমাজটি ধনবাদী দেশগুলোর মতো বৈষম্যমূলক ও শোষক-শোষিতের হবেনা-আমরা সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠা করবো ও প্রতিটি মানুষের জন্য ন্যূনতম চাহিদা পূরণের পাশাপাশি তার জন্য সম সুযোগেরও ব্যবস্থা করবো।

আমরা স্বপ্ন দেখি, আমাদের ডিজিটাল বাংলাদেশে দারিদ্র সীমার নিচে কোন মানুষ বসবাস করবে না। দেশে স্বচ্ছল মানুষ সবাই হবে। সমাজে হাজার হাজার কোটি টাকার মালিক-এমন খুব বেশি ধনী কোন মানুষ বা পরিবার থাকবেনা। বড় বড় শিল্প-কল-কারখানা থাকবে। তবে এসব কারখানার মালিক থাকবে সাধারণ জনগণ। দেশে ব্যাপকভাবে ছোট ও মাঝারি পুঁজির বিকাশ ঘটবে। রাষ্ট্রীয় নীতিমালার সুবিধা নিয়ে ধনী আরো ধনী হবার সুযোগ পাবেনা। মাঝারি আয়ের মধ্যবিত্তের সংখ্যাই অধিক হবে। অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা, শিক্ষা, নিরাপত্তা কোনটাই কোন মানুষের সংকট হবেনা। সবাই তার ন্যূনতম প্রয়োজন মেটাতে পারবে। অন্নের অভাবে পড়বেনা কোন মানুষ। সারা দেশে থাকবেনা কোন বস্ত্রহীন মানুষ। ছিন্নমূল বাসস্থানহীন কোন মানুষ পাওয়া যাবে না। রাস্তায় ভিক্ষুক পাওয়া যাবে না। সরকারী-খাস জমি, ফুটপাত, রেল স্টেশন, লঞ্চ ঘাট বা অন্য কোথাও ঝুপড়ি ঘরের বস্তিতে কেউ বাস করবে না। নিজের হোক, ভাড়ায় হোক একটি নিরাপদ আবাস প্রতিটি মানুষের থাকবে। প্রতিটি মানুষের জন্য অত্যাবশ্যকীয় সেবা পাওয়া যাবে। বিনা চিকিৎসায় মরবে না কেউ। প্রতিটি মানুষের জন্য ডাক্তার-হাসপাতাল-ঔষধ পাওয়া যাবে। গ্রামের হোক আর শহরের হোক, ন্যূনতম চিকিৎসার ব্যবস্থা সকলের জন্যই বিরাজ করবে। সরকার সেই ব্যবস্থা নিশ্চিত করবে। বেনিয়া চিকিৎসা ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত হবে ও জনগণের কল্যাণের পক্ষে দাড়াবে। মানুষের অসুস্থতাকে পুজি করে ব্যবসা করার বিদ্যমান ব্যবস্থা বিলুপ্ত হবে। প্রয়োজনে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসা সে পেতে পারবে। ডিজিটাল যন্ত্র প্রতিটি মানুষের কাছে সেই সুযোগ পৌছে দেবে। এমনকি দেশের বাইরের বিশেষজ্ঞদের কাছে একজন সাধারণ মানুষকে পৌছানোর ব্যবস্থা করে দেবে সরকার।

সরকার গ্যাস, পানি-বিদ্যুৎ, পয়ঃ নিস্কাষণসহ সব সাধারণ সেবাই মানুষের জন্য প্রদান করবে। দেশের সর্বত্র পৌর সেবা ঘরে বসেই পাওয়া যাবে। মানুষ ঘরে বসেই তাদের সকল বিল পরিশোধ করবে। প্রতিটি মানুষের জন্য প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা (দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত) বাধ্যতামূলক হবে এবং সরকার সেই শিক্ষা বিণামূল্যে প্রদান করবে। শিক্ষার ন্যূনতম এই স্তরটিতে কোন বৈষম্য থাকবেনা। ইংরেজী-বাংলা মাধ্যম, স্কুল হোক, মাদ্রাসা হোক, সবার জন্যই এক ধারার পাঠ্য বিষয় থাকবে। শহর-গ্রাম, ছোট-বড়, ধনী-গরীব সকলের জন্য ন্যূনতম শিক্ষার একটিই ধারা প্রবাহমান থাকবে। দেশের প্রতিটি শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীর নিজের কম্পিউটার বা অন্য কোন ডিজিটাল

যন্ত্র থাকবে। ক্লাশরুমগুলো কম্পিউটার বা অন্য কোন ডিজিটাল যন্ত্র দিয়ে ভরা থাকবে। সকল পাঠ্যপুস্তক ইন্টারএ্যাকটিভ হবে এবং বিণামূল্যে ইন্টারনেটে পাওয়া যাবে। বাড়ীতে বসে ক্লাশ করা যাবে। পরীক্ষা দেয়া যাবে ঘরে বসে। ফলাফল পাওয়া যাবে পরীক্ষা দেবার পরপরই। এমনও হতে পারবে যে, কোন ক্যাম্পাসে না গিয়েই কেউ তার শিক্ষাজীবন সম্পূর্ণ করতে পারবে।

নিরাপত্তার অভাব রবে না কারো। তার নিজের জীবন ও সম্পদ নিয়ে কোন ভয় থাকবেনা। প্রতিটি মানুষ ভয়লেশহীনভাবে দেশের যেকোন প্রান্তে যেকোন সময় চলতে পারবে। ঢাকার পথে রাত বারোটায় ১৮ বছরের সুন্দরী মেয়েটি সম্পূর্ণ একা হাটবে বা সাইকেল চালাবে, তার কোন ভয়ের কারণ থাকবেনা। তার কোন ধরনের নিরাপত্তার অভাব হবে না। সকল মানুষের মৌলিক অধিকারগুলো থাকবে নিশ্চিত। দেশে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড হবেনা। র‌্যাবের ক্রসফায়ার বা এনকাউন্টার থাকবেনা। দেশে স্বাধীন বিচার বিভাগ থাকবে। সেটি কেবল কাগজে থাকবেনা, বিরাজ করবে আইনের শাসন। দেশের যে কেউ চিহ্নিত অপরাধীকে ইন্টারনেটে দেখতে পাবে। ডিএলআর-এর ইন্টারনেট সংস্করণ থাকবে। বিচারক প্রয়োজনে ভিডিও কনফারেন্সিং-এর সহায়তা নিয়ে বিচারকার্য সম্পাদন করতে পারবেন। আইন-বিচার কার্যক্রম, আইনের ব্যাখ্যা, আদালত, উকিল এবং বাদি-বিবাদী সকলের কাছেই ঘরে বসে পাবার মতো তথ্য সহজলভ্য থাকবে।

রাজনীতি নষ্টামিতে ভরা থাকবেনা। দুর্বৃত্তায়ন পাওয়া যাবেনা তাতে। চাদাবাজি, টেন্ডারবাজি কোন দল বা রাজনীতিকের লক্ষ্য হবেনা। রবে না লুটেরা রাজনৈতিক সংস্কৃতি। মানুষ রাজনীতিবিদদের চোর-মহাচোর বলবেনা, সম্মানের চোখে দেখবে তাদের। রাজনীতিবিদদের দেশপ্রেমিক বলে মনে করা হবে। রাজনীতিকরা গম বিলি, টিন আত্মসাৎ, মামলাবাজি, দলবাজি, কমিশনবাজি এসব করবেন না। তাদের হ্যামার-জাগোয়ার-মার্সিডিজ বেঞ্জ থাকবেনা, মগজের ধার থাকবে। সংসদ সদস্যগণ উপজেলা পরিষদ বা টিআর-এর পেছনে লেগে থাকবেন না। তারা আইন প্রণয়নে নিমগ্ন থাকবেন। তারা দেশের জন্য একুশ শতকের আইন প্রণয়ন এবং জ্ঞানভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠায় মানুষের করণীয় বিষয়াদি নিয়ে গবেষণা করবেন। দেশে একটি সচেতন নাগরিক সমাজ দেশবাসীর সকল ধরনের বিষয়াদিসহ মানবাধিকারের বিষয়সমূহও মনিটর করবে।

সংবিধানে প্রদত্ত নিয়ম কাঠামোর মাঝে সংবাদপত্রের-মিডিয়ার স্বাধীনতাসহ মৌলিক অধিকার পরিপূর্ণভাবে বাস্তবায়িত হবে। মানুষ ঢাকা শহরের সরকারের কাছে আসবেনা, সরকার যাবে তার গ্রামের বাড়ীতে, পর্ণকুটীরে। সে নিজে সিদ্ধান্ত নেবে কোথায় তার উন্নয়ন হবে।

তথ্যপ্রযুক্তিনির্ভর সরকার হবে দক্ষ ও জনগণের সেবক। সরকারের সকল তথ্য নাগরিকেরা যেকোন স্থান থেকে জানতে পারবে। বিচার হোক আর সরকারের কাছে কোন আবেদন হোক, কম্পিউটার বা মোবাইল ফোন দিয়েই নাগরিকেরা সরকারের কাছে পৌছাতে পারবে। কাউকে সশরীরে সরকারী অফিসে আসতে হবে না। শহরের পাতাল-আকাশ রেল তাদের চলাচলের উপায় হবে। এক শহর থেকে অন্য শহরে যাবার জন্য তারা ট্রেনে চড়ে বা রেলে উঠে দ্রুত চলাচল করবে। নদী-খাল দিয়ে আরামদায়ক দ্রুতগতির নৌযান চলবে। সড়কপথগুলো প্রশস্ত, নিরাপদ ও আরামদায়ক গণবাহনে ভরা থাকবে। পদ্মা সেতু ততোদিনে শেষ হয়ে যাবে-দ্বিতীয় পদ্মা সেতুর কাজও ততোদিনে শেষ হয়ে যাবে। শীতলক্ষ্যা, ব্রক্ষ্মপুত্র, করতোয়া, ধনু, সুরমা, কংস, যমুনায় আরো অনেক সেতু হবে। রেললাইন যাবে বরিশাল-টেকনাফ পর্যন্ত। ভুমির সকল তথ্য ঘরে বসে পাওয়া যাবে। জমি রেজিস্ট্রি করার সাথে সাথে দলিল পাওয়া যাবে।

পত্রিকাগুলোর সকালের সংস্করণ প্রকাশিত হলেও সারা দিনই তারা অনলাইনে আপডেট থাকবে। কাগজের সংস্করণ মানুষ কদাচিৎ দেখবে। বই নামক কিছু জিনিষ দেখতে হলে যাদুঘরে যেতে হবে। মানুষ মোবাইল ফোনে স্যাটেলাইট টিভি দেখবে।

আমাদের স্বপ্নের মাঝে থাকতে পারে, দেশের নদীগুলো মিষ্টি পানি আর সুস্বাদু মাছে পরিপূর্ণ থাকবে। আমি স্বপ্ন দেখতে চাই যে, দেশের দুই কোটি শিক্ষিত বেকার নিজেদেরকে একুশ শতকের উপযুক্ত করবে এবং তাদের বেকারত্ব ঘুচবে। নতুন যারা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে বের হবে তারা তৈরী হবে জ্ঞানকর্মী হিসেবে।

কখনও কখনও এমনটি মনে হতে পারে যে, এটি হয়তো উচ্চাভিলাসী, অলীক বা বাস্তবায়ন অযোগ্য একটি কল্পনার ফানুস। ভাবলেই সব হবে, স্বপ্ন দেখলেই সেই স্বপ্ন বাস্তবায়ন করা যাবে এমনটি নাও হতে পারে। কিন্তু চেষ্টা করলে সেটি হতেও পারে।

১৬ আগস্ট ২০০৯

দ্বিতীয় অধ্যায়
ডিজিটাল বাংলাদেশ কর্মসূচি

ডিজিটাল বাংলাদেশ হচ্ছে সেই সুখী, সমৃদ্ধ, শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর দুর্নীতি, দারিদ্র্য ও ক্ষুধামুক্ত বাংলাদেশ যা সকল প্রকারের বৈষম্যহীন এবং প্রকৃতপক্ষেই সম্পূর্ণভাবে জনগণের রাষ্ট্র, যার মুখ্য চালিকা শক্তি হচ্ছে ডিজিটাল প্রযুক্তি। এটি বাঙ্গালীর উন্নত জীবনের প্রত্যাশা, স্বপ্ন ও আকাঙ্ক্ষা। এটি বাংলাদেশের সকল মানুষের ন্যূনতম মৌলিক প্রয়োজন মেটানোর প্রকৃষ্ট পন্থা। এটি একাত্তরের স্বাধীনতার স্বপ্ন বাস্তবায়নের রূপকল্প। এটি বাংলাদেশের জন্য স্বল্পোন্নত বা দরিদ্র দেশ থেকে সমৃদ্ধ ও ধনী দেশে রূপান্তরের জন্য মাথাপিছু আয় বা জাতীয় আয় বাড়ানোর অঙ্গীকার।

এই কর্মসূচির মূল লক্ষ্য হলো:

ক. তথ্য যুগ বা ডিজিটাল যুগ যে নামেই তাকে আমরা ডাকি না কেন, কৃষি ও শিল্প যুগের পর মানব সভ্যতার জন্য চলমান ডিজিটাল বা তথ্য যুগের সার্বিক অংশীদার ও যোগ্য রূপান্তরিত দেশ হিসেবে বাংলাদেশ বিশ্বের একটি উন্নত দেশ হিসেবে ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করবে এবং জনগণের মাঝে রাষ্ট্রীয় সুযোগ ও সম্পদের সুষম বণ্টন নিশ্চিত করাসহ সর্বপ্রকারের বৈষম্য দূর করবে ও দারিদ্র্যমুক্ত হবে।

খ. এই কর্মসূচি দেশের সকল মানুষের জন্য ডিজিটাল লাইফস্টাইল গড়ে তোলার মাধ্যমে জনগণের জীবনযাত্রার মান সম্ভাব্য সর্বোচ্চ পর্যায়ে নিয়ে যাবে। ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে এই দেশে ডিজিটাল প্রযুক্তিনির্ভর জীবনধারা গড়ে তুলে পুরো জাতির জন্য একটি জ্ঞানভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করা হবে। একই সাথে এটি বিশ্বময় গড়ে ওঠা জ্ঞানভিত্তিক সমাজের সাথে সম্পৃক্ত হবে। এটি বাংলাদেশের প্রতিটি নাগরিকের জীবন যাপনের ন্যূনতম চাহিদা পূরণ করবে।

গ. ডিজিটাল বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় লক্ষ্য হবে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণাকে পরিপূর্ণভাবে বাস্তবায়ন করা। একাত্তরে এই জাতি যে স্বপ্ন নিয়ে সশস্ত্র যুদ্ধে নেমেছিলো সেই স্বপ্ন পূরণ করার পাশাপাশি ডিজিটাল যুগের বাস্তবতা অনুযায়ী দেশের কর্মক্ষম জনশক্তিকে সম্পদে রূপান্তর করা হবে ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার অন্যতম লক্ষ্য। এই জনগোষ্ঠী হবে ডিজিটাল বাংলাদেশের সৈনিক।

ঘ. ডিজিটাল বাংলাদেশের লক্ষ্য হবে দেশের প্রতিটি নাগরিকের কাছে সর্বপ্রকারের ডিজিটাল প্রযুক্তি সহজলভ্য করা ও এর সর্বোত্তম লাগসই ব্যবহার নিশ্চিত করা।

ঙ. ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার অন্যতম লক্ষ্য হবে, রাষ্ট্রের সম্পদ ও সরকার ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য সর্বস্তরে ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করার মাধ্যমে ডিজিটাল সরকার প্রতিষ্ঠা করে জনগণকে রাষ্ট্রীয় সেবাসমূহ ডিজিটাল পদ্ধতিতে প্রদান করা । এই লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য শিক্ষা, স্বাস্থ্য, স্থানীয় শাসন, জনপ্রশাসন, সরকারী প্রশাসনের ব্যবস্থাপনা এবং শিল্পসহ ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনের সকল পর্যায়ে ডিজিটাল প্রযুক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহার করতে হবে।

চ. ডিজিটাল বাংলাদেশের লক্ষ্য হবে জনগণের অংশগ্রহণমূলক গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করা এবং রাষ্ট্রকে সর্বপ্রকারের ধর্ম-নিরপেক্ষ করে ডিজিটাল প্রযুক্তিতে বাঙালীর ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতির বিকাশ সাধনের পাশাপাশি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিসত্ত্বার ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি সংরক্ষণ, বিকাশ ও তাদের সর্বপ্রকারের অধিকার নিশ্চিত করা।

ছ. ডিজিটাল বাংলাদেশের লক্ষ্য হবে ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক সম্পর্ক, উৎপাদন ব্যবস্থাসহ রাষ্ট্রের সর্বস্তরে ডিজিটাল যুগের পরিবর্তনের সাথে সঙ্গতিপূর্ণভাবে নাগরিকদেরকে শিক্ষিত করা ও এই যুগের ভালো দিকটির বিকাশ ঘটিয়ে মন্দ দিকটিকে প্রতিরোধ করা।

জ. বাংলাদেশের ডিজিটাল যুগের অন্যতম লক্ষ্য হলো, অধিকতর মেধাসম্পদ তৈরী, সংরক্ষণ ও বিকাশ করা।

ডিজিটাল বাংলাদেশ-এর সংক্ষিপ্ত প্রস্তাবনা

ক. কেন ডিজিটাল বাংলাদেশ: যেহেতু বাংলাদেশের জনগণ পাকিস্তানের দখলদারিত্ব থেকে মুক্তির জন্য বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করে সশস্ত্র যুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জন করেছে এবং যেহেতু এই জনগণ নিজস্ব রাষ্ট্র কাঠামোতে ডিজিটাল জীবনব্যবস্থায় স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকা ও উন্নত জীবন গড়ার অধিকার রাখে, সেহেতু ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করে এই জাতির সকল মানুষের স্বপ্ন ও আশা আকাঙ্ক্ষার বাস্তবায়ন ও তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নত করার জন্য ডিজিটাল বাংলাদেশ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন। আওয়ামী লীগ তার নির্বাচনী ইশতেহারে ২০২১ সালের মাঝে ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার করে এই কর্মসূচীর ভিত্তিকে আরও শক্তিশালী করেছে ২০০৮ সালের ২৯ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত নবম জাতীয় সংসদের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন স্বাধীনতার স্বপক্ষের শক্তির নিরঙ্কুশ বিজয় এই কর্মসূচি যথাযথভাবে বাস্তবায়নের এক অপূর্ব সুযোগ তৈরী করেছে। আমাদের সকলের দায়িত্ব ও কর্তব্য হলো এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে ২০২১ সালে দেশটিকে ডিজিটাল বাংলাদেশে রূপান্তর করা।

খ. অগ্রাধিকার: ডিজিটাল বাংলাদেশ কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত আছে আমাদের রাষ্ট্রীয়, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অনেক বিষয়। তবে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কিছু কাজে সর্বাগ্রে নজর দিতে হবে।

খ.১ জাতীয় অগ্রাধিকার: ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার প্রথম জাতীয় অঙ্গীকার হবে দেশ থেকে দারিদ্র্য ও বৈষম্য দূর করা এবং জনগণের মৌলিক চাহিদা পূরণ করে জনগণের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা।

ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার জন্য জাতীয় পর্যায়ে অবকাঠামোগত অগ্রাধিকার থাকতে হবে সারা দেশের সকল ঘরে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে পারা । একই সাথে প্রতিটি ঘরকে তার বা বেতার ব্যবস্থায় নেটওয়ার্ক ব্যবস্থায় যুক্ত করতে হবে। এ ছাড়াও ডিজিটাল ডিভাইড দূর করা এবং মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠা জাতীয় অগ্রাধিকার হিসেবে বিবেচিত হতে হবে।

খ.২ ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যসমূহ অর্জনের জন্য ডিজিটাল প্রযুক্তি প্রয়োগের অগ্রাধিকার ক্ষেত্রসমূহ:

অ. ডিজিটাল সরকার: ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার প্রথম অগ্রাধিকারটি হলো ডিজিটাল সরকার প্রতিষ্ঠা করা। এক অর্থে বলা যায়, সরকারকে হতে হবে পেপারলেস গভর্নমেন্ট। সচিবালয় থেকে প্রত্যন্ত গ্রামের প্রান্তর পর্যন্ত বিস্তৃত সরকার কাজ করবে ডিজিটাল, নেটওয়ার্কড ও অনলাইন পদ্ধতিতে পরিচালিত স্বচ্ছতাসম্পন্ন দক্ষ প্রতিষ্ঠান। সরকারের সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়া হবে ডিজিটাল। সরকারের তথ্য সংরক্ষিত হবে ডিজিটাল পদ্ধতিতে। জনগণের সাথে সরকারের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া হবে ডিজিটাল প্রযুক্তিনির্ভর ইন্টারএ্যাকটিভ পদ্ধতিতে। জনগণকে সকল রাষ্ট্রীয় সেবা ডিজিটাল পদ্ধতিতে দিতে হবে। স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার জন্য ডিজিটাল প্রযুক্তির প্রয়োগ করতে হবে এবং এর সহায়তায় স্থানীয় সরকারের সাথে সরকারের সকল শাখাকে ডিজিটালি যুক্ত করতে হবে। স্থানীয় সরকারকে ডিজিটাল প্রযুক্তির ভিত্তিতে ইন্টারএ্যাকটিভ করার মাধ্যমে এই পদ্ধতিতে জনগণের অংশগ্রহণ ও সেবাগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। জাতীয় সহ সকল নির্বাচন পদ্ধতি ডিজিটাল করতে হবে।

আ. ডিজিটাল শিক্ষা: ডিজিটাল প্রযুক্তি প্রয়োগের পরের অগ্রাধিকারটি হতে হবে ডিজিটাল শিক্ষা ব্যবস্থা। এই কর্মসূচিতে স্কুল পর্যায়ে কেবলমাত্র বাধ্যতামূলক কম্পিউটার শিক্ষাই অন্তর্ভুক্ত নয়, এতে থাকতে হবে শিশুশ্রেণী থেকে স্নাতকোত্তর স্তর পর্যন্ত সকল পাঠ্য বিষয়কে ইন্টারএ্যাকটিভ মাল্টিমিডিয়া সফটওয়্যারে পরিণত করা। প্রতি শিশুর হাতে কম্পিউটার প্রদান প্রতি ছাত্র শিক্ষকের হাতে কম্পিউটার থাকা ও প্রতি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ইন্টারনেটসহ ডিজিটাল ল্যাব থাকতে হবে। এছাড়া প্রতি ঘরে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট প্রদান এই কর্মসূচির আওতায় থাকবে।

ই. কৃষি-শিল্প-বাণিজ্য ও অর্থনীতি: ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার অন্যতম অগ্রাধিকার হতে হবে জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতি ও উৎপাদন ব্যবস্থা গড়ে তোলা। এজন্য আর্থিক প্রশাসন, রাজস্ব আয় ও ব্যয় ব্যবস্থাপনা, বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন এবং ডিজিটাল কমার্স-এর জন্য ডিজিটাল প্রযুক্তি প্রয়োগ করতে হবে। কৃষি, অর্থনীতি, ব্যবসা-বাণিজ্য-শিল্প সর্বত্র লেন-দেন থেকে উৎপাদনের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতিতে থাকতে হবে ডিজিটাল প্রযুক্তি ও পদ্ধতি। মেধাভিত্তিক শিল্পের বিকাশ ঘটাতে হবে এবং জাতীয় মেধা সংরক্ষণ ও বিকাশ ঘটানোর পাশাপাশি বিজ্ঞান চর্চা, আবিষ্কার ও গবেষণায় প্রাধান্য দিতে হবে।

ঈ. অন্যান্য: ডিজিটাল বাংলাদেশ কর্মসূচীর অন্যতম অগ্রাধিকার হতে হবে ডিজিটাল ভূমিব্যবস্থা। ভূমির সকল তথ্য ডিজিটাল পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করার পাশাপাশি এর ব্যবস্থাপনা ডিজিটাল পদ্ধতিতে করতে হবে। ডিজিটাল বাংলাদেশের কর্মসূচির সাথে সঙ্গতি রেখে আইন প্রণয়ন ও সংশোধন করার পাশাপাশি আইনশৃঙ্খলা রক্ষা করা, জনগণ ও রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বিধান করা ও অপরাধ দমন করার জন্য ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করতে হবে। ডিজিটাল বাংলাদেশের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলার ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। একই সাথে সকল মেধাসম্পদ সুরক্ষা করতে হবে।

সকল নাগরিকের ধর্মচর্চার অধিকার নিশ্চিত করতে হবে এবং একই সাথে ডিজিটাল পদ্ধতিতে ধর্ম সংক্রান্ত সকল তথ্য পাবার ব্যবস্থা করতে হবে। ডিজিটাল বাংলাদেশ শীর্ষক অন্যান্য কর্মসূচি বাস্তবায়ন ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠাকে নিশ্চিত করবে।

<u>গ. এক নজরে ডিজিটাল বাংলাদেশ কর্মসূচি</u>

নিচে ডিজিটাল বাংলাদেশ-এর সংক্ষিপ্ত কর্মসূচি প্রদত্ত হলো। এতে আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়গুলোর উল্লেখ আছে। বোল্ড ও ইটালিক করা বিষয়গুলো তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সাথে সরাসরি সংশ্লিষ্ট।

গ.১ জনগণের ন্যূনতম মৌলিক চাহিদা পূরণের জন্য রাষ্ট্র তথা সরকারকে পরিপূর্ণ দায়িত্ব নিতে হবে। জনগণ রাষ্ট্রকে কর দেবে কিন্তু রাষ্ট্র জনগণের জন্য খাদ্য, বস্ত্র, শিক্ষা, বাসস্থান বা চিকিৎসার মতো বিষয়ের ন্যূনতম মৌলিক প্রয়োজন মেটাবে না-এটি হতে পারে না। এমন দায়িত্বজ্ঞানহীন সরকার আমরা মুক্তিযুদ্ধ করে পেতে চাই নি। এজন্য টাকার অঙ্কে লাভ লোকসানের সরকার এবং মানুষের মৌলিক চাহিদাকে বাণিজ্যিকীকরণ করা থেকে এই রাষ্ট্রের গতি জনগণের দিকে ফেরাতে হবে। আমি নিশ্চিতভাবেই মনে করি যে রাষ্ট্রকে জনগণের ন্যূনতম চিকিৎসা, আশ্রয়, পরিধেয়, নিরাপত্তা ও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে। রাষ্ট্রকে সকল নাগরিকের জন্য সমসুযোগের ব্যবস্থা করার পাশাপাশি একচেটিয়া ধনিক ও লুটেরা শ্রেণীর ক্রমাগত ও অপ্রতিরোধ্য একতরফা জন্ম নেয়া বন্ধ করতে হবে। দারিদ্র দূরীকরণ ও ধনী-দরিদ্রের পার্থক্য নিরসন করার পাশাপাশি অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক ডিজিটাল ডিভাইড দূর করতে হবে। রাষ্ট্রকে অক্ষম, কর্মহীন, প্রতিবন্ধী, মুক্তিযোদ্ধা, প্রবীন নাগরিক, যুদ্ধাহত, বিধবা ও সমাজের সকল স্তরের অনগ্রসর অংশকে ন্যূনতম জীবনধারনের উপযোগী ভাতা ও অন্যান্য সহায়তা প্রদান করতে হবে।

<u>জনগোষ্ঠীর সকল অংশের কাছে বিশেষতঃ গ্রাম ও শহরসহ অন্যত্র বসবাসকারী দরিদ্র ও হতদরিদ্র মানুষের কাছে ডিজিটাল প্রযুক্তি সহজলভ্য করতে হবে। দরিদ্র জনগণকে জ্ঞানকর্মী বা ডিজিটাল প্রযুক্তি কর্মী হিসেবে গড়ে তুলতে হবে এবং গ্রামে গ্রামে ডিজিটাল শিল্প-বাণিজ্য সহ কৃষি, শিক্ষা, টেলি যোগাযোগ ইত্যাদি খাতে ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করতে হবে। সরকার প্রদত্ত সকল সহায়তা ডিজিটাল পদ্ধতিতে ব্যবস্থাপনা করতে হবে। দেশের সকল নাগরিকের প্রয়োজনীয় তথ্য ডিজিটাল ব্যবস্থায় থাকতে হবে যাতে সরকার সময়মতো সকল প্রকারের সহায়তা প্রদান করতে পারে। সকল প্রকারের ডিজিটাল ডিভাইড দূর করতে হবে।</u>

গ.২ রাষ্ট্রটি হবে সম্পূর্ণভাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতাকামী জনগণ তথা মুজিবনগর সরকার কর্তৃক ঘোষিত বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র ও ১৯৭২ সালের সংবিধানের মূল নীতিমালার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এটি হবে গণতান্ত্রিক, জাতীয়তাবাদী, ধর্ম নিরপেক্ষ ও সমাজতান্ত্রিক। এর অর্থনৈতিক নীতি হবে বৈষম্যহীন ও বৃহত্তর জনগোষ্ঠী, শ্রমিক, কৃষক, পেশাজীবী, ছাত্র-যুবা, তরুণ-তরুণী, নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্তের অনুকূলের। এই রাষ্ট্র ধনিক, বৃহৎ শিল্পগোষ্ঠী, সাম্রাজ্যবাদ ও পুজিবাদের নিকৃষ্ট প্লাটফরম হবে না।

<u>ডিজিটাল মাধ্যমসহ সকল মিডিয়ায় রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে এই সংক্রান্ত সকল তথ্য প্রকাশ করতে হবে যা ডিজিটাল পদ্ধতিতে জনগণ অনায়াসে পাবে। রাষ্ট্রের ভিত্তিসমূহের যৌক্তিকতা ডিজিটাল পদ্ধতিতে প্রচার ও প্রসারের ব্যবস্থা করতে হবে।</u>

গ.৩ শাসনতন্ত্রের গণবিরোধী, অগণতান্ত্রিক ও সাম্প্রদায়িক ধারাসমূহ সংশোধন করতে হবে এবং বিচারবিভাগ, কর্ম কমিশন, নির্বাচন কমিশন ও মিডিয়ার স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে হবে। রাজনৈতিক দলসমূহ বিধিবদ্ধ ও জবাবদিহিতামূলক ও স্বচ্ছতাসহ গণতান্ত্রিকভাবে পরিচালনা করার জন্য প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন করতে হবে।

<u>সকল জাতীয় সংসদসহ সকল রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড ও ব্যবস্থার সকল তথ্য জনগণের কাছে প্রাপ্ত হবার জন্য ডিজিটাল পদ্ধতি ব্যবহার করতে হবে। সংসদের কার্যাবলীসহ সকল রাজনৈতিক কর্মসূচি, রাজনৈতিক বক্তব্য, কর্মকাণ্ড ও সাংসদসহ সকল রাজনীতিকদের রাজনৈতিক জীবনাচার সংক্রান্ত সকল তথ্য উন্মুক্তভাবে সকল জনগণের জন্য প্রকাশ করা বাধ্যতামূলক করতে হবে।</u>

গ.৪ প্রচলিত পদ্ধতির ফাইলভিত্তিক প্রশাসন বদলে ফেলতে হবে। অর্ধ শতাধিক স্বাক্ষর-ফাইল ওপরে ওঠা এবং নিচে নামার বিদ্যমান পদ্ধতি বদল করতে হবে। সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য ওয়ান স্টপ পদ্ধতি এবং পুরো সরকারের জন্য একটি নেটওয়ার্ক চালু করতে হবে। দেশ পরিচালনা করবে যে সরকার সেটি হবে ডিজিটাল সরকার।

ডিজিটাল সরকারের কাজ করার প্রক্রিয়া হবে ডিজিটাল। প্রচলিত কাগজভিত্তিক, ফাইল ও ফিতাভিত্তিক সরকার ব্যবস্থার বদলে সরকার কাজ করবে নেটওয়ার্কড, ইন্টারএ্যাকটিভ ও ডিজিটাল পদ্ধতিতে। সরকারের সকল তথ্য ডিজিটাল পদ্ধতিতে সংরক্ষিত হতে হবে এবং সরকারকে জনগণকে ডিজিটাল পদ্ধতিসহ অন্যান্য পদ্ধতিতে সেবা প্রদানের পাশাপাশি রাষ্ট্র পরিচালনার সকল স্তরে ও সকল কর্মকান্ডে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।

গ.৫ রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব জনগণের ওপর ন্যস্ত করার জন্য একটি কার্যকর ও শক্তিশালী স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা থাকতে হবে। গ্রাম-ইউনিয়ন, উপজেলা, জেলা ও কেন্দ্রীয় সরকারের সকল স্তরে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারাই দেশটি পরিচালিত হতে হবে। দেশে একটি নির্বাচিত জাতীয় সংসদ থাকতে হবে। জাতীয় সংসদই একমাত্র আইন প্রণয়ণ করবে এবং সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থনে সরকার গঠিত হতে হবে। এর সাথে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা হিসেবে জেলা-নগর সরকার, উপজেলা পরিষদ ও ইউনিয়ন পরিষদ (পশ্চিমবঙ্গের মতো গ্রাম পঞ্চায়েত হতে পারে) থাকতে হবে। এছাড়া জাতীয় সংসদকে সহায়তা ও পরামর্শ দানের জন্য পেশাজীবীদের নির্বাচিত একটি উপদেষ্টা পরিষদ থাকবে। দেশের জনপ্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় নির্বাচিত প্রতিনিধিদের অধীনে থেকে কাজ করবে ও জনগণকে ডিজিটাল পদ্ধতিতে সেবা দিতে হবে।

স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাটি ডিজিটাল পদ্ধতিতে পরিচালিত হবে। কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে যোগাযোগসহ জনগণকে সেবা প্রদান ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়া ডিজিটাল হতে হবে। স্থানীয় সরকারের সকল তথ্য ডিজিটাল পদ্ধতিতে সংরক্ষিত হতে হবে।

গ.৬ দেশের ভূমিব্যবস্থার আমূল সংস্কার করতে হবে। ভূমির মালিকানা ব্যবস্থার সংস্কার করে ভূমিহীন ও দরিদ্র মানুষদের ভূমির মালিকানা দিতে হবে। ভূমির অপব্যবহার বা যথেচ্ছা ব্যবহার রোধ করে পরিকল্পিত উপায়ে ভূমি ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। কৃষিকে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ খাত হিসেবে বিবেচনা করে এই খাতে সরকারকে প্রয়োজনীয় ভর্তুকি প্রদান করতে হবে। উচ্চফলনশীল শস্য উৎপাদনের জন্য উচ্চ প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করে কৃষি উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় সার-বীজ-কীটনাশক ন্যায্য/ভর্তুকিমূল্যে পাবার ব্যবস্থা করতে হবে। প্রয়োজনীয় খাদ্যশস্য উৎপাদনের পাশাপাশি অর্থকরী ও রপ্তানিমুখী কৃষিপণ্য উৎপাদন করতে হবে। কৃষিপণ্যের সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াকরণের সকল কার্যকর ব্যবস্থা নিতে হবে। জমির ব্যবহার অপটিমাম করার জন্য সমবায়-সামাজিক পদ্ধতির মাধ্যমে চাষাবাদ করতে হবে। কৃষিখাতের গবেষণাকে সরকারকে অন্যতম অগ্রাধিকার দিতে হবে। ধান-সব্জিসহ খাদ্য, ফলমূল, মাছ-হাস-মুরগি-গবাদি পশু এবং অর্থকরী-রপ্তানিমুখী কৃষিপণ্যের জন্য ব্যাপকহারে গবেষণা করতে হবে এবং গবেষণার ফলাফলকে যথাশীঘ্র সম্ভব মাঠপর্যায়ে প্রয়োগ করতে হবে। বিল-জলাশয়ের বিদ্যমান ইজারা প্রথা বাতিল করে সমাজবদ্ধতার মাধ্যমে বিল-জলাশয়গুলোতে সামাজিক মৎস্য চাষ করতে হবে। কোনভাবেই প্রাকৃতিক পরিবেশ নষ্ট করা যাবে না। এজন্য যথাযথ পর্যায়ে মৎস্য, পাখী ও অন্যান্য প্রাণীর অভয়াশ্রম গড়ে তুলতে হবে। কৃষি ও কৃষিনির্ভর শিল্পসহ কৃষিপণ্যের বাজারদর ও চাষাবাদ সম্পর্কিত সকল তথ্য ডিজিটাল পদ্ধতিতে সহজলভ্য হতে হবে।

ভূমি সংক্রান্ত সকল তথ্য, মালিকানা ও নিবন্ধন ডিজিটাল পদ্ধতিতে করতে হবে। এসব বিষয়ের সকল তথ্য অনলাইনে প্রাপ্ত হতে হবে। খাসজমি বরাদ্দ, দখলপ্রদান, ভূমি সংক্রান্ত মামলা ও বিরোধসহ সকল তথ্য ডিজিটাল পদ্ধতিতে সংরক্ষিত হবে এবং জনগণের কাছে প্রাপ্য হতে হবে। ডিজিটাল তথ্য ও উপাত্ত অনুসারে ভূমি ব্যবহারের নীতিমালা প্রণয়ন ও প্রয়োগ করতে হবে। ডিজিটাল প্রযুক্তি নির্ভর কৃষি গবেষণা ও কৃষি, পশুসম্পদ, মৎস্যসহ সকল পর্যায়ের উপকরণ, সহায়তা ও অন্যান্য ব্যবস্থাপনায় ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করতে হবে। জাতীয় আয়ে কৃষির অবদান ও কর্মসংস্থান কমিয়ে সেবা খাতের আয় বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান বাড়াতে হবে।

গ.৭ দেশে ইংরেজি-বাংলা-মাদ্রাসা ধরনের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নির্বিশেষে একই ধারার বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষাব্যবস্থা চালু থাকতে হবে এবং শিশুশ্রেণী থেকে কম্পিউটারসহ অন্যান্য বিজ্ঞান বিষয় বাধ্যতামূলকভাবে পাঠ করার ব্যবস্থাসহ কম্পিউটারকে শিক্ষা উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করতে হবে।

দেশের প্রতিটি শিক্ষার্থীকে ডিজিটাল যুগ বা জ্ঞানভিত্তিক সমাজের উপযুক্ত করে গড়ে তোলার জন্য উপযুক্ত ও প্রয়োজনীয় শিক্ষা দিতে হবে। প্রতিটি নাগরিকের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা করা সরকারের দায়িত্ব হবে।

দেশের প্রতিটি শিশুর হাতে পর্যায়ক্রমে কম্পিউটার প্রদান করতে হবে। প্রতি ঘরে ও প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দিতে হবে স্বল্প বা বিনামূল্যের দ্রুতগতির ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট। দেশের প্রতি ইঞ্চি জায়গা থেকে দ্রুতগতির ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেটে প্রবেশ করার ব্যবস্থা থাকতে হবে।

গ.৮ সামরিক বাহিনী, আধা সামরিক ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে তথ্যপ্রযুক্তিসহ সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ও অস্ত্র দিয়ে সজ্জিত করতে হবে। এই দেশের সীমারেখা, ধনসম্পদসহ সকল কিছুর পূর্ণ নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। রাষ্ট্রের দায়িত্ব হতে হবে প্রতিটি নাগরিকের জন্য নিরাপত্তা বিধান করা। একই সাথে রাষ্ট্রকে ব্যক্তির গোপনীয়তা বজায় রাখার নিশ্চয়তা দিতে হবে।

সামরিকসহ সকল বাহিনীর ক্ষেত্রে ডিজিটাল আগ্নেয়াস্ত্র ও অন্যান্য ডিজিটাল অস্ত্র ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। একই সাথে সাইবার ক্রাইম প্রতিরোধ করার জন্য উপযুক্ত আইন প্রণয়নসহ ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। নিরাপত্তা ও গোপনীয়তার বিষয়টি অনলাইন ব্যবস্থার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে।

গ.৯ প্রচলিত আইনসমূহ পরিবর্তন করতে হবে এবং নতুন আইনসমূহ ডিজিটাল যুগ বা ডিজিটাল বাংলাদেশ ও জ্ঞানভিত্তিক সমাজের কথা চিন্তা করেই প্রণীত হতে হবে। রাষ্ট্রকে ডিজিটাল ডাটা সুরক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। ডিজিটাল প্রযুক্তির অপব্যবহার ও সাইবার ক্রাইম প্রতিরোধ করতে হবে এবং মেধাসম্পদ সুরক্ষার জন্য কার্যকর আইন প্রণয়নসহ প্রয়োগ করতে হবে।

পরিবর্তিত অবস্থার প্রেক্ষিতে সৃষ্ট নতুন ধরনের অপরাধ, সাইবার অপরাধ, সাইবার কম্যুনিকেশন, অনলাইন আদানপ্রদান, নিউ মিডিয়া, ডিজিটাল কমার্স, ডিজিটাল লাইফস্টাইল, ডিজিটাল প্রযুক্তি এবং মেধাসম্পদ ইত্যাদি সকল বিষয়কে পর্যালোচনা করে অপরাধ সংক্রান্ত ফৌজদারী কার্যবিধিসহ অন্যান্য আইন পরিবর্তন করতে হবে। অপরাধ দমন ও নিয়ন্ত্রণ করার জন্য ডিজিটালসহ নতুন পদ্ধতি প্রয়োগ করতে হবে। প্রয়োজন মতো বায়োমেট্রিক্স, জিন পরীক্ষা, অপরাধীর অবস্থান নির্ণয়ের জন্য গ্লোবাল পজিশনিং সিস্টেম, অপরাধীর ডাটাবেজ তৈরী করা ছাড়াও বিচার ব্যবস্থাকে ডিজিটাল করতে হবে। আইনসমূহ অনলাইনে পাবার পাশাপাশি, ডিএলআর ও অন্যান্য আইন প্রকাশনা ডিজিটাল ও অনলাইনে প্রাপ্য হতে হবে। বিচারপ্রার্থী অনলাইনে বিচার প্রার্থনা করার পাশাপাশি তার মামলা কোথায় কি অবস্থায় আছে তা যেন অনলাইনে জানতে পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে। আইনজীবীগণ যাতে অনলাইনে তার বক্তব্য পেশ করতে পারেন এবং প্রয়োজনে ভিডিও কনফারেন্সের সহায়তায় বাদী-বিবাদীর বক্তব্য বা সাক্ষ্য গ্রহণ করা যায় তার ব্যবস্থা করতে হবে।

গ.১০ নিউ ইকোনমি (নতুন অর্থনীতি) বা নলেজ ইকোনমি (জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতি) ধরনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কায়েম করতে হবে। এটি বিদ্যমান পুঁজিবাদী অর্থনীতিকে প্রতিস্থাপিত করবে। নতুন অর্থনৈতিক ব্যবস্থাটি সম্পূর্ণ পুঁজিবাদী হবে না- আবার সম্পূর্ণ সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির মতো পুরোপুরি সরকার নিয়ন্ত্রিতও হবে না। অর্থনীতি প্রতিযোগিতার সৃষ্টি করলেও প্রয়োজনে সরকার অর্থনীতির ক্ষেত্রবিশেষে হস্তক্ষেপ করতে পারবে। এতে রাষ্ট্রীয় মালিকানার পাশাপাশি ব্যক্তি মালিকানা থাকবে, তবে বৃহৎ প্রতিষ্ঠানকে অবশ্যই জনগণের অংশীদারিত্বের মধ্য দিয়ে বিকশিত হতে হবে। সরকার বেসরকারী খাতের কাছে লাভজনক নয় অথচ জনকল্যাণমূলক, এমন খাতে সরাসরি বা বাধ্যতামূলক বিনিয়োগ করবে। রপ্তানি, জনকল্যাণমূলক, নিত্যপ্রয়োজনীয় ও কৃষিসহ জরুরি সেবাখাতে রাষ্ট্রকে প্রয়োজনমতো ভর্তুকি দিতে হবে। অর্থনীতির বার্ষিক প্রবৃদ্ধি অবশ্যই দুই ডিজিটের বা শতকরা ১০ ভাগের বেশি করতে হবে।

২০২১ সালে বাংলাদেশের মাথাপিছু বার্ষিক আয় দুই হাজার ডলারে উন্নীত করতে হবে। ধীরে ধীরে জিডিপি- এর বৃহৎ অংশ মেধাজাত সম্পদ থেকে উৎপন্ন করতে হবে। তথ্যপ্রযুক্তিসহ, প্রযুক্তি পণ্য ও সেবা, কৃষিপণ্য, শিল্পপণ্য, গার্মেন্টস এবং সেবাখাতের রপ্তানিকে ব্যাপকভাবে উৎসাহিত করতে হবে। প্রয়োজনে এইসব খাতে অর্থের যোগান দিতে হবে এবং রপ্তানী সহায়তাও করতে হবে। ব্যবসা বাণিজ্য হবে ডিজিটাল কমার্স। বাণিজ্যিক লেনদেন ও যোগাযোগ হবে ডিজিটাল পদ্ধতিতে। শিল্প কলকারখানায় প্রয়োগ করতে হবে ডিজিটাল প্রযুক্তি।

গ.১১ বাংলাদেশের শিল্পসমূহ কৃষিভিত্তিক, ভোক্তা বা লাইফ স্টাইলভিত্তিক এবং জ্ঞানভিত্তিক হিসেবে বিবেচিত হবে। কৃষিভিত্তিক শিল্পের প্রধানতম উদ্দেশ্য হবে দেশের কৃষিসম্পদের উন্নয়ন, কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াকরণ, দেশবাসীর খাদ্যের যোগান দেয়া এবং উদ্বৃত্ত কৃষিপণ্য রপ্তানি করা। ভোক্তা বা লাইফস্টাইল ভিত্তিক শিল্প মানুষের দৈনন্দিন প্রয়োজন, জীবন যাপনের মানবৃদ্ধি এবং সমৃদ্ধি ও সহায়তার জন্য গড়ে উঠবে। শিল্প কারখানাকে রাজধানী বা মেট্রোসিটির বদলে জেলা, উপজেলা এবং গ্রামে স্থাপন করতে হবে। কৃষি ও জ্ঞানভিত্তিক শিল্প স্থাপনে গ্রামই হবে

আদর্শ স্থান। দৈনন্দিন ভোক্তা পণ্য গ্রামেই উৎপাদিত হবে। প্রতি দশ হাজার মানুষের জন্য একটি করে ক্ষুদ্র শিল্প প্লট থাকতে হবে। উপজেলা ও জেলায় একটি শিল্প এলাকা থাকতে হবে। সরকার শিল্পখাতে ব্যাপক সহায়তা প্রদান করবে। সরকার শিল্পের বিকাশের অনুকূল শিল্পনীতি থাকা ছাড়াও শিল্প স্থাপনে জমি, সরঞ্জামাদি এবং অর্থের যোগান দেবে। দেশে উপযুক্ত স্থানে হাইটেক পার্ক, শিল্প পার্ক, সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক, গার্মেন্টস পল্লী, চামড়া পল্লী ইত্যাদি স্থাপন করা হবে। ভেনচার ক্যাপিটাল ও ইক্যুইটি এন্টারপ্রনেরশিপ ফান্ডের ব্যবস্থা করতে হবে। একই সাথে রপ্তানী সহায়তা ও ক্ষুদ্র-মাঝারি উদ্যোক্তা তহবিল গড়ে তুলে সরাসরি উদ্যোক্তাদের সহায়তা করতে হবে।

জ্ঞানভিত্তিক শিল্প ও সেবার ভিত্তি হবে মেধাভিত্তিক। পূর্বোক্ত খাতসমূহে প্রযুক্তি সরবরাহ, উচ্চতর প্রযুক্তির জন্য গবেষণা, তথ্যপ্রযুক্তিভিত্তিক ব্যবস্থাপনা ও দুর্নীতিরোধ ছাড়াও রপ্তানি আয় এই খাতের অন্যতম লক্ষ্য হবে। মেধা সৃষ্টি ও সুরক্ষার জন্য ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।

গ.১২ বর্তমানের কাগজভিত্তিক ব্যবস্থার বদলে স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে ডিজিটাল করতে হবে।

স্বাস্থ্য সেবা, চিকিৎসা ও হাসপাতালে ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করার পাশাপাশি ঔষধ প্রশাসন ও হাসপাতাল ব্যবস্থাপনা ডিজিটাল করতে হবে। উপযুক্ত পর্যায়ে টেলিমেডিসিন সেবা চালু করতে হবে।

গ.১৩ বাংলাদেশ বিশ্বের নিপীড়িত, শোষিত, দরিদ্র জনগণের পক্ষে থাকবে। একই সাথে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোকে নিয়ে একটি বৃহত্তর ইউনিয়ন বা আঞ্চলিক অর্থনৈতিক জোট গড়ে তুলতে নেতৃত্ব দেবে। এই অঞ্চলের দেশগুলোর মাঝে আন্তঃযাতায়াত এবং তথ্যপ্রযুক্তিগত যোগাযোগকে সুদৃঢ় ও সম্প্রসারিত করতে হবে। আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে এই দেশকে দৃঢ় অবস্থান নিতে হবে ।

আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক পর্যায়ের সকল তথ্য ডিজিটাল পদ্ধতিতে গ্রহণ ও প্রদান করতে হবে। আন্তঃদেশীয় যোগাযোগ ডিজিটাল পদ্ধতিতে হতে হবে।

গ.১৪ দেশের গণবাহন বা পাবলিক ট্রান্সপোর্ট ব্যবস্থাকে দ্রুতগতির, আরামদায়ক, নিরাপদ এবং স্বল্পব্যয়ী করতে হবে। জাতীয় রুটে দ্রুতগামী ট্রেন সার্ভিস চালু করার পাশাপাশি ঢাকা, চট্টগ্রামসহ অন্যান্য মহানগরীতে পরিকল্পিত নগর রেল, চক্রাকারে রেল, উপশহর রেল, আকাশ রেল বা পাতাল রেল স্থাপন করতে হবে। ঢাকাসহ বড় বড় মহানগরীতে ক্রসরোড, লেবেল ক্রসিং-এ ফ্লাইওভার-সুড়ঙ্গ পথ নির্মাণ করতে হবে। সিগন্যালিংসহ যোগাযোগ ব্যবস্থাকে কম্পিউটার নিয়ন্ত্রিত করতে হবে। সারাদেশে জাতীয় সড়ক ব্যবস্থাকে প্রশস্ত, আধুনিক ও নিরাপদ করার পাশাপাশি স্থানীয় পর্যায়ের, আঞ্চলিক মহসড়ক নেটওয়ার্ককে ব্যাপকভাবে সম্প্রসারিত করতে হবে। যেসব এলাকায় স্থায়ী সড়ক নির্মাণ করা যাবেনা সেইসব জায়গায় ডুবোসড়ক নির্মাণ করতে হবে। নদীমাতৃক বাংলাদেশের নৌপথকে কেবল নাব্য করা হবেনা এতে আরামদায়ক নৌযান চালু করাসহ স্পীডবোট, সীট্রাক ও হোভার ক্রাফ্টসহ দ্রুতগামীর যানবাহন চালু করতে হবে। বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক আকাশ চলাচল সুসংহত, উন্নত ও আধুনিক করতে হবে।

যানবাহনের নিবন্ধনসহ, নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনা এবং ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ডিজিটাল হবে। সকল গণবাহনের সময়সূচি ও চলাচলের তথ্য, বুকিং, অবস্থান ইন্টারনেটে-মোবাইল নেটওয়ার্কে সার্বক্ষণিকভাবে পাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। যানবাহন চলাচল ও ট্র্যাকিং-এর ক্ষেত্রে জিপিএস পদ্ধতি ব্যবহার করতে হবে।

গ.১৫ রাষ্ট্রকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য এবং বাঙ্গালীর সংস্কৃতিসহ দেশের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিস্বত্তার ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি রক্ষার জন্য সর্বাত্মক উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। মেধাসম্পদ রক্ষার যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

ডিজিটাল দুনিয়াতে রাষ্ট্রভাষাসহ বাংলাদেশের সকল ভাষার প্রচার, প্রকাশ ও বিকাশসহ বাঙালি ও অন্যান্য জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতির সার্বিক সমৃদ্ধির ব্যবস্থা করতে হবে। ডিজিটাল প্রযুক্তির নামে বাংলাভাষা ব্যতীত এককভাবে অন্য কোন ভাষায় কোন তথ্য প্রকাশ করা যাবে না। রাষ্ট্রকে ডিজিটাল তথ্যভাণ্ডার গড়ে তোলা ছাড়াও ডিজিটাল প্রকাশনাকে সর্বপ্রকারে উৎসাহিত ও সহায়তা করতে হবে।

গ.১৬ ধর্ম নিয়ে রাজনীতি করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করতে হবে এবং রাষ্ট্রধর্ম নামক কিছু থাকবে না। তবে রাষ্ট্রকে জনগণের ধর্ম পালনের সকল ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ রাষ্ট্র কর্তৃক পরিচালিত হতে হবে এবং প্রয়োজনীয় স্থানে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান স্থাপনসহ এসবের ব্যয় রাষ্ট্রকেই বহন করতে হবে। চাদার টাকায়, দানের টাকায় বা খাসজমিতে এ ধরনের প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার প্রথা বন্ধ করে রাষ্ট্রের বাজেটে এজন্য সুস্পষ্ট বরাদ্দ থাকতে হবে। মসজিদ, মন্দির গীর্জার যাবতীয় ব্যয়সহ এইসব প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের বেতন ও ভাতা সম্পূর্ণভাবে রাষ্ট্র বহন করবে।

<u>ধর্মচর্চার জন্য প্রয়োজনীয় সকল তথ্য ও উপাত্ত ডিজিটাল পদ্ধতিতে প্রকাশ করে তা অনলাইনে বিনামূল্যে সুলভ করতে হবে। মসজিদ-মন্দির-মক্তব ও মাদ্রাসার মাঝে এমনভাবে ইনফরমেশন কিয়স্ক স্থাপন করা হবে যাতে ধর্ম সংক্রান্ত তথ্যগুলো টাচ স্ক্রিণ-এর সহায়তায় খুব সহজেই যে কেউ পেতে পারে।</u>

আশা করি, রাজনৈতিক দলগুলো এই বিষয়গুলো গুরুত্ব দিয়ে ভাববে ও তারা ডিজিটাল বাংলাদেশের কর্মসূচি বাস্তবায়ন করবে। বিশেষ করে এখন যখন শেখ হাসিনা সরকারের এজেন্ডা হলো ২০২১ সালের মধ্যে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তোলা তখন পুরো দেশটিরই লক্ষ্য হলো ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করা।

৪. করণীয়: ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার জন্য বর্তমান সরকারকে এই মুহূর্তেই কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিতে হবে। সরকারের এই মুহূর্তের করণীয় হলো:

* 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' - এর মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন করা। এর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা ২০০৯ সহ সংশ্লিষ্ট সকল নীতিমালা আপডেট, সংশোধন বা প্রণয়ন করা। প্রস্তাবিত ২০১০-১৫ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও ২০১০-২১ প্রেক্ষিত পরিকল্পনায় অত্যন্ত স্পষ্টভাবে এটি করা হতে পারে। তথ্যপ্রযুক্তি নীতিমালা ২০০৯ আরও সংশোধন করা একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হতে পারে। বিশেষ করে এই নীতিমালাকে বছরভিত্তিক, মন্ত্রণালয়ভিত্তিক ও অগ্রাধিকারবিত্তিকভাবে বিন্যস্ত করে এর একটি সমন্বয়, পর্যবেক্ষণ ও বাস্তবায়ন কেন্দ্র স্থাপন করা।

* ডিজিটাল বাংলাদেশ কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য সুনির্দিষ্ট রোডম্যাপ প্রস্তুত করা এবং সেই রোডম্যাপ অনুসারে সকল কার্যক্রম গ্রহণ করা। এর লক্ষ্য হলো ডিজিটাল প্রযুক্তিনির্ভর একটি উন্নত জীবনের আকাঙ্ক্ষার প্রতিরূপ ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়া।

ডিজিটাল বাংলাদেশের মহাপরিকল্পনা ও রোডম্যাপ তৈরীর সময় সরকারকে স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করতে হবে যে, ডিজিটাল বাংলাদেশ নামক স্বপ্নটি বাস্তবে রূপায়নের জন্য মূল সমন্বয়কারী হিসেবে সরকারের কোন সংস্থা বা মন্ত্রণালয় বা কোন ব্যক্তি দায়িত্ব পালন করবে। এই সময়ে কাজগুলো কে, কিভাবে বাস্তবায়ন করবে এবং এর জন্য বাজেট বরাদ্দ কি প্রয়োজন হবে, বিশেষ করে সরকারের সহায়তা কতোটা প্রয়োজন হবে সেটি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে। কোন সময়কালের মধ্যে কোন কাজটি বা কোন কাজের কোন স্তরটি সম্পন্ন করা হবে, সেটিও উল্লেখ করতে হবে। ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ায় সরকারের প্রচেষ্টার পাশাপাশি বেসরকারী খাতের কোন কোন প্রতিষ্ঠান কিভাবে কাজ করবে সেটিও স্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে।

কালবিলম্ব না করে ডিজিটাল বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষ (এটি টাস্কফোর্স, বোর্ড, কমিটি, কর্তৃপক্ষ বা বিদ্যমান কোন সংস্থা হতে পারে।) নিদিষ্ট করতে হবে বা গঠন করতে হবে। এই সংস্থাকে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তোলার অভিভাবকত্ব দিতে হবে। একই সাথে এই কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় ক্ষমতা ও দায়িত্ব দিতে হবে। সাথে সাথে এই সংস্থাকে কারিগরি জ্ঞানসহ পর্যাপ্ত ও প্রয়োজনীয় তহবিল বরাদ্দ করতে হবে। ডিজিটাল বাংলাদেশের স্বপক্ষে জনমত তৈরীর জন্যও সরকারকে সচেষ্ট হতে হবে।

আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে উঠলে সেটি আমাদের রাষ্ট্রকাঠামোতে কেবল যে যুগ পরিবর্তন আনবে তা-ই নয়, আমাদের নিয়ে যাবে জ্ঞানভিত্তিক সমাজের দিকে। আসুন আমরা আমাদের সন্তানদের জন্য জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গড়ে তোলার অঙ্গীকার করি এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তোলার জন্য নিজের অবদানটুকু রাখার বিষয়টি নিশ্চিত করি।

৫. ডিজিটাল বাংলাদেশ বিষয়ক সতর্কতা: সারা দুনিয়াতেই ডিজিটাল প্রযুক্তির প্রসারের ফলে ডিজিটাল ডিভাইড তৈরী ও সম্প্রসারিত হচ্ছে। বাংলাদেশে ডিজিটাল বাংলাদেশ কর্মসূচী বাস্তবায়িত হলে এর প্রভাব হিসেবে বিদ্যমান ডিজিটাল ডিভাইড আরও সম্প্রসারিত হতে পারে। ডিজিটাল বাংলাদেশের সুযোগ সুবিধাভোগী, শোষকগোষ্ঠী, ধনী, বা বিশেষ সম্প্রদায় গোষ্ঠীর জন্য আরও বেশি সহায়ক হতে পারে। জ্ঞানভিত্তিক সমাজে জ্ঞানহীন বা জ্ঞানী হবার সুযোগহীন মানুষের জীবনযাপন আরও কষ্টকর হতে পারে। ডিজিটাল ডিভঅইড না রাখাটা ডিজিটাল বাংলাদেশের একটি লক্ষ্য হতে হবে।

৩১ আগস্ট ২০০৯

তৃতীয় অধ্যায়
ডিজিটাল বাংলাদেশ কর্মসূচি কেন

ডিজিটাল বাংলাদেশ কর্মসূচি ঘোষণা করার আর্থ-সামাজিক ও প্রযুক্তিগত অবস্থা নিয়ে এর আগে আমরা আলোচনা করেছি। বিশ্বের সর্বত্র জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গড়ে ওঠার সুতীব্র লক্ষণগুলো নিয়েও আমরা কথা বলেছি। এর আগে ডিজিটাল বাংলাদেশ কর্মসূচি নিয়েও আলোচনা প্রকাশ করা হয়েছে। সেখানকার আলোচনায় আমরা এটি নিশ্চিত হয়েছি যে, দুনিয়াটি বদলে গেছে এবং আমাদের বিদ্যমান রাজনীতি ও সমাজ ব্যবস্থা বদলাতে হবে। এই বদলে যাওয়া দুনিয়ার সকল কিছুতেই পরিবর্তনের যে প্রয়োজনীয়তা তার পেছনে অবশ্যই কিছু না কিছু কার্যকারণ বা যুক্তি আছে। এই অধ্যায়ে আমরা প্রাসঙ্গিক অন্য বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করে দেখতে চাই, এইসব খাত আমাদেরকে ডিজিটাল বাংলাদেশ কর্মসূচি প্রণয়ন করার জন্য কিভাবে আগ্রহী করেছে। বস্তুত আমাদের চারপাশের সকল বিষয় নিয়েই আমরা ডিজিটাল বাংলাদেশ কর্মসূচির কার্যকারিতা বিষয়ক আলোচনা করতে পারি। কারণ ডিজিটাল যুগ সকল ক্ষেত্রে পরিবর্তন আনছে। সবকিছু নিয়ে আলোচনা করা সম্ভব নয় বলে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয় নিয়ে এখানে আলোচনা করা হলো:এই আলোচনায় যথারীতি তিনটি অগ্রাধিকার বিষয় যেমন ডিজিটাল সরকার, ডিজিটাল শিক্ষাব্যবস্থা ও ডিজিটাল শিল্প-বাণিজ্য সম্পর্কে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

প্রথম অগ্রাধিকার ॥ ডিজিটাল সরকার

ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার জন্য প্রথম অগ্রাধিকারটি হলো ডিজিটাল সরকার। বিদ্যমান সরকার ব্যবস্থা পদ্ধতিগত ত্রুটির জন্য জনগণের সমৃদ্ধির জন্য সহায়ক না হয়ে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। এটি দুর্নীতিবাজ আমলাতন্ত্র কায়েম করে। এর কোন জবাবদিহিতা নেই। এটি অথর্ব, অদক্ষ এবং অকার্যকর। সেজন্যই এই সরকার পদ্ধতি বদল করতে হবে। প্রথমেই উদ্যোগ নিতে হবে সরকারের কাজ করার প্রচলিত পদ্ধতি বদলে ফেলার। এই বিপ্লবের নাম ডিজিটাল সরকার। লোকে একে কখনো কখনো ই-গভর্নমেন্ট বলে ভুল করে থাকে। এই বিভ্রান্তিটি তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ক কিছু পণ্ডিতও করে থাকেন। তারা প্রধানত বিগত শতকের ই-গভর্নমেন্ট এবং ডিজিটাল সরকারকে এক করে ফেলেন। বিগত শতকে কিছু লোক ইলেকট্রনিক ব্যবস্থার উন্নয়নের সাথে সাথে সবকিছুকেই ই বা ইলেকট্রনিক করার কথা ভেবেছিলো। তারা সাধারণ ডাককে ই-মেইল, সাধারণ ব্যবসাকে ই-কমার্স, প্রচলিত সরকারকে ই-গভর্নমেন্ট ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করে ইলেকট্রনিক ব্যবস্থার উন্নয়নের কথা বলতো। সেজন্যই সরকারের কিছু তথ্য ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে প্রকাশ করা বা কিছু তথ্য ই-মেইলে আদানপ্রদান করাটাকে ই-গভর্নমেন্ট বলা হতো। যখন তথ্যযুগ প্রিমিটিভ পর্যায়ে ছিলো তখন এসব কথা শুনতে ভালোই লাগতো। কিন্তু এখন তথ্যযুগ সেই পর্যায়ে নেই। একজন আমলা কারো কাছে একটি মেইল পাঠালেন এবং একটি সরকারি প্রতিষ্ঠানের কিছু তথ্য ইংরেজি ভাষায় ওয়েব পেজে রাখা হলো, তাতে সরকারের কাজ করার চরিত্র বদলায় না। ২০০১-০৬ সালের মইন খানের সরকার সেই চেষ্টাই করেছে। তারা শত শত কোটি টাকা ব্যয় করে কয়েকটি মন্ত্রণালয় ও বিভাগের ওয়েব পেজ তৈরী করেছে। এর বিনিময়ে কিছু লোক পেয়েছে কোটি কোটি টাকা। এইসব অর্থহীন ওয়েব পেজের ভাষা আবার ইংরেজি। ফলে সেগুলো মানুষের কোন কাজে লাগে না। ভারতের পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মতে সেখানকার শতকরা ৫ জনের বেশী ইংরেজি বোঝেনা। আমাদের দেশের শতকরা ১ ভাগও ইংরেজি বোঝে না। এজন্য বাংলা দরকার। সেজন্যই আমরা কোনভাবেই পূর্ববর্তী সরকারের এসআইসিটির নেতৃত্বে শুরু করা ই-গভর্নমেন্ট কার্যক্রমকে ডিজিটাল সরকার তৈরীর কাজ বলে মনে করি না। এটি আসলে জনগণের সাথে প্রতারণা করার জন্য করা হচ্ছিলো। আমরা ডিজিটাল সরকার বলতে একটি ওয়েব পেজ প্রকাশ করা বা কিছু ফরম সিডিতে বিতরণ করাকে বোঝাইনা। প্রকৃতার্থে ডিজিটাল সরকার এবং ই-গভর্নমেন্ট এক জিনিষ নয়। ডিজিটাল সরকারের চরিত্র কেমন হওয়া উচিত সে সম্পর্কে বলা যায়, Because government is not a monolithic entity but a collection of thousands of jurisdictions and agencies sharing responsibility for the public good, infrastructure

must be extended to situations at both the largest and smallest scales of operation for both government and civil society. Every community from the largest state to the smallest municipality needs to be connected in useful and affordable ways to a robust and flexible cyberinfrastructure. These problems of scaling up and scaling down, in both technical and economic terms, deserve close attention. http://www.digitalgovernment.org/library/library/pdf/dg_Cyberinfrastructure.pdf।

(সূত্রঃ আমেরিকার ডিজিটাল সরকার সংক্রান্ত কার্যপত্র থেকে) এতে বোঝা যায় যে, ডিজিটাল সরকার মানে কেবলমাত্র ওয়েব পেজ প্রকাশ করা বোঝায়না। এটি এমন এক কার্যক্রম যার প্রধানতম উদ্দেশ্য হলো কানেক্টিভিটি স্থাপন করা। এজন্য তোপখানা রোডের সচিবালয় থেকে গ্রাম পর্যন্ত একটি ডিজিটাল সংযোগসূত্র স্থাপন করতে হবে।

ডিজিটাল সরকার ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ডিজিটাল সরকারের ধারণার বাস্তবায়ন শুরু হয় ১৯৯৯ সালে। তারা এই প্রোগ্রামটির বাস্তবায়নের জন্য ব্যাপক গবেষণা শুরু করে। পাশাপাশি শুরু হয় সেইসব গবেষণাপ্রসূত ফলাফল বাস্তবায়ন। তাদের ধারণা হচ্ছে এমন, সরকার হলো একটি সামাজিক সংস্থা। তারা ডিজিটাল সরকারের সমস্যা সম্পর্কে বলেন, ডিজিটাল সরকারের সমস্যা কেবল কারিগরি বা প্রচলিত ব্যবসা বা সার্ভিস প্রদান করার নয়। এটি কেবলমাত্র একটি ব্যবসায়ী কার্যক্রমও নয়। বরং বাণিজ্যিকভাবে সরকারের প্রয়োজন ও চাহিদা মেটানোর উদ্যোগ দেখাই যায়না। এসব সমস্যার সমাধানে প্রয়োজন গবেষণার। In addition to Digital Government's ultimate reliance on utilization of technology, disciplines such as sociology, political science, public administration, business, and law are inextricably involved. The countless applications of information technology to different government services require the participation of researchers from fields as diverse as communications, statistics, transportation, social work, criminal justice, and architecture, to name only a few. Researchers in the NSF's DG program have collaborated at the federal, state, or local levels with government employees in a wide variety of areas.

যেসব খাতে সরকারের কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত বিষয়গুলো নিয়ে ব্যাপক গবেষণার প্রয়োজন তার মাঝে রয়েছে; সরকারের কাজ পরিচালনার নিয়ম ও পদ্ধতি, সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়-বিভাগ-অধিদপ্তর-সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের মাঝে আন্ত যোগাযোগ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া, স্থানীয় সংস্থাসমূহের সাথে যোগাযোগ ও নেটওয়ার্ক, জাতীয় পরিসংখ্যান অবকাঠামো, জন নিরাপত্তা ও আইন প্রয়োগ, সংকট ও দুর্যোগ মোকাবেলায় দ্রুত রেসপন্স করা ও এর জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো চাহিদা-তথ্যের মান ও সরবরাহ, জনগণের কাছে সরকারের তথ্য পৌছানোর ব্যবস্থা-মনিটরিং-সেন্সিং, ভোটার তালিকা-নাগরিকদের ভোটাধিকার ও প্রার্থীদের তথ্য, আইন প্রণয়ন কার্যক্রম, সাংসদ ও সংসদ বিষয়ক তথ্যাবলী, পরিবেশগত তথ্য সংহতকরণ-মনিটরিং ও ব্যবস্থাপনা, জনকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ড, গণ পরিবহন-রাজপথ-রেলপথ-সড়ক-নৌপথ-জাহাজ ও নৌ চলাচল, সরকারী সিদ্ধান্তগ্রহণ, নাগরিকদের সাথে মত বিনিময়, জবাবদিহিতা, অডিট, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা।

ডিজিটাল সরকার সম্পর্কে আমেরিকার রাজ্যগুলোর মাঝে ডিজিটাল সরকার প্রতিষ্ঠায় ২০০৪, ২০০৬ সালে প্রথম স্থান অধিকারী মিসিগান রাজ্যের গভর্নর বলেন,

"Information technology continues to play a critical role in creating efficiencies, and it remains at the heart of everything we are doing to provide government service to Michigan citizens," said Michigan Gov. Jennifer M. Granholm. "Whether it's making hunting and fishing licenses available online, or making it easier for businesses to get the permits they need, or providing an online talent bank for employers and job seekers to find each other, I'm proud of the many things we have done through technology to improve service to our citizens." (সূত্রঃ ডিজিটাল স্টেটস সার্ভে রিপোর্ট ২০০৭) সূত্র অনুযায়ী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ডিজিটাল সরকারের জন্য বাজার হলো ৮৭ বিলিয়ন ডলারের। আমরা অনুভব করি, বাংলাদেশ এই প্রেক্ষিতে তার যাত্রাও শুরু করেনি। অথচ জরুরী অবস্থা জারীর পরে এটি আরো তীব্রভাবে অনুভূত হয়েছিলো যে আমাদের জন্য একটি ডিজিটাল সরকার অবশ্যই দরকার।

আমরা ডিজিটাল সরকার বলতে সরকারের সকল তথ্য ডিজিটাল পদ্ধতিতে সংরক্ষণ, সরাসরি ডিজিটাল পদ্ধতিতে অনলাইন রিয়েলটাইম যোগাযোগ এবং ডিজিটাল পদ্ধতিতে সরকারের সকল কাজ করাকে বোঝাই। এজন্য সরকারের থাকবে একটি কেন্দ্রীয় ডাটাবেজ ও ন্যাশনওয়াইড নেটওয়ার্ক। সরকারের সকল তথ্য থাকবে কেন্দ্রীয় বা বিকেন্দ্রিকৃত ডাটাবেজে। কেন্দ্রীয় বা স্থানীয় ডাটাবেজটির সকল তথ্য স্তরভিত্তিক বিন্যস্ত হবে। যার যেসব তথ্য নিয়ে কাজ, সে সেইসব তথ্য সংগ্রহ, প্রক্রিয়াকরণ বা ব্যবহার করতে পারবে।

সরকারের সকল অফিস, বিভাগ, মন্ত্রণালয়, স্বায়ত্তশাসিত, আধা স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান এবং প্রশাসনের সকল স্তর এই নেটওয়ার্কে যুক্ত থাকবে। এমনকি সরকারি-বেসরকারি ব্যাঙ্কের হিসাব পর্যন্ত এই নেটওয়ার্কে যুক্ত থাকবে। সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগ (যেমন আয়কর-দুর্নীতি দমন কমিশন) যখন খুশি ব্যাঙ্কের তথ্য সংগ্রহ করতে পারবে।

এখন থেকে দুটি পর্যায়ে বর্তমান পদ্ধতির পরিবর্তন হবে। প্রথম পর্যায়ে ডিজিটাল পদ্ধতির পাশাপাশি কাগজের ব্যাকআপ থাকবে। ডিজিটাল পদ্ধতিতে কাজ করার পর কাগজের ব্যাক আপ ফাইল তৈরী করে রাখা হবে। দ্বিতীয় স্তরে কাগজের ব্যাকআপ বিলুপ্ত হবে। আমরা ধারণা করতে পারি বিদ্যমান কর্মীরা ডিজিটাল পদ্ধতিতে কাজ করার দক্ষতা রাখেন না। ফলে তাদের নতুন করে শিক্ষা গ্রহণ করার দরকার হবে। সরকার স্বখরচে এদেরকে প্রশিক্ষণ দেবে। যারা প্রশিক্ষণ নিতে আগ্রহী হবে না বা প্রশিক্ষণ নেবার পরও দক্ষতা অর্জন করতে পারবে না তাদের পক্ষে সরকারের কাজ করা সম্ভব হবে না। তারা সরকারী নিয়ম অনুযায়ী অবসরে যাবেন এবং তদস্থলে নতুন কর্মীবাহিনী কাজে যোগ দেবে। সরকারের নতুন রিক্রুটমেন্ট হবে ডিজিটাল সরকার চালনায় সক্ষম ব্যক্তিদের মধ্য থেকে।

এই ব্যবস্থায় সরকারের মাঝে দুর্নীতি থাকতে পারবে না। কারণ ফাইল আটকে রাখা বা তথ্য গোপন করার কোন পথ এতে খোলা থাকবেনা। বরং তথ্যের অবারিত প্রবাহ থাকবে বলে সরকারের পক্ষে যে কোন বিষয়ে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেয়া সহজ হবে। হাতের কাছে তথ্য থাকার জন্য এই সরকার অনেক বেশী দক্ষ হবে। ডিজিটাল পদ্ধতিতে সরকার পরিচালিত হলে তথ্যপ্রযুক্তির কল্যাণে এই সরকার হবে গতিশীল।

প্রশাসন হবে বিকেন্দ্রিকৃত এবং প্রশাসনের সকল স্তর ডিজিটাল পদ্ধতিতে একে অপরের সাথে তাৎক্ষণিক বা সার্বক্ষণিকভাবে যুক্ত থাকবে বলে এই বিকেন্দ্রীকরণের পরও সরকার একটি জীবন্ত সংগঠন হিসেবে কাজ করতে পারবে। সরকারের সকল অগোপনীয় তথ্য সকল মানুষের জন্য উন্মুক্ত থাকবে এবং ডিজিটাল পদ্ধতিতে জনগণ সরকারের যেকোন স্তর পর্যন্ত যোগাযোগ বা আবেদন করতে পারবে এবং আবেদনের ফলাফল জানতে পারবে। সরকার ডিজিটাল পদ্ধতিতে পেশ করা আবেদন বিবেচনা করবে এবং ডিজিটাল পদ্ধতিতে সরকার তথ্য প্রকাশ এবং বিতরণও করবে।

২০০৭ সালে ভোটার আইডি কার্ড সংক্রান্ত একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি সরকারের কাছে একটি সুপারিশমালা জমা দেয়। এই সুপারিশমালায় দেশের ভোটারদের একটি অনন্য পিন নং এবং ছবি ও বায়োমেট্রিক্স তথ্যসহ ডাটাবেজ তৈরীর প্রস্তাব করা হয়েছে। এই ডাটাবেজটি থেকেই ডিজিটাল সরকার যাত্রা শুরু করতে পারে। ভোটার ডাটাবেজ থেকে এটি ন্যাশনাল ডাটাবেজ হতে পারে। এরপর সেই ডাটাবেজটির সাথে সরকারের কেন্দ্রিয় ডাটাবেজ যুক্ত হতে পারে। এই ডাটাবেজটি সরকারের সকল তথ্যকে ডিজিটালি সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াকরণ করতে পারে।

একটি প্রমিত ডাটাবেজ সফটওয়্যারের আওতায় সরকারের তথ্যাদি সংরক্ষণ-যোগাযোগ, ব্যবস্থাপনাসহ সকল কর্মাদি সম্পন্ন করতে হবে। প্রতিটি মন্ত্রণালয় তাদের অতীত তথ্য ডিজিটাইজ করবে ও ডাটাবেজে রূপান্তর করবে। প্রস্তুতি কাজ সম্পন্ন করার পর কোন একটি সময় থেকে সরকার ফাইলবিহীন ডিজিটাল সরকার হিসেবে কাজ শুরু করবে। অন্যদিকে পুরনো রেকর্ডের তথ্য ডিজিটাল হয়ে নতুন ডাটাবেজে যুক্ত হতে থাকবে। ধরা যাক, প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয়ের অধীনে কেন্দ্রীয় তথ্যভাণ্ডার স্থাপিত হবে। সেই তথ্যভাণ্ডারের সাথে প্রতিটি মন্ত্রণালয়, বিভাগ, স্বায়ত্তশাসিত, আধাস্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানসহ পুলিশ, বিডিআর, আনসার, সামরিকবাহিনীর সংযোগ থাকবে। প্রতিটি প্রতিষ্ঠান ও সংস্থা নিজস্ব তথ্য সংরক্ষণ করার পাশাপাশি কেন্দ্রিয় তথ্যভাণ্ডারে তথ্য সংরক্ষণ করবে। প্রতিটি তথ্যের একাধিক ব্যাকআপ থাকবে। সকল গোপনীয় তথ্য ডিজিটালি নিরাপদ রাখা হবে। কর্মকর্তারা ডিজিটাল সিগনেচার ব্যবহার করবেন।

তথ্যপ্রযুক্তির বেশ কিছু সাফল্যের কথা বলার পাশাপাশি আমাদের মনে রাখতে হবে যে এখানে সরকারি কর্মকাণ্ড তেমন সফলতা পায়নি কখনোই। বিগত কয়েক বছরে দেশের অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ১৭ হাজারের বেশি সরকারী কম্পিউটার গেছে-কিন্তু সেইসব কম্পিউটার তেমন কোন পরিবর্তন আনতে পারেনি। ১৮৭ কোটি টাকার ভোটার আইডি কার্ড প্রকল্প সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়। মেশিন রিডেবল পাসপোর্ট জন্মের আগেই মারা যায়। সরকারের নিজের কাজেও তেমন কোন পরিবর্তন নেই। কম্পিউটার সরকারী অফিসে টাইপরাইটারের জায়গা দখল করছে মাত্র। অবশেষে ২০০৩ সালের মে মাসে বেগম খালেদা জিয়ার সরকার ই-গভর্নমেন্ট নামক একটি প্রকল্প গ্রহণ করে।

পরিকল্পনা কমিশনের অধীনে মোট ৮৩ কোটি টাকার এই প্রকল্পে ৫৫টি সরকারি প্রতিষ্ঠানে ই-গভর্নমেন্ট পরিকল্পনা বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। ২০০৭ সালে এসে দেখা যায় যে ৫৫টির মাঝে ১২টি প্রকল্প পুরোপুরি বাস্তবায়িত হয়েছে। ৮টি প্রকল্পের শতকরা ৭০ ভাগ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। অন্য ১৬টি প্রকল্পের কাজ শতকরা ৭০ ভাগও হয়নি। অবশিষ্ট ১৯টি প্রকল্প এখনো পরিকল্পনা স্তরে আছে (সূত্র: বেসিস নিউজলেটার মার্চ ২০০৭)।

কিন্তু দুর্ভাগ্য অন্য স্থানে। এইসব প্রকল্প যতোটাই বাস্তবায়িত হোকনা কেন দেশের সাধারণ নাগরিকদের খুব কমই কাজে লাগে। অসম্পূর্ণ ভুল তথ্য, আপডেট না করা, বাংলার বদলে ইংরেজিতে ওয়েবপেজ তৈরী করা, স্থির ধরনের ওয়েবপেজ তৈরী করা ইত্যাদি নানা কারণে তথাকথিত ই-গভর্নমেন্ট পরিকল্পনা কার্যকর হয়নি।

স্থানীয় সরকার: বাংলাদেশের বর্তমান সরকার পদ্ধতি সংসদীয় ও এককেন্দ্রিক। ১৯৭২ সালের সংবিধান অনুযায়ী বাংলাদেশের সরকার পদ্ধতি সংসদীয় হবার কথা। সেটি পরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের একদলীয় বাকশাল, জিয়া-এরশাদের সামরিক শাসন এবং তাদেরই সামরিক শাসনোত্তর রাষ্ট্রপতিশাসিত সরকার পদ্ধতি অতিক্রম করে এখন পর্যন্ত অবশেষে সংসদীয় পদ্ধতিতেই অবস্থান করছে। কপাল ভালো যে ৯১-এর পর এখন পর্যন্ত সংবিধানকে পাশ কাটিয়ে বা স্থগিত করে কোন সরকার দেশ পরিচালনা করতে আগ্রহী হয়নি। এর ভালোমন্দ নিয়ে অনেক কথা আছে। কিন্তু তবুও এখন পর্যন্ত আমরা এই সংসদীয় পদ্ধতির চাইতে ভালো কিছু আবিষ্কার করতে পারি নি।

আমাদের দেশের সর্বোচ্চ সাংবিধানিক সংস্থাটির নাম জাতীয় সংসদ। ৯১-এর পর ১৭ বছর সময়জুড়ে সংসদের কার্যকারিতা নিয়েও কথা আছে। সাধারণভাবে ছোট একটি দেশের জন্য এই ধরনের ওয়েস্টমিনিস্টার স্টাইলের এই সংসদীয় ব্যবস্থা উপযুক্ত বলে মনে করা হতো। তবে এ দেশে বারবার একে বদলানোর চেষ্টাও করা হয়েছে। পরীক্ষা নিরীক্ষাও কম হয়নি। এখনো সেই চেষ্টার কমতি নেই। দুই কক্ষ বিশিষ্ট সংসদ, রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার, সংসদীয় ও রাষ্ট্রপতি শাসিতের মাঝে সমন্বয় ও ক্ষমতার ভারসাম্য রক্ষা; এসব বিষয় নিয়ে অনেক প্রস্তাবনা আছে। যদিও আমাদের সংসদীয় পদ্ধতির সাফল্য এবং ব্যর্থতার মাঝে ব্যর্থতার পাল্লাই ভারী এবং সাম্প্রতিক জরুরি অবস্থা ছাড়াও অতীতের সামরিক শাসনসমূহকে আমাদের গণতান্ত্রিক শাসনের দুর্বলতা বলেই অভিযোগ করা হয়, তথাপি আমার ধারণা এটি কেবল ব্যবস্থার ত্রুটি নয়। ত্রুটি হচ্ছে তাদের, যারা এই ব্যবস্থায় অংশগ্রহণ করে আসছে। ফলে ব্যবস্থা পরিবর্তন করার যেসব কথা বলা হচ্ছে তাতেও সাফল্য আসবেনা যদি প্রকৃত ত্রুটি না সারানো হয়। রাজনীতির সংস্কার ও রাজনৈতিক দলগুলোর সংস্কার ইত্যাদির ওপর ব্যবস্থার কার্যকারিতা নির্ভর করে। তবে কোন নির্বাচনী ব্যবস্থায় এই সংস্থাটি গঠিত হয় তার ওপরই বেশি নির্ভর করে এতে কারা অংশ নিতে পারে। আমাদের সংসদীয় নির্বাচন পদ্ধতি যেভাবে কার্যকর ছিলো তাতে কোনভাবেই সংসদীয় পদ্ধতির মতো একটি ব্যবস্থা সচল থাকতে পারেনা। এজন্য আরো কিছু সেফগার্ড দরকার। আমি মনে করি, রাষ্ট্রপতি পদ্ধতি বা দুই কক্ষবিশিষ্ট সংসদ হলেও এই অবস্থার পরিবর্তন হবেনা, যদি প্রকৃতভাবেই সংসদে যাবার পদ্ধতি ও সেখানে যারা পৌছান সেই মানুষগুলোর চরিত্র বদলানো না যায়। আমি এটি বলছিনা যে, সংসদে যাবার মতো ভালো মানুষ নেই দেশে। আমি শুধু এটি বলছি যে, সংসদে যাবার যে পদ্ধতিটি আছে সেটি যথাযথ নয়। সূতরাং গণতন্ত্রের সাফল্যের জন্য সরকার পদ্ধতি নয়, পরিবর্তন দরকার নির্বাচন পদ্ধতিতে। আমি ব্যক্তিগতভাবে যৌথনেতৃত্ব এবং অনেক লোকের অংশগ্রহণে ঐকমত্যের সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিশ্বাস করি। সেজন্য রাষ্ট্রপতি শাসন পদ্ধতিকে আমার কাছে স্বৈরাচারী শাসনব্যবস্থা মনে হয়। অবশ্য সংসদীয় পদ্ধতিতেও স্বৈরাচার জন্ম নিতে পারে যদি সংসদ কার্যকর না হয়। আমি মনে করি, প্রচলিত সংসদীয় ব্যবস্থায় সংখ্যাগরিষ্ঠ মতামতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ কখনোই সবচেয়ে বেশি কার্যকর হয়না। সরকার গঠনে দুই তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা সমস্যা তৈরী করলেও আইন প্রনয়নে শুধুমাত্র সংখ্যাগরিষ্ঠতা ভালো পদ্ধতি নয়। আমাদের সংসদীয় ব্যবস্থা থেকে আইন প্রনয়ণে সংখ্যাগরিষ্ঠতার সরকার পদ্ধতি বদল করে দুই তৃতীয়াংশ বা তিন পঞ্চমাংশ সমর্থন এবং দলীয় সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ভোট দিতে বাধ্য না করার বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। সংসদে যদি কেউ স্বাধীনভাবে মতপ্রকাশ করতে না পারে তবে দলীয়করণ চূড়ান্ত হয়ে যায়। এজন্যই দলীয় টিকেটে নির্বাচিত হলেও সাংসদদের স্বাধীন মত প্রকাশের ব্যবস্থা থাকা উচিত। আইন পাশ করার জন্য তিন পঞ্চমাংশ সমর্থন বা দুই তৃতীয়াংশ সমর্থন থাকার পাশাপাশি সংসদীয় কমিটিগুলোর কার্যকারিতা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে। সংসদের স্থায়ী কমিটির পাশাপাশি উপদেষ্টা কমিটি বা বিশেষজ্ঞ কমিটির কার্যকারিতাও চালু করা যেতে পারে। তবে বাংলাদেশের সংসদীয় গণতন্ত্রের সাফল্যটি নির্ভর করবে এই দেশের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার সাফল্যের ওপর। গত ৩রা জুন ২০০৮ ব্যবসায়ীদের সাথে সংলাপ করার সময় সাবেক প্রধান উপদেষ্টা ফখরুদ্দিন আহমেদ অত্যন্ত চমৎকারভাবে বলেছেন যে, কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে স্থানীয় সরকারের ক্ষমতার পৃথকীকরণ বা বিকেন্দ্রীকরণ করা খুবই জরুরি। সংসদীয় পদ্ধতির নামে সংসদ সদস্যরা যে তাদের নির্বাচনী এলাকার পাড়া-মহল্লা, মাস্তান এবং প্রকল্প

সবকিছুই নিয়ন্ত্রণ করেন সেটি আগে বন্ধ হতে হবে। আইন প্রণেতারা এসব কাজে যুক্ত থাকতে পারবেনা-এমন প্রথা দরকার। এর সাথে সংবিধান সংশোধন করারও প্রয়োজন নেই। প্রয়োজন হলো সরকারের আচরণে পরিবর্তন করা।

কেন্দ্রিয় ও স্থানীয় সরকার পদ্ধতি: বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার হলো পাকিস্তান আমলের ছকে বাধা। এখানে প্রশাসনিক ব্যবস্থায় রাজধানীর পর বিভাগ আছে। তবে বিভাগের কোন কার্যকারিতা নেই। এরপর জেলা আছে, উপজেলা আছে। তবে স্থানীয় সরকারের সর্বনিম্ন কার্যকর স্তর হলো ইউনিয়ন। যদিও মরহুম জিয়াউর রহমান গ্রাম সরকার নামক একটি ব্যবস্থা প্রচলন করেছিলেন তথাপি সেটি কাগজেই ছিলো। এটির অস্তিত্ত্ব এখন আর নেই। এর কোন কার্যকারিতা এমনকি জিয়াপত্নী খালেদা জিয়াও তৈরী করেননি। এজন্যই বাস্তবে সংসদের পর এখন নির্বাচিত স্তর হলো উপজেলা এবং ইউনিয়ন/পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশন। স্বৈরশাসক এরশাদ উপজেলা ব্যবস্থা প্রচলন করেন। প্রথমে তিনি উপজেলার আমলাতন্ত্র বা প্রশাসনকে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের অধীনস্থ করলেও পরে তা বাতিল করেন। একসময়ে তিনি উপজেলায় বিচারব্যবস্থা চালু করলেও তা ধরে রাখা যায়নি। এরপর হাসিনা খালেদা উপজেলাকে স্বীকার করলেও কার্যকর করেননি। শেষ পর্যন্ত ২০০৯ সালে উপজেলা নির্বাচন হয়েছে, তবে সাংসদদের খবরদারির জন্য এটি কতোটা কার্যকর হবে তা বলা কঠিন। আমরা লক্ষ্য করেছি নির্বাচনের আগে আওয়ামী লীগ যা বলেছে নির্বাচনের পর তা মনে রাখেনি। নির্বাচনের আগে বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা সম্পর্কে একটি সুন্দর নিবন্ধ লিখেছিলেন আওয়ামী লীগ নেতা, সাবেক আমলা এবং বর্তমান অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আব্দুল মুহিত। গত ৩ মে ২০০৭ দৈনিক যুগান্তর পত্রিকায় প্রকাশিত তার এই নিবন্ধে তিনি স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার পর্যালোচনা করে এর জন্য কিছু সুপারিশ পেশ করেন। 'স্বশাসিত স্বয়ম্ভর স্থানীয় সরকার' নামের এই নিবন্ধে তিনি বলেন, "পৌর প্রতিষ্ঠান ছয়টি মহানগর কর্পোরেশন ও ২৫৪টি পৌরসভা বাদ দিলে আমাদের স্থানীয় সরকার নিয়ে চারটি আইন আছে এবং মাঠে দুই স্তরে সরকারের কাঠামো আছে। প্রথম আইনটি হল ১৯৮৩ সালের ইউনিয়ন পরিষদ আইন। ইউনিয়ন পরিষদ এক হিসেবে ১৮৮৩ সালে প্রথম গঠিত হয়। ১৮৮৫ সালের স্থানীয় সরকার আইনেও তাদের অবস্থিতি স্বীকৃত হয় এবং ১৯১৯ সালেই বর্তমান ইউনিয়ন পরিষদের জন্ম হয়। তাই প্রতিষ্ঠানটি অনেক পুরনো। তাদের প্রথম থেকেই দায়িত্ব ছিল শিক্ষা, স্যানিটেশন ও যোগাযোগ। ১৯৮৩ সালের আইনে এই পরিষদের দায়িত্ব ৩৮টি, তবে ১০টি হল বাধ্যতামূলক। এগুলো হল– (১) আইন-শৃংখলা রক্ষা করা এবং এ বিষয়ে প্রশাসনকে সহায়তা, (২) অপরাধ, বিশৃংখলা ও চোরাচালান দমনে পদক্ষেপ, (৩) কৃষি, পশু ও মৎস্য পালন, স্বাস্থ্য, কুটির শিল্প, সেচ, যোগাযোগ ইত্যাদি ক্ষেত্রে উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ ও পরিচালনা, (৪) পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমের প্রসার, (৫) স্থানীয় সম্পদের উন্নয়ন ও ব্যবহার, (৬) জনগণের সম্পত্তি সংরক্ষণ, রাস্তা, পুল, টেলিফোন, বাঁধ, খাল, বিদ্যুৎ ইত্যাদি, (৭) স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহারে উৎসাহ, (৮) জন্ম-মৃত্যু, অন্ধ, ভিক্ষুক ও দুস্থদের নিবন্ধন, (৯) সব ধরনের শুমারি পরিচালনা, (১০) ইউনিয়ন পর্যায়ে অন্যান্য সংস্থার কার্যাবলী পরিচালনা ও সুপারিশ। তালিকাটি পড়লেই বোঝা যাবে, তাদের কোন কার্যকরী ভূমিকার সুযোগ নেই। সব বিষয়েই আমাদের জাতীয় সরকার সক্রিয় এবং তাদের আমলাতন্ত্র এসবে লিপ্ত। বাস্তবে ইউনিয়ন পরিষদ দু'একটি কাজ করে। সরকার যেসব সামাজিক নিরাপত্তার খাতিরে পেনশন দেয় তারা তা বিতরণ করে এবং কিছু অনুদান দিয়ে রাস্তাঘাট বা পুল গড়ে ও স্কুলে বিনিয়োগ করে। কোন কোন ইউনিয়ন ছাত্রদের বৃত্তি দেয়। ইউনিয়নের চৌকিদার পুলিশের হুকুম তামিল করে। ইউনিয়ন আসলেই একটি ছোট ইউনিট। ১০-১৫ হাজার লোকের বাস একটি ইউনিয়নে। অর্থনৈতিক কর্মকান্ড বা প্রশাসন পরিচালনার জন্য অনুপযুক্ত প্রতিষ্ঠান।

১৯৯৭ সালে পাস হয় গ্রাম পরিষদ আইন। প্রতিটি ইউনিয়ন ওয়ার্ডের জন্য হয় এই প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ গড়ে পাঁচশ' পরিবারের জন্য হয় এই পরিষদ। আইন পাস হওয়ার পরই মনে হয় এটি ছিল একটি অর্থহীন প্রতিষ্ঠান সৃষ্টির প্রয়াস। তাই তার বাস্তবায়ন ঠেকিয়ে রাখা হয়। তবে দুর্বৃত্ত রাজাকার সরকার দেখে যে, এমনই একটি প্রতিষ্ঠানে বাটপার, টাউট আর সন্ত্রাসীদের জন্য একটি স্থান করে দেয়া যায় এবং নির্বাচিত ইউনিয়ন পরিষদকে চ্যালেঞ্জ করা যায়। তার ফলে গ্রাম পরিষদ বহাল আছে, আর তাতে সদম্ভে বিরাজ করছে বিএনপি-জামায়াতের বাটপার, লুটেরা ও টাউট গোষ্ঠী।

তৃতীয় আইনটি হল ১৯৯৮ সালের উপজেলা পরিষদ আইন। এ আইনে উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান নির্বাচনের ব্যবস্থা আছে। উপজেলার দায়িত্ব ১৮টি এবং ৭টি স্থায়ী কমিটির তাতে বিধান আছে। এই সাত কমিটির নাম দেখলেই বোঝা যায়, উপজেলায় কী কার্যাবলী হতে পারে। এ কমিটিগুলো হল– ১. আইন-শৃংখলা কমিটি ২. স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কমিটি ৩. কৃষি, সেচ ও পরিবেশ কমিটি ৪. শিক্ষা কমিটি ৫. সমাজকল্যাণ, শিশু ও মহিলা উন্নয়ন কমিটি ৬. ক্রীড়া, সংস্কৃতি ও যুব উন্নয়ন কমিটি ৭. যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন কমিটি। এ আইনে আরও আছে, জাতীয় সরকারের কিছু প্রতিষ্ঠান ও কার্যাবলী উপজেলায় হস্তান্তর করা যেতে পারে। এরকম

১০টি প্রতিষ্ঠানের তালিকা আছে যথা– প্রাথমিক শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা, কৃষি সম্প্রসারণ ইত্যাদি। এসব প্রতিষ্ঠানকে উপজেলা পরিষদে হস্তান্তর করলে সত্যিই তাদের কিছু কাজ করার থাকবে। সেই হিসেবে উপজেলা পরিষদ গঠিত হলে কিছু বিকেন্দ্রীকরণ হবে এবং কিছু বিষয়ে স্থানীয় পরিষদ দায়িত্ব পাবে। তবে তাতেও সমস্যা থেকে যাবে। এসব প্রতিষ্ঠানের যেগুলো জাতীয় সরকার থেকে উপজেলায় অর্পিত হবে সেসব প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তারা কিন্তু জাতীয় সরকারের কাছেই দায়বদ্ধ থাকবেন। আমাদের দেশে প্রায় পাঁচশ' উপজেলা আছে। তার মধ্যে নারায়ণগঞ্জ সদরে জনসংখ্যা নয় লাখ আর মুজিবনগর উপজেলায় জনসংখ্যা মাত্র নয় হাজার (পার্বত্য উপজেলায় অবশ্যই জনসংখ্যা খুব কম)।..........চতুর্থ আইন হল ২০০০ সালের জেলা পরিষদ আইন। মনে রাখা প্রয়োজন, বাংলাদেশে কোনদিন জেলা পরিষদের নির্বাচন হয়নি। জেলা পরিষদ আসলেই একটি অপব্যয়ের জন্য আমলাতন্ত্রের অধীন প্রতিষ্ঠান। রাজাকার সরকার এ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে প্রচুর লুটপাট করেছে এবং তাদের স্থানীয় নেতাদের হর্ম্য বানিয়েছে, প্রাসাদ সাজিয়েছে ও তাদের পোষ্যদের হাতে সম্পদ তুলে দিয়েছে। জেলা পরিষদের বর্তমান আইনটি খুবই দুষ্ট এবং এতে জেলা পরিষদকে একটি কার্যকরী প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার সুযোগ খুব সীমিত। জেলা পরিষদের দায়িত্বের ফর্দ লম্বা, ৮০টি। তবে আবশ্যিক কাজ মাত্র ১২টি। এখানে জাতীয় সরকারের প্রতিষ্ঠান বা দায়িত্ব হস্তান্তরেরও কোন বিধান নেই। নির্বাচন পদ্ধতিও আইয়ুবের পরোক্ষ নির্বাচনকে মনে করিয়ে দেয়। তাই জেলা পরিষদ বানাতে হলে প্রথমেই এই আইনের আমূল সংস্কার করতে হবে।

জনাব মুহিত মনে করেন যে, বিভাগ নামক কোন প্রশাসনিক স্তর থাকার দরকার নেই। তিনি প্রদেশ গঠনেরও বিপক্ষে। তার মতে প্রয়োজন জেলা সরকারের। ৬৪টি জেলা ও ৬টি মহানগরে মোট ৭০টি সরকার প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করে তিনি এইসব সরকারকে গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত করে আমলাদেরকে তাদের অধীনস্থ করে জেলা প্রশাসক পদটি বিলুপ্ত করার সুপারিশ করেন। তার মতে, জাতীয় সরকারকে ছেঁটে ফেলে সারাদেশে ৬৪টি কার্যকরী জেলা সরকার আর ছয়টি মেট্রো মহানগর সরকার প্রতিষ্ঠা করতে পারলে এক ঢিলে সাতটি পাখি ধরা যাবে। (১) দেশব্যাপী যে রাজনৈতিক বিভক্তি রয়েছে তার উপশম হবে। (২) কেন্দ্রীয় দায়হীন শ্বেতহস্তী ১০ থেকে ১৫ লাখের আমলাতন্ত্র বিদায় হবে। (৩) কেন্দ্রায়নের যে অদক্ষতা ও জবাবদিহিহীনতা বিরাজমান তার অবসান হবে। (৪) কেন্দ্রীয়ভাবে রাজস্ব আদায়ের ফলে যে করজালের সংকোচন থাকে তা থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে। (৫) সরকারি কর্মচারীদের শিথিল পর্যবেক্ষণ ও দায়হীনতার অবসান হবে। (৬) একটি জনবিচ্ছিন্ন ও দুর্নীতিপরায়ণ প্রশাসনের গভীর অভিশাপ নিয়ন্ত্রণে আসবে এবং (৭) সরকারি সিদ্ধান্ত ও কর্মকান্ডে জনগণের অংশীদারিত্ব নিশ্চিত হবে।

জনাব মুহিত মনে করেন, "জেলা সরকারেই আছে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ। আইন করে জেলা সরকারকে দায়িত্ব দিতে হবে। যে ক্ষেত্রে জেলা সরকার দায়িত্ব নেবে, সেখানে জাতীয় সরকার শুধু সমন্বয়, লক্ষ্য নির্ধারণ ও জাতীয় মানের দায়িত্ব নেবে। তাই সরকারি জনবল সব হবে জেলা সরকারের। এসব দায়িত্ব কী হতে পারে সে ব্যাপারেও সহজেই সিদ্ধান্ত নেয়া যায়। দ্বিতীয়ত জেলা সরকারের অর্থায়নের ব্যবস্থা করতে হবে এবং সেক্ষেত্রে কাজটি খুবই সহজ। কেন্দ্র ও প্রদেশের মধ্যে রাজস্ব ভাগ করার ব্যবস্থা জেলা ও জাতীয় সরকারের মধ্যে নির্ধারিত হতে পারবে। তৃতীয়ত হল– জেলা প্রশাসনকে স্বাধীন ও স্বয়ম্ভর করতে হবে। নির্বাহী নেতৃত্ব হবে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের এবং প্রশাসন হবে তাদেরই অধীনে। কেন্দ্রীয় আমলাতন্ত্র সংকুচিত হবে আর প্রতিটি জেলায় হবে তাদের নিজস্ব কর্মকর্তা। স্বশাসিত, স্বনির্ভর ও নির্বাচিত জেলা সরকারের বিপক্ষ হল জাতীয় পরিষদের সদস্যবৃন্দ এবং জাতীয় আমলাতন্ত্র। তবে রাজনীতিবিদদের বিরোধিতা মোকাবেলা সহজ। প্রথম হল জনমতের জোয়ার সৃষ্টি এবং দ্বিতীয় হল জেলা পর্যায়ে নেতৃত্বের সুযোগ। প্রতিটি জেলার চেয়ারম্যান হবেন মন্ত্রীর মর্যাদায় ভূষিত, তার ডেপুটিকেও সেই মর্যাদা দেয়া যায়। জেলায়ও হবে সংসদীয় গণতন্ত্র; সদস্যরা সব সরাসরি নির্বাচনে নিযুক্ত হবেন। তারা তাদের নেতা নির্বাচন করবেন এবং তিনিই হবেন চেয়ারম্যান। কিন্তু যারা হবেন বিভিন্ন দফতরের জন্য নির্বাহী নেতা তাদের কিন্তু দায়িত্ব পালনে সর্বদলীয় কমিটির সঙ্গে ক্ষমতা ভাগাভাগি করতে হবে। বিলেতের কাউন্টি কাউন্সিলের মতো নির্বাহী কর্তা হবেন বিভিন্ন কমিটির আহ্বায়ক আর কমিটিগুলোতে থাকবেন বিভিন্ন দলের সদস্যবৃন্দ, যারা আনুপাতিক হারে স্থান পাবেন। এ ব্যবস্থায়ই দলের চেয়ে জনস্বার্থ পাবে প্রাধান্য এবং রাজনৈতিক বিভক্তি প্রশমিত হবে। এই গণতান্ত্রিক জেলা সরকারে কোন জেলা প্রশাসকের প্রয়োজন থাকবে না। বিভিন্ন বিভাগ বা দায়িত্বের জন্য থাকবেন সরকারি কর্মকর্তা। তাদের

বিভাগীয় পরিচালক হিসেবে বিবেচনা করা হবে এবং তারা হুকুম নেবেন সংশ্লিষ্ট কমিটির আহ্বায়কের কাছ থেকে। আমার হিসাবে জেলা সরকারের দায়িত্ব হবে ১৭টি। যথা– (১) আইন ও শৃংখলা রক্ষা এবং পুলিশ বাহিনী গঠন ও নিয়ন্ত্রণ। (২) প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা এবং সংশ্লিষ্ট বৃত্তিমূলক শিক্ষা। (৩) জনস্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা ও স্যানিটেশন। (আঞ্চলিক গবেষণা ও হাসপাতাল থাকবে জাতীয় সরকারের হাতে।)

(৪) সামাজিক নিরাপত্তা ও সমাজসেবা। (৫) গবেষণা ছাড়া কৃষির সার্বিক দায়িত্ব। (৬) গবেষণা, জাতীয় উদ্যান ও সংরক্ষিত বন ছাড়া সমুদয় বন সম্পদ। (৭) গবেষণা ও আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে পশুসম্পদ। (৮) গবেষণা ও সামাজিক সম্পদ ব্যতিরেকে মৎস্য সম্পদ। (৯) স্থানীয় পূর্তকর্ম ও আবাসন। (১০) জেলা ও গ্রামীণ যোগাযোগ ব্যবস্থা। (১১) জেলাভিত্তিক জ্বালানি সম্পদ ও বিদ্যুৎ সরবরাহ। (১২) জেলাভিত্তিক পানিসম্পদ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও সুপেয় পানি ব্যবস্থা। (১৩) মধ্যম, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প। (১৪) ভূমি প্রশাসন ও ভূমি রাজস্ব (১৫) খাদ্যগুদাম ও সরবরাহ ব্যবস্থা। (১৬) ত্রাণ ব্যবস্থাপনা। (১৭) বিনোদন ও প্রমোদ।
১০-১২টি কমিটি এসব দায়িত্বের কর্ণধার হবে। প্রতিটি দায়িত্বের জন্য থাকবে একটি দফতর, যার একজন পরিচালক বা সচিব থাকবেন। তাদের কর্মকর্তারা হেডকোয়ার্টারে এবং মাঠে (উপজেলা ও ইউনিয়নে) নিযুক্ত থাকবেন। তাদের কাজ পর্যবেক্ষণ করা ও তাদের মূল্যায়ন হবে সহজতর এবং তাদের জবাবদিহিতা থাকবে সবল ও সতেজ।”
আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহারের প্রধান সমন্বয়কারী ও অর্থমন্ত্রী জনাব মুহিতের বক্তব্যের অনেক কিছুর সাথেই আমি একমত। কিন্তু মনে হচ্ছে আওয়ামী লীগ সরকারই এই ধারণার সাথে একমত নয়। এখন পর্যন্ত মুহিত সাহেবের প্রস্তাবনার সামান্য অংশ বাস্তবায়নের কোন উদ্যোগ নেয়া যায় নি।
পঞ্চায়েৎ ও অন্যান্য স্থানীয় সরকার: আওয়ামী লীগ নেতা ও অর্থমন্ত্রী জনাব মুহিত সার্বিকভাবে বাংলাদেশের বিদ্যমান স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা ও সম্ভাব্য পরিবর্তন বিষয়ে তার মতামত দিয়েছেন যা আমরা এর আগে আলোচনা করেছি। তিনি বিভাগ পর্যায়ের অকার্যকর স্তরটি বিলুপ্ত করে জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন স্তরটি কার্যকর করার প্রস্তাব করেছেন। একই সাথে তিনি জেলা পর্যায়ের অকার্যকর ব্যবস্থাটিকে একটি জনপ্রতিনিধিত্বমূলক করার কথা বলেছেন। একে প্রদেশ বা রাজ্য সরকারের মতো করার কথাও বলেছেন তিনি। একই সাথে তিনি ছয়টি মহানগরকে জেলা সরকারের পর্যায়ে নিয়ে যাবার প্রস্তাব করেছেন। এর ফলে তার প্রস্তাবিত সরকারের সংখ্যা দাড়াচ্ছে ৭০টি। আমরা জানি যে, এর বাইরেও অনেকে প্রদেশ করার এবং দ্বিকক্ষবিশিষ্ট সংসদ করার প্রস্তাব করেছেন। কেউ কেউ উপজেলাকেই স্থানীয় সরকারের কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার জন্য প্রস্তাব করেছেন। আমরা একটি জাতীয় সরকার এবং তার অধীনে স্থানীয় সরকারের ধারণাটিকেই সমর্থন করি। এমন ছোট একটি দেশে কয়েকটি প্রাদেশিক সরকার না থাকাই ভালো। বরং জাতীয় সরকারের সাথে সেতুবন্ধন গড়ে তোলার জন্য জেলা পর্যায়ের একটি সরকার বা সংসদ খুবই কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে। তবে বর্তমানে বিদ্যমান ৭০টি জেলার গঠন যথাযথভাবে করা হয় নি বলে এগুলোকে পুনর্গঠিত করা যেতে পারে। আমার মনে হয় না যে, আমাদের এই দেশটিতে সত্যি সত্যি ৬৪টি জেলা হতে পারে। এমন অনেক ছোট ছোট জেলা আছে যার আলাদা জেলা হওয়া উচিত ছিলোনা। এককালীন মহকুমাকে কোন বাছবিচার ছাড়াই জেলায় উন্নীত করার এই অবস্থাটি হয়েছে। আমি মনে করি, সাকুল্যে ৪৪টি জেলা এবং ৬টি মহানগর মিলে মোট ৫০টি জেলা সরকার হতে পারে। তবে যদি আরো জটিলতা সৃষ্টি হবে বলে মনে করা হয়, তবে প্রশাসনিক কাঠামোর বর্তমান রূপকাঠামো অনুসরণ করা যেতে পারে। তবে সবচেয়ে বড় বিষয়টি হচ্ছে স্থানীয় সরকারের তৃণমূল পর্যায়ের স্তরটি কিভাবে কার্যকর হবে। আমরা সেদিকে একটু নজর দিতে পারি।
ঐতিহাসিকভাবে স্থানীয় সরকার হিসেবে এই অঞ্চলে প্রাচীনকালে পঞ্চায়েৎ প্রথা চালু ছিলো। পঞ্চায়েত মানে পাচের অধিক মানুষের সমাগম। এখনো লোকে বলে ‘দশে যা বলে’। অর্থাৎ গ্রামের দশজন মানুষ এখনো সমাজের প্রধান। এতে বোঝা যায়, পঞ্চায়েৎ প্রথাটি গ্রামের মানুষের যুথবদ্ধ জীবনের সাথে প্রাচীন কাল থেকেই যুক্ত। প্রাচীনকালে পঞ্চায়েতের লোকজন রাজা কর্তৃক মনোনীত বা গ্রামবাসীদের দ্বারা নির্বাচিত হতো। পঞ্চায়েৎ এমনভাবে গঠিত হতো যে সম্প্রদায় বা বর্ণভিত্তিক প্রতিনিধিত্বও তাতে থাকতো। এই প্রতিষ্ঠানটি ভূমি বন্টণ এবং কর আদায়ে সরকারকে সহায়তা করতো। মুসলমান শাসকগণ বা ব্রিটিশ আমলেও এই স্থানীয় সংস্থাকে হয়রানি বা হেনস্থা করা হয়নি।
একসময়ে জমিদারী প্রথা চালু হয় এবং জমিদাররা স্থানীয় সমস্যার দায়িত্ব গ্রহণ করে। ১৮৭০ সালে গ্রাম চৌকিদার আইন পাশ করেও চৌকিদারদেরকে পঞ্চায়েতের অধীনস্থ করা হয়। তবে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় ব্রিটিশরা বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নেয় ১৮৮৫ সালে স্থানীয় স্বশাসন আইন পাশ করে। তখনও জেলা পর্যায়ে জেলা বোর্ড মহকুমা পর্যায়ে লোকাল বোর্ড গঠন করে পঞ্চায়েতকে অক্ষুন্ন রাখা হয়। ১৯১৯ সালে ব্রিটিশরা পঞ্চায়েত প্রথা বাতিল করে এবং ইউনিয়ন বোর্ড গঠন করে। পাকিস্তান আমলে সামরিক শাসক আইয়ুব খান মৌলিক গণতন্ত্র চালু করেন এবং ইউনিয়ন কাউন্সিলকে চাঙ্গা করেন। বাংলাদেশ আমলে ইউনিয়ন পরিষদ সরাসরি নির্বাচনের আওতায় আসে। তবে এই সংস্থাটি কখনোই সাধারণ মুনষের কল্যাণে আস্থা অর্জন করতে পারে নি।

অন্যদিকে ভারতের পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েৎ প্রথাকে আধুনিকতায় পুষ্ট করা হয়। পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েৎ পদ্ধতি সম্পর্কে বাংলাদেশের বদিউল আলমের কিছু মন্তব্য, "The panchayat system appears to provide a systematic training ground for the people who will take top leadership positions in the country in the future. Women are making impressive strides in this quest for leadership. Of the six panchayati raj institutions we visited, all were headed by women with the exception of one. One of the pradhans (chairs) was a minority woman. Quite a few of the women won against men, outside the reservation system. It appears that the leadership of the ordinary people is being established in West Bengal. Through the panchayat system, the voiceless seemed to have gained the voice.

We are also impressed by the status of the panchayat representatives vis-a-vis the bureaucracy. In West Bengal, panchayat bodies are not subservient to the bureaucracy, rather it is the other way around. With commitment to democratic decentralization, these bodies are on their way to becoming truly self-governing institutions. In every panchayat we visited, the government officials work under the leadership of the panchayat representatives and the former always took the back seats.

Bureaucracy appears to be trying to take the role of what may be called "development governance" rather than "administrative goverance" involving operational control and regulations.We found that the government has a lot of schemes and projects for the people at the grassroots. It is claimed that 52% of the government budget goes to the people at the bottom, of which 16 percent are spent through the panchayats. Increasing amounts of funds given to panchayats are untied. We have also found that gram panchayats, the lowest local government bodies, get the highest proportion of local government funds, 50 percent; panchayat samitis get the next highest proportion, 30 percent; and the remaining 20 percent go to zilla parishads. Because of the panchayat system the cost of delivery of government services has significantly gone down.

It was interesting for us to note that almost all the work that is performed by the NGOs in Bangladesh is the responsibility of the panchayati raj institutions. NGO
s appear to work as contractors for the panchayats.

A system of transparency and accountability appears to be an important feature of the panchayati raj system in West Bengal. Gram *sansads* (meeting at the ward, or sub-panchayat level) and *gram sabhas* (mass assemblies of the entire panchayat) not only provide opportunities for practicing participatory democracy, they also serve as forums for planning, information dissemination and most importantly for holding the gram panchayat leaders to account.

Panchayat elections are held on party tickets. Still, representatives of different parties appear to work together as a corporate body. Unlike in Bangladesh, panchayat bodies are not dominated by their chairs.

Because of the use of the panchayat system as a vehicle for decentralization of authority and devolution of resources at an increasing rate, West Bengal achieved impressive progress in both economic and social areas. The proportion of people below the poverty line in West Bengal is claimed to be the lowest in the nation. In social areas also, especially in the areas of improving the conditions of the women and the minority, their gain in enviable.

All of us returned to Bangladesh greatly impressed by the successes of the panchayat system and committed to vigorously pursue the goal of strengthening our system of local governance. Our hosts were most gracious and hospitable at every place we visited – they showered us with heartfelt felicitation. In fact, we were overwhelmed by their affection and warmth.

আমার কাছে মনে হয়, আমরা স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাটিকে ইউনিয়ন কাউন্সিল, পঞ্চায়েত, গ্রাম সরকার যে নামেই ডাকি পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েৎ ব্যবস্থা থেকে আমাদের বেশ কিছু শিক্ষা গ্রহণ করার আছে। পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েৎ প্রথার সাফল্যের পেছনে দুটি কারণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হচ্ছে। প্রথমত এটি আমাদের ইউনিয়ন কাউন্সিলের মতো একটি লুটেরা সংস্থায় পরিণত হয়নি। এখানে জনগণের সরাসরি অংশগ্রহণ করার সুযোগ রয়েছে। আমাদের ইউনিয়ন কাউন্সিলের মতোই এটি নির্বাচিত সংস্থা হলেও জনগণের কাছে এর জবাবদিহিতা আছে। সরকারি প্রশাসন এর অধীনে কাজ করে। ফলে প্রশাসনকে ঘুষ দিয়ে উন্নয়নের বরাদ্দ গ্রহণ করতে হয় না। দ্বিতীয়ত পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য সরকার এই সংস্থাটিকে গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়নের কাজ করার পাশাপাশি শিক্ষা, স্বাস্থ্য সহ জনগণের প্রয়োজনীয় কাজ করার জন্য এই দায়িত্ব দিয়েছে। তবে সবচেয়ে বড় কথাটি হলো রাজনৈতিক অঙ্গীকার। যদি শীর্ষ পর্যায়ে কমিটমেন্ট না থাকে তবে যে নামেই আমরা ডাকিনা কেন, যে পদ্ধতিতেই আমরা যাইনা কেন কোন সমাধান পাওয়া যাবেনা।

উপসংহারে আমরা একথা বলতে পারি যে, বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে স্থানীয় সরকারের ক্ষমতার সুস্পষ্ট বিকেন্দ্রীকরণ করতে হবে এবং স্থানীয় সরকারকে নির্বাচিত প্রতিনিধির মাধ্যমে স্বশাসিতভাবে পরিচালনা করতে হবে। জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন (আমি একে গ্রাম সংসদ বা পঞ্চায়েৎ বললে খুশী হবো) এই তিন স্তরের স্থানীয় সরকারকে কার্যকর করতে হবে। এসব প্রতিষ্ঠানকে কর আদায়, প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নের সুনির্দিষ্ট ব্যাপক ক্ষমতা প্রদান করতে হবে। দেশরক্ষা, পররাষ্ট্র, মুদ্রা-অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড, আইন ও জাতীয় উন্নয়ন এসব বিষয় ছাড়া বাকীগুলোকে স্বশাসিত স্থানীয় সরকারের অধীনে নিতে হবে। এজন্য জেলাকে প্রধান ও সমন্বয়কারী ইউনিট হিসেবে বিবেচনা করতে হবে এবং উপজেলা ও ইউনিয়নকে জেলার ইউনিট হিসেবে বিবেচনা করতে হবে।

জনপ্রশাসন ও আমলাতন্ত্র: আধুনিক একটি রাষ্ট্রের অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশের নাম আমলাতন্ত্র। কার্যত রাজনীতিবিদরা পরিবর্তিত হলেও আমাদের দেশে আমলাতন্ত্র পরিবর্তিত হয়না। কিন্তু দেশের সার্বিক উন্নয়ন ও অগ্রগতিতে এই আমলাতন্ত্রই ব্যাপক ভূমিকা পালন করে থাকে। এগারোই জানুয়ারি দেশে জরুরি অবস্থা জারির পর রাজনীতিবিদদের বিষয়ে যেমন দৃঢ় পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে আমলাতন্ত্রকে তেমন কোন চাপের মুখে রাখা হয়নি। কিন্তু বাস্তব সত্য হলো, রাজনীতিবিদদের দুর্নীতি কখনোই সম্ভব হতোনা, যদি আমলারা এতে সমর্থন না দিতো। দৈনিক আমাদের সময় পত্রিকার ৫ এপ্রিল ২০০৭ সংখ্যায় বাংলাদেশের আমলাতন্ত্র বিষয়ে একটি অতি চমৎকার বিশ্লেষণ ছাপা হয়েছে। যদিও এই বিশ্লেষণ-এর পুরোটাই সঠিক নয়, তথাপি এটি পর্যালোচনার দাবি রাখে। আমাদের আমলাতন্ত্র সম্পর্কে এমন বক্তব্য তেমন খুব একটা পাওয়া যায়না। আমাদের সময়-এর প্রতিবেদনের অংশবিশেষ এখানে উদ্ধৃত করা হলো: রাজনৈতিক অদূরদর্শিতার কারণেই বাংলাদেশের আমলাতন্ত্র সঠিক পথে এগুতে পারেনি। বরং ভুল অবস্থান থেকে শুরু, সিএসপি-বিসিএস দ্বন্দ্ব, দলবাজি, দুর্নীতি, ব্যাচে ব্যাচে কোন্দল, ধারাবাহিকবিহীন কর্ম পদ্ধতি এবং আত্মীয়তা ও ঘনিষ্ঠতাকে প্রাধান্য দেয়ায় আমলাতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিক ও পেশাদার চেহারা গড়ে ওঠেনি। অথচ প্রশাসনের বর্তমান সীমাবদ্ধতা, অসততা, অনিয়ম, ব্যর্থতা, অযোগ্যতা ও অদক্ষতা দূর করতে পেশাদারিত্বের কোনো বিকল্প নেই। এজন্য সরকারের অন্য প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের পাশাপাশি সিভিল প্রশাসনের সংস্কারও জরুরি হয়ে পড়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের স্পয়েল সিস্টেমের মতো একটি প্রশাসনিক ব্যবস্থা প্রর্বতণের কথা বিবেচনার সুপারিশ করেছেন কেউ কেউ। সাবেক ও বর্তমান সচিবদের অনেকেই এমনটি মনে করেন। তাদের মতে, গত ৩৬ বছরেও বাংলাদেশের আমলাতন্ত্র প্রাতিষ্ঠানিক ও পেশাদার চেহারায় অঙ্কুরিত হয় নি। এর অন্তর্নিহিত কারণগুলোর অন্যতম হচ্ছে রাজনৈতিক অদূরদর্শিতার কারণে ভুল অবস্থান থেকে আমলাতন্ত্রের যাত্রা। এদেশে বৃটিশ শাসনকে পাকাপোক্ত ও স্থিতিশীল করতেই যাত্রা শুরু হয়েছিল বৃটিশ আমলাতন্ত্রের। বৃটিশের সেই আমলাতন্ত্রে সিভিল সোসাইটি ও জনপ্রতিনিধির কাছে জবাবদিহিতার কোনো বিষয় ছিল না। বৃটিশদের সেই ধারাবাহিকতায়ই গড়ে ওঠেছিল পাকিস্তানের আমলাতন্ত্র। বৃটিশ ও ভারতের অভিজ্ঞতায় পাকিস্তানের সেই আমলারা ছিল এলিট শ্রেণীর এবং রাজনীতিবিদদের চেয়ে দক্ষ। পাশাপাশি মুসলিম লীগে বোদ্ধা ও বিশ্বাসী সহকর্মীর অভাবে গর্ভনর মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ও প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান দুজনই ছিলেন আমলানির্ভর। রাজনীতিকদের ওপর তাদের আস্থারও অভাব ছিল। ফলে রাজনীতিকদের কর্মকাণ্ডের ওপর নজরদারি করে প্রয়োজনীয় প্রতিবেদন দেয়ার নির্দেশ ছিল আমলাদের

প্রতি। আমলারা রাজনীতিবিদদের দুর্নীতিবাজ, লোভী, অসৎ ইত্যাদি বিশেষণ জুড়ে দিয়ে প্রতিবেদন দিত। শিক্ষা, এলিট ভাবাপন্নতা, অর্থ-বিত্ত চলনে রাজনীতিবিদরা কখনোই আমলাদেরকে প্রভাবিত করতে পারেনি। প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী ছিলেন ভারত ছেড়ে পাকিস্তানে বসতি স্থাপন করা বাস্তুহারা। এজন্য পাঞ্জাবী ও আমলারা তাকে পাত্তাই দিত না। আমলাদের মনোযোগ পাওয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী বক্তৃতায় বলতেন 'আপনারা জনগণের মনিব, এদের শাসনভার আপনাদের ওপর।' অথচ ভারতে হয়েছিল এর উল্টোটি। ১৯৪৮ সালে জওহরলাল নেহেরু ভারতের আইসিএসদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন 'আপনারা জনগণের সেবক হিসেবে কাজ করবেন।' ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের সময় ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস (আইসিএস) ও ভারতীয় অডিট সার্ভিসের কয়েকজন আমলা অত্যন্ত প্রভাবশালী হয়ে ওঠেন। রাষ্ট্রক্ষমতার শিখরে আরোহণই তাদের লক্ষ্য হয়ে ওঠে। অডিট সার্ভিসের ডাকসাইটে আমলা গুলাম মোহাম্মদ পাকিস্তানের প্রথম অর্থমন্ত্রী নিযুক্ত হন। একই সার্ভিসের অপর সদস্য চৌধুরী মোহাম্মদ আলী পাকিস্তান সিভিল সার্ভিসের (সিএসপি) সবচেয়ে প্রভাবশালী সচিব হন। পরবর্তীতে এই আমলার জন্য সরকারকে সেক্রেটারি জেনারেলের পদ সৃষ্টি করতে হয়েছিল। তার অবসরের সঙ্গে সঙ্গে পদটিও বিলুপ্ত হয়ে যায়। পাকিস্তানের সাবেক সেনা শাসক আইউব খান তার এক লিখায় উল্লেখ করেছেন, ১৯৫১ সালে লিয়াকত আলী খান খুন হওয়ার পেছনে তিন আমলা জড়িত ছিলো। লিয়াকত আলী খান খুন হওয়ার দুবছর পর ১৯৫৩ সালে গুলাম মোহাম্মদ পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল এবং চৌধুরী মোহাম্মদ আলী হয়েছিলেন অর্থমন্ত্রী। প্রায় এক বছর পর গুলাম মোহাম্মদের জায়গায় গভর্নর জেনারেল নিযুক্ত হন ভারতীয় পুলিশ সার্ভিসের সদস্য ইস্কান্দার মির্জা। ১৯৫৪র নির্বাচনে পশ্চিম পাকিস্তানে মুসলিম লীগ এবং পূর্ব বাংলায় যুক্তফ্রন্ট সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। পাকিস্তানে একটি কোয়ালিশন সরকার গঠনের উদ্যোগ নেয়ার জন্য মুসলিম লীগ চৌধুরী মোহাম্মদ আলীকে নেতা নির্বাচিত করে। কিন্তু মোহাম্মদ আলী যুক্তফ্রন্ট ও সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গে কোনো আলোচনা না করে প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মির্জার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে নিজেই প্রধানমন্ত্রী হয়ে যান। যদিও এক বছরের মাথায় সেই ক্ষমতা সোহরাওয়ার্দীর হাতে ছেড়ে দিতে হয়েছিল। গুলাম মোহাম্মদ, ইস্কান্দার মির্জা ও মোহাম্মদ আলী এই তিনজনের হাত ধরে গড়ে ওঠা আমলাতন্ত্র পাকিস্তানে একাধারে মনিব শ্রেণীর আমলাতন্ত্র ও শাসনকর্তা হিসেবে দীর্ঘকাল রাজনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করেছে। তাদের সরাসরি আহ্বানেই ১৯৫৮ সালে ক্ষমতা গ্রহণ করেছিলেন সেনাশাসক আইয়ুব খান। পাকিস্তানী আমলাতন্ত্রের নখ দন্তে সন্ত্রস্ত বাংলাদেশী শাসকশ্রেণী স্বাধীনতার পর আমলাদের চাকরির নিরাপত্তা নিশ্চিত করেনি। সংবিধানেও তাদের চাকরির নিরাপত্তার কোনো ব্যবস্থা রাখা হয়নি। অথচ বাংলাদেশের আমলাতন্ত্র সেই পুরনো বৃটিশ কাঠামোর মধ্যেই বেড়ে ওঠে। বৃটিশদের শাসন করার যে নীতি সেই নীতিকাঠামোয় দাঁড়িয়েই এদেশের আমলাতন্ত্রের যাত্রা শুরু। বৃটিশ আমলাতন্ত্রে যেমন ঊর্ধ্বতনদের কাছেই জবাবদিহিতা সীমাবদ্ধ ছিল, বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও এমনটিই হয়েছে। জনগণ কিংবা রাষ্ট্রের কাছে জবাবদিহিতার বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়নি। রাষ্ট্রের অন্য দুটি স্তম্ভ আইন ও বিচার বিভাগের সঙ্গে আমলাদের সুসম্পর্ক নেই। বরং আইন বিভাগের সঙ্গে রয়েছে এক ধরনের সুবিধা কেন্দ্রিক সম্পর্ক। অবশ্য আচমকাই বাংলাদেশের সিভিল প্রশাসনের যাত্রা শুরু হয়েছিল। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে '৭১-এর ১২ মার্চ মুজিবনগর সরকারের ডেপুটি সেক্রেটারি পদের তৌফিক ইমাম, নুরুল কাদের, আবদুস সামাদ, খন্দকার আসাদুজ্জামান, ফয়েজ উদ্দিনসহ কয়েকজন জেলা প্রশাসক যোগদান করেন। তারাই গোড়াপত্তন ঘটান অস্থায়ী সরকারের সিভিল প্রশাসনের। ....এদিকে প্রশাসনে জনবলহীনতার কারণে ৭৩ সালে প্রথম ভাল করে পরীক্ষা নেয়া ছাড়াই ব্যাপক সংখ্যক জনবল নিয়োগ করা হয়। বঙ্গবন্ধু ইন্ডাস্ট্রিয়াল ম্যানেজমেন্ট সার্ভিস (আইএমএস) নামে আলাদা একটি সার্ভিস চালু করেন। পরে এ সার্ভিসটি বিলুপ্ত হলে এ সার্ভিসের ক্যাডাররা প্রশাসন ক্যাডারে অধিভুক্ত হয়। স্বাধীনতার পর পরই যারা বৈষম্যের স্বীকার হয়েছেন '৭৫-এর পটপরিবর্তনের পর তারা পেয়ে যান বিশেষ সুবিধা। খন্দকার মোশতাক আহমেদ ক্ষমতাসীন হয়ে আওয়ামী লীগ আমলের বিশেষ সুবিধা প্রাপ্তদের মধ্যে খন্দকার আসাদুজ্জামান ও তৌফিক ইমামকে চাকরিচ্যুত করা হয়। আর সে সময় সফিউল আজমসহ বহিষ্কৃত ও বঞ্চিতদেরকে পুনর্বহাল এবং পদায়িত করা হয়। পুনর্বহালের তালিকায় এর আগের বঞ্চিত ৯ সিএসপি অফিসারও ছিলেন। অর্থাৎ স্বাধীনতার পর থেকেই শুরু হয় মুক্তিযোদ্ধা- অমুক্তিযোদ্ধা দ্বন্দ্ব, সিএসপি, ইপিসিএস ও বিসিএস দ্বন্দ্ব ও পারস্পরিক বিদ্বেষ। চাকরির নিরাপত্তা না থাকায় কর্মকর্তারা তোষামোদকারী ও আত্মকেন্দ্রিক হয়ে পরেন। পাশাপাশি উদ্যোগী ভূমিকা পালন ও সৃষ্টিশীল কাজে আগ্রহ থেমে যায়। ফলে চাকরিটি হয়ে পড়ে বেতন ও চেয়ারকেন্দ্রিক। অন্যদিকে, সিএসপি অফিসারদের এলিট মনোভাব '৭৫-এর পর সুপার এলিট শ্রেণীতে পরিণত হয়। অতীত দক্ষতায় তারা প্রশাসনকে এমন অবস্থায় নিয়ে যায় যে, রাজনীতিবিদ ও অবসরপ্রাপ্ত সামরিক জেনারেলদের কাছে তাদের প্রয়োজনীয়তা অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। তারা বিসিএসকে ব্যঙ্গ করে বলতো বাংলাদেশ ক্যাটেল সার্ভিস। যে সিএসপিদের হাত ধরে এদেশের সিভিল সার্ভিস

বিকশিত হওয়ার কথা সেই সিএসপিরা ব্যুরোক্রেসি গড়ে তোলার দায়িত্ব না নেয়ায় এদেশের ব্যুরোক্রেসির কোনো চরিত্রই আর দাঁড়ায়নি। সিভিল সার্ভিসের শূন্যতা পুরণে সিএসপিরা বিসিএসদের হাতে-কলমে কাজ শেখালে এদেশে ব্যুরোক্রেসির পেশাদার চরিত্র দাঁড়াতে পারতো বলে মনে করেন অনেক কর্মকর্তা। এদিকে, ১৯৭৩-এর পর '৭৭ সালে বিসিএস-এ দ্বিতীয় ব্যাচ নিয়োগ দেয়া হয়। ...... ৭৯, ৮১ ও ৮২ ব্যাচও ভালো ব্যাচ হিসেবে পরিচিত। .....এরশাদ রাষ্ট্র ক্ষমতায় এসে প্রশাসনকে জনগণের দোরগোড়ায় নিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দিয়ে উপজেলা পদ্ধতি প্রবর্তন করেন। উপজেলা আদালতের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ৮৩ সালে ৬৫০ জনের বিশাল সংখ্যক একটি ব্যাচকে নিয়োগ পরীক্ষা ছাড়া শুধুমাত্র এমসিকিউর (টিক চিহ্নের পরীক্ষা) মাধ্যমে নিয়োগ করা হয়। এদের বয়সসীমা ৫০ বছর পর্যন্ত উন্মুক্ত ছিল। তাদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণও হয়নি। এসব কারণে এ নিয়োগের শর্ত ছিল এরা উপজেলা ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবেই অবসরে যাবে। কিন্তু রাজনৈতিক তদবিরে এ শর্ত প্রত্যাহার করে এদেরকে সিভিল প্রশাসনের ধারাবাহিকতায় যুক্ত করা হয়। ৮৩ সালের পর পরই একই সময়ে ৮৪তম ব্যাচে ৪৫০ এবং ও ৮৫ ব্যাচে রিক্রুট করা হয় ৫৫০ জনকে।

সমসাময়িক সময়ে উপর্যুপরি তিনটি ব্যাচে অধিক সংখ্যক নিয়োগের ফলে সিভিল সার্ভিসে অপেক্ষাকৃত দুর্বলরাও প্রবেশের সুযোগ পেয়ে যায়। বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ, আইন ও প্রশাসনসহ ক্যারিয়ার ডেভেলপমেন্টের কোনো কোর্স করতে পারেনি এরা। পরে কেউ কেউ স্বল্পমেয়াদি প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। ওই সময় নির্বাচন অফিসার ও সেনানিবাসের নির্বাহী কর্মকর্তাদেরকেও সিভিল প্রশাসনে আত্মস্থ করা হয়। এসব নানা অনিয়মের কারণে দীর্ঘদিন যাবৎ পদায়ন ও পদোন্নতিতে মারাত্মক স্থিতাবস্থা সৃষ্টি হয়। ১০টি পদের বিপরীতে ১৫ থেকে ২০ জনকেও পদায়িত করতে হয়েছে। অন্যদিকে আত্মস্থ হওয়া প্রশিক্ষণবিহীন অফিসারদের পেশাদার মনোবৃত্তির ঘাটতির কারণে প্রশাসন ক্রমান্বয়ে দুর্নীতিপ্রবণ হয়ে পরে। দুর্নীতির দায়ে যৌথবাহিনীর হাতে সম্প্রতি চট্টগ্রামে গ্রেফতার হওয়া ডিসি মো. হাসান নির্বাচন অফিসার থেকে আত্মস্থ হয়েছিলেন। এখনো যেসব কর্মকর্তার বিরুদ্ধে অভিযোগ শোনা যাচ্ছে তাদের অধিকাংশই আত্মস্থ হওয়া। ....সিভিল প্রশাসনে সিএসপিদের হীনমন্যতা এবং উপর্যুপরি দুর্বল রিক্রুটমেন্টে বিসিএস ক্রমান্বয়ে অদক্ষ ও অকর্মণ্য হয়ে পড়ে। এসব কারণে সে সময় রাজনীতিবিদরা সিএসপি নির্ভর হয়ে পড়ে। সিভিল প্রশাসনের জুনিয়ররা পদস্থদের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় শিক্ষা ও নির্দেশনা পায়নি। ৮৫ ব্যাচটি সালাহউদ্দিনের ব্যাচ হিসেবে পরিচিতি পায়। এই ব্যাচ থেকেই অমুকের ব্যাচ তমুকের ব্যাচ নামে পরিচিতি পেতে থাকে। মূলত আন্তব্যাচ কলহ ও রাজনৈতিক নৈকট্য লাভের হীন প্রচেষ্টার কারণেই এ পরিচয় দাঁড়িয়ে যায়। ৮৬ সালের ব্যাচটি ৮৬র ব্যাচ না হয়ে ৮ম ব্যাচ হিসেবে পরিচিতি পায়। এরপর থেকেই ৯ম, ১০ম ব্যাচ হিসেবে ব্যাচ পরিচিতি শুরু হয়। এই ৮ম থেকে ১৯তম ব্যাচ পর্যন্ত নিয়োগ নিয়ে আর কোনো বিতর্ক হয়নি। ২০তম ব্যাচে স্বল্পসংখ্যক নিয়োগের জন্য সার্কুলার জারি করে নিয়োগ দেয়া হয় বেশি। তখনই পিএসসি নিয়ে প্রথম প্রশ্ন ওঠে। এরপর ২৪, ২৫ ও ২৭তম ব্যাচে এসে পিএসসি নিয়ে বিতর্ক ব্যাপকতা পায়। অথচ এ জাতীয় অভিযোগ সিভিল সার্ভিসের এবং আমলাতন্ত্রের ভাবমূর্তির জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। এ জাতীয় অভিযোগ নিয়ে আমলাতান্ত্রিক কর্মজীবনে প্রবেশ কখনোই সুখকর হয় না। সিএসপি বিষয়ক আইন কানুন তৈরি হয়েছিল ১৯৩৫ সালের গভর্নমেন্ট অব ইন্ডিয়া অ্যাক্ট অনুযায়ী। পাকিস্তানের সংবিধানেও সেগুলোই অনুমোদিত হয়। ফলে পাকিস্তান প্রশাসনের সচিবালয়ের উপ-সচিব থেকে সচিব পর্যন্ত পদগুলোর দুই তৃতীয়াংশই সিএসপিদের জন্য সংরক্ষিত ছিলো। কিন্তু বাংলাদেশে পর্যাপ্ত সিএসপি না থাকায় বাংলাদেশ সমন্বিত সিভিল সার্ভিস (বিসিএস) এবং সিনিয়র পলিসি পুলের (এসপিপি) প্রবর্তন করে শূন্যতা পূরণ ও সংরক্ষণ প্রথা বিলুপ্ত করা হয়। উপ-সচিব থেকে সচিব পর্যন্ত পদগুলো এসপিপির অন্তর্ভুক্ত হয়। এতে বিসিএস এর ১৪টি শাখার যে কেউ নির্ধারিত যোগ্যতা অর্জনের মাধ্যমে এসপিপির সদস্য হতে পারতেন। তবে এতে বিসিএস (প্রশাসন) ও বিশেষজ্ঞ প্রকৃচি (প্রকৌশলী, কৃষিবিদ ও চিকিৎসক) ক্যাডারদের মধ্যে ভিন্ন দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। বিসিএস (বিশেষজ্ঞ) দের উচ্চ পদের যে কেউ ইচ্ছে করলেই সচিবালয়ের উচ্চ পদে আসতে পারতেন। কিন্তু বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারের বিশেষজ্ঞদের উচ্চ পদে যাওয়ার সুযোগ ছিল না। এদিকে, মাঠ প্রশাসনে ১৯৬০ সাল পর্যন্ত পুলিশ সুপারের (এসপির) ওপর জেলা প্রশাসকের (ডিসির) নিয়ন্ত্রণ ছিল। এসপির কাজের মূল্যায়ন করে ডিসি বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন (এসিআর) বিভাগীয় কমিশনারের কাছে পাঠাতেন। আইয়ুব খান ৬০ সালে ডিসির এ ক্ষমতা প্রত্যাহার করেন। ১৯৭৩ সালে বঙ্গবন্ধু সরকার এটি পুনর্প্রবর্তন করেছিলেন। জিয়াউর রহমান রাষ্ট্রক্ষমতায় এসেই সেই ক্ষমতা আবার প্রত্যাহার করেন। জিয়া সরকার ১৯৭৬-৮০ সাল পর্যন্ত সময়ে ২৩ জন সামরিক অফিসারকে এসপি পদে পদায়িত করেন। এতে সিভিল প্রশাসন সামরিকায়ন আতঙ্কে সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে। সে সময় বেতন কাঠামোর দিক থেকেও সাধারণ ক্যাডারদের ছোট দেখানোর চেষ্টা করা হয়। ১৯৭৮ সালে নতুন বেতন কাঠামোয় সাধারণ ক্যাডারদের বিশেষজ্ঞদের নিচে নামিয়ে আনা হয়। এ স্কেলে ডিসির বেতন

ছিল ১৪০০-২২২৫ টাকা। একই মর্যাদার সুপারিন্টেন্ডেন্ট ইঞ্জিনিয়ারের বেতন ছিল ২১০০-২৬০০ টাকা। এসব কারণে জেলা পর্যায়ের আইন শৃঙ্খলা ও উন্নয়নমূলক কাজের সমন্বয়ে ব্যাঘাত শুরু হয়। এই শূন্যতা পূরণের জন্য ১৯৮০ সালে জিয়া সরকার একজন সংসদ সদস্যকে উপমন্ত্রীর মর্যাদা দিয়ে ডিস্ট্রিক্ট ডেভেলপমেন্ট কো-অর্ডিনেটর (ডিডিসি) নিযুক্ত করেন। কিন্তু এতে কার্যকর কিছু হয়নি। অবশ্য এর আগে আওয়ামী লীগ সরকার বাকশাল গঠন করে একজন সংসদ সদস্যকে জেলার গভর্নর নিযুক্ত করেছিলেন। বলা হয়েছিল সাধারণ ও রাজস্ব প্রশাসনের হিসেবে জেলা গভর্নর জেলার প্রশাসনিক সমন্বয় ও নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব পালন করবেন। আদালতকে তার কর্মের বাইরে রাখা হয়েছিল। আইন বিভাগ ছাড়া জেলার অন্য আমলারা তার অধস্তন হবেন। তবে রাজনৈতিক পরিবর্তনের কারণে এ নিযুক্তি মাঠে গড়ায়নি। এরশাদ শাসনামলের মাঝামাঝি সময়ে জেলা পরিষদকে পুনরুজ্জীবিত করে একজন সাংসদ বা রাজনৈতিক নেতাকে চেয়ারম্যান নিযুক্ত করেন। জেলা পরিষদের চেয়ারম্যানই তখন জেলার উন্নয়নের কাজ দেখাশুনা করতেন। ১৯৯১ সালে বিএনপি ক্ষমতায় এসে একজন সংসদ সদস্যকে জেলা মন্ত্রীর দায়িত্ব প্রদান করে। জেলা মন্ত্রীগণ জেলা উন্নয়ন সমন্বয় ও আইন শৃঙ্খলা কমিটির সার্বিক কাজ মনিটর শুরু করেন। অথচ কাগজে-কলমে জেলা প্রশাসক হচ্ছেন এ কমিটির সভাপতি। বৈধতা ছাড়াই জেলা মন্ত্রীগণ সমন্বয় কমিটির সভাগুলোতে সভাপতিত্ব করতেন এবং কাজকর্ম দেখাশুনা করতেন। এতে সমন্বয় কমিটির সভাগুলোয় ওই জেলা মন্ত্রীর সমর্থক কিংবা দলীয় নেতারাও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠতো। এতে সমন্বয় কমিটি হয়ে পড়তো অতি মাত্রায় দলীয় রাজনীতি প্রভাবিত। জেলা প্রশাসক ও অন্য কর্মকর্তাগণ মাঠ প্রশাসনে গৌণ হয়ে পড়তেন। এ ধারাবাহিকতা পরবর্তী আ'লীগ এবং সর্বশেষ চার দলীয় জোট সরকারের আমলেও অব্যাহত ছিল।

১৯৪৭ থেকে ১৯৬২ সাল পর্যন্ত সময়ে পাকিস্তানে মোট ২৮টি কমিশন গঠিত হয়। এসব কমিশন প্রশাসনিক সংস্কার, পুনর্বিন্যাস, পদ্ধতিগত উন্নয়নের সুপারিশ করে। বাংলাদেশে ১৯৭১ থেকে সামরিক শাসনসহ ৯৭ সাল পর্যন্ত সবকটি সরকারের সময়ে গঠিত হয়েছে মোট ১৩টি কমিশন। এর মধ্যে ১৯৯৭ সালে গঠিত হওয়া এটিএম শামসুল হকের কমিশনটিই একটি পরিপূর্ণ ও পূর্ণাঙ্গ প্রস্তাব পেশ করেছে। এই কমিশন নিউ পাবলিক ম্যানেজমেন্টের (এনপিএম) ধারণা সম্বলিত মোট ১৩৭টি সংস্কারের প্রস্তাব দেয়। এরমধ্যে ৩০টি অন্তবর্তীকালীন, ৭০টি স্বল্প মেয়াদি এবং ৩৭টি ছিল দীর্ঘমেয়াদি প্রস্তাব। কমিশনের গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাবনাগুলো ছিল স্বচ্ছ ও জবাবদিহি প্রশাসন। পেশাদারিত্ব ও দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সমমনা মন্ত্রণালয়গুলোর মধ্যে ক্লাস্টার্স সিস্টেমের প্রচলন কওে কর্মকর্তাদেরকে ক্লাস্টার্স মন্ত্রণালয়ের মধ্যে বদলি সীমিত করা। সিনিয়রিটি, যোগ্যতা ও দক্ষতার ভিত্তিতে পদোন্নতি ও পদায়নের জন্য বর্তমান সুপিরিয়র সার্ভিস পুল (এসএসপি) স্ট্রাকচারের পরিবর্তে সুপিরিয়র ম্যানেজমেন্ট পুল (এসএমপি) করা। মেধার ভিত্তিতে ক্যাডার সার্ভিসে নিয়োগ এবং পদোন্নতি প্রদান এবং কোটা প্রথা বাতিলের সুপারিশ করা হয়। স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাকে পুনর্গঠন এবং সরকারি কর্তৃপক্ষের নতুনভাবে মূল্যায়ন করা। প্রতিষ্ঠান ও জনশক্তির আধিক্য কমানো এবং স্বাধীন ও শক্তিশালী দুর্নীতি দমন কমিশন গঠন। প্রস্তাবে চাকরির বয়সসীমা ৬০ বছর, সার্বক্ষণিক ব্যাংকিং, পুলিশি ব্যবস্থার উন্নয়ন, ওয়ান স্টপ সার্ভিস চালু, ইউটিলিটি সার্ভিসগুলোকে একত্রিত করে শুক্র-শনিবারেও চালু রাখার প্রস্তাব করা হয়েছে। প্রশ্ন রয়ে যাচ্ছে যে, এসব সুপারিশ কে কবে বাস্তবায়ন করবে?

আমলাতন্ত্র নিয়ে সাবেক ও বর্তমান তিন আমলার কথা: বর্তমান জনপ্রশাসন প্রসঙ্গে সাবেক কেবিনেট সচিব ড. সা'দত হোসেন বলেন, রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন প্রশাসনকে ধ্বংস করে ফেলেছে। প্রশাসনে যারা এখনো করাপ্ট হয়নি তারাও ধান্ধাবাজ হয়ে গেছে। অফিসের কাজে তাদের উৎসাহ কমে গেছে। দলবাজি সরকারের পাওয়ারের স্ট্রাকচারের ভেতর ঢুকে গেছে। যারা ক্ষমতায় থাকে তারা কিভাবে চালাবে এর ওপর নির্ভর করে জন প্রশাসন। রাজনীতিবিদরাই এর নিয়ন্ত্রক। ইচ্ছে করলেই কেউ আলাদাভাবে ভালো থাকতে পারবে না। ভালো থাকতে চাইলে চাকরি ছেড়ে দেয়া ছাড়া তার সামনে আর কোনো পথ থাকে না। বঙ্গবন্ধু, মোশতাক, জিয়া, এরশাদ, খালেদা জিয়া ও শেখ হাসিনা সবাই পারসোনাল ম্যানেজমেন্টের মাধ্যমে জনপ্রশাসনকে চালিয়েছেন। কেউ ব্যুরোক্রেসিকে দাঁড় করানোর চেষ্টা করেননি। স্বাধীনতার পর থেকেই ভুল পথে চলতে শুরু করে ব্যুরোক্রেসি। তখন থেকেই সিনিয়রিটি ডিটারমিন করা যায়নি। সংবিধানেও ব্যুরোক্রেসিকে কোনো প্রোটেকশন বা গুরুত্ব দেয়া হয় নি। চাকরি টিকিয়ে রাখার মতো কোনো খুটি নেই আমলাদের। ফলে সবসময় তারা সন্ত্রস্ত ও নার্ভাস থাকে। কাজ করার জন্য যথেষ্ট কনফিডেন্স পায় না। পাওয়ার গ্রুপের কথার বাইরে যাওয়া বা মতামত দেয়ার সাহস দেখায় না। তথাপিও যতোদিন সিএসপিরা ছিল ততোদিন ওরা বলতো, সুপারসিড হতো না। ২০০২ এ সিএসপিরা চলে যাওয়ার পর সেই ক্যাপাবিলিটি শেষ হয়ে গেছে। এখন যারা সচিব তাদের অনেকেই যুগ্ম সচিব হিসেবে যে ধরনের দক্ষতা অর্জন দরকার সেটাও করেনি। এ অবস্থায় ভবিষ্যতে কী হবে বলা মুশকিল। তার মতে, এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য

রাজনৈতিক সদিচ্ছা ও চাকরির নিরাপত্তা নিশ্চিত করা দরকার। কোয়ালিটি সার্ভিসের জন্য বাস্তবানুগ একটি বেতন কাঠামো নির্ধারণ করতে হবে। নির্দিষ্ট মেয়াদের আগে যখন তখন সরানোর পথ বন্ধ করতে হবে। সরাতে হলে সুনির্দিষ্ট কারণ ও প্রক্রিয়া ছাড়া সরানো যাবে না এমন বিধান করতে হবে। পিএসসিতে যোগ্য লোককে নিয়োগ দিতে হবে। চাকরির ক্ষেত্রে সব ধরনের কোটা প্রথা বাদ দিতে হবে। তিনি বলেন, কেবিনেট, সংস্থাপন, স্বরাষ্ট্র, অর্থ ও আইন সচিব এই ৫ সচিব পদে নিযুক্তদের বেলায় নিশ্চয়তা থাকতে হবে যে তারা নির্দ্বিধায় মতামত দিতে পারবে, এতে তাদের কোনো ক্ষতি হবে না। এমনকি বদলিই হবে তাদের সর্বোচ্চ শাস্তি। তাহলেও ব্যুরোক্রেসি সাহস নিয়ে কাজ করতে পারতো। বেতন কাঠামো নিয়ে তিনি বলেন, শুরু থেকেই বেতন কাঠামো ছিল দুর্বল। স্বাধীনতার পর একজন ডিসির বেতন ছিল ৫শ এবং তার মেন্টেনেন্স খরচও ছিল ৫শ টাকা। ৩/৪ মাস পর বেতন বেড়ে হয়েছিল ১ হাজার টাকা। স্বাধীনতার আগের ৯শ পৃথক সেলারি স্ট্রাকচার (এস এস) ভেঙ্গে ২০টা ইউনাইটেড সেলারি স্ট্রাকচার (ইউএসএস) করা হয়। ৭৪ সালে এ বেতন আরো কিছু বৃদ্ধি পায়। এ অবস্থা চলে এরশাদ পর্যন্ত। এরশাদ ক্ষমতায় এসে বেতন নির্ধারণ করে ৬ হাজার টাকা। বিচারপতি সাহাবুদ্দিনের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় বেতন ১০ হাজার এবং এখন সেটি ২৩ হাজার টাকায় দাঁড়িয়েছে। এ ব্যাপারে সাবেক কৃষি সচিব বর্তমানে ক্যাবিনেট সচিব আব্দুল আজিজ বলেন, সিভিল সার্ভিসের লোকদের পেশাদার হতে হবে। রাজনৈতিক টোপ ও চাপ থেকে মুক্ত থাকার ইচ্ছা থাকতে হবে। পেশাদারিত্ব দিয়েই রাজনীতিকদের ওভারকাম করতে হবে। প্রত্যেকেরই ক্যারিয়ার প্ল্যান থাকতে হবে, যোগ্য ও দক্ষ কর্মকর্তারা যেন যোগ্যতর স্থানে যেতে পারে সংস্থাপনে সে ব্যবস্থা থাকতে হবে। দলীয় আনুগত্য দিয়ে, ভালো পোস্টিং দিয়ে পারচেজ করে যে কলঙ্ক তিলক একে দেয়া হয় তা থেকে নিজেদের রক্ষা করতে হবে। তবে দক্ষ ও সৎ থেকে ভালো পোস্টিং না পেলে হতাশা সৃষ্টি হয়। এতে ওই কর্মকর্তার কাজের আগ্রহও কমে যায়। গত সরকারের সময় দলীয় আনুগত্যের জন্য পুরস্কৃত করার আবহ সৃষ্টি করা হয়েছিল। অনেকে ক্ষমতায় থেকেই নির্বাচনী তৎপরতা শুরু করেছিলেন। অবসরের কমপক্ষে ৩ বছরের মধ্যে কেউ নির্বাচন করতে পারবে না এ ধরনের বিধান হওয়া উচিত। যুক্তরাষ্ট্রের স্পয়েল সিস্টেমের ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করে তিনি বলেন এদেশের মানুষ এখনো যথেষ্ট শিক্ষিত হয়ে ওঠেনি। এ ধরনের পদ্ধতি এদেশের মানুষ সহজভাবে নেবে না। সাবেক অতিরিক্ত সচিব জাতীয় গৃহায়ন সংস্থার মো. সফিউল আলম বলেন, ১৯৫৬ সালে জনপ্রশাসন সংস্কারের প্রথম প্রস্তাব পেশ হয়। সেই থেকে ১৯৯৭ সালে এটিএম শামসুল হকের নেতৃত্বে গঠিত গঠিত জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন পর্যন্ত অধিকাংশের প্রস্তাবই বাস্তবায়িত হয়নি। তিনি বলেন, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে জনস্বার্থেই প্রশাসনিক রিফর্মস করা হয়েছে। পাকিস্তানের জেলা ও সিটিগুলোতে এখন গভর্নর পদ্ধতি চালু আছে। এসব স্থানে নাজিম হচ্ছেন প্রশাসনিক প্রধান। তিনি ২১টা বিভাগ সমন্বয় করে থাকেন। সংস্কারের কারণে সেখানে মানুষ ঘরে বসে নিজ উদ্যোগে অনলাইনে কাস্টমস ক্লিয়ারেন্স ও ট্যাক্স পরিশোধ করতে পারেন। নিজেই অনলাইনে বিল অফ লেডিং ও এলসি ওপেন করতে পারেন। পাকিস্তানের যে ব্যুরোক্রেসি থেকে এদেশের ব্যুরোক্রেসির যাত্রা সেই পাকিস্তানে সংস্কার হলে আমাদের দেশে কেন হবে না।

<u>ডিজিটাল সরকারের কাঠামোগত ব্যবস্থা:</u> সার্বিকভাবে এটি নিশ্চিত করতে হবে যে ডিজিটাল বাংলাদেশের কেন্দ্রিয় সরকার, জেলা সরকার, উপজেলা পরিষদ ও ইউনিয়ন পরিষদ পরস্পরের সাথে সমন্বয় সাধন করে নিজ নিজ দায়িত্ব স্বশাসিত ও নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা পরিচালিত।

কেন্দ্রিয় সরকারের সম্পূর্ণ ও একতরফা নিয়ন্ত্রনকে জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন সরকারের মাঝে বিকেন্দ্রিকরণ করতে হবে। স্থানীয় প্রশাসন, উন্নয়ন, নিরাপত্তা ও বিচারব্যবস্থা স্থানীয় পর্যায়েই সম্পন্ন হতে হবে। এর প্রতিটি স্তর নির্বাচিত হবে এবং আমলাতন্ত্র নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ন্ত্রনে থাকবে। যেমনিভাবে কেন্দ্রিয় সরকার ডিজিটাল পদ্ধতিতে কাজ করবে তেমনি করে স্থানীয় সরকারও ডিজিটাল পদ্ধতিতে কাজ করবে। স্থানীয় সরকার কেন্দ্রিয় সরকারের মতোই ডিজিটাল পদ্ধতিতে জনগণকে সেবা প্রদান করবে। স্থানীয় সরকারের সাথে জনগণ ডিজিটাল পদ্ধতিতে যোগাযোগ স্থাপন করবে এবং স্থানীয় সরকারের কর্মকাণ্ড অংশ গ্রহণ করবে।

ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হলে শহর ও গ্রাম, কেন্দ্রিয় ও স্থানীয়, উন্নত অনুন্নত, নগর ও মফস্বল এ জাতীয় পার্থক্য দূরীভূত হবে এবং ডিজিটাল প্রযুক্তির সহায়তায় বিরাজমান বৈষম্য দূরীভূত হবে। দেশের সকল সরকারী ব্যবস্থায় কেন্দ্রিয় তথ্যভাণ্ডার থাকবে। সেই তথ্যভাণ্ডারে কেন্দ্রিয়ভাবে সকল তথ্যই সংরক্ষিত থাকবে। তবে স্থানীয় সরকারসমূহ প্রয়োজনে সেইসব তথ্যে প্রবেশাধিকার পাবে এবং স্ব স্ব এলাকার তথ্য সংগ্রহ, সংশোধন, নবায়ন ইত্যাদি কাজ করার পাশাপাশি ব্যবস্থাপনার কাজও করবে।

এইসব কাজ করার জন্য স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাটি কেন্দ্রিয় নেটওয়ার্কের সাথে যুক্ত থাকার পাশাপাশি নিজস্ব অবকাঠামো গড়ে তুলবে।

ক. গণতন্ত্র: আমাদের দেশের সংসদীয় গণতন্ত্রকে ওয়েস্ট মিনিস্টার ধরনের গণতন্ত্র বলা না গেলেও ব্রিটিশ প্রভাবিত অনেক দেশ যেমন; ভারত, অষ্ট্রেলিয়া, আয়ারল্যান্ড, জ্যামাইকা, নিউজিল্যান্ড, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর ও মাল্টায় ওয়েস্ট মিনিস্টার ধরনের গণতন্ত্র চর্চা হয় বলে মনে করা হয়। কিছুটা ব্যতিক্রম ব্যতীত আমাদের শাসনব্যবস্থাটিকেও ঐ ধরনের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা বলে মনে করা হয়। এই ব্যবস্থায় একজন প্রায় ক্ষমতাহীন রাষ্ট্রপ্রধান থাকেন। সংসদ থাকে। সংসদের সরকারি ও বিরোধী দল থাকে। প্রধানমন্ত্রী ও বিরোধী দলীয় নেতা থাকে। একাধিক হাউস থাকে যার অন্তত একটি নির্বাচিত হয়ে থাকে (আমাদের এটি নেই)। এটি কার্যত ব্রিটিশ সংসদের প্রথাসিদ্ধ পদ্ধতি। মার্কিন বা ফরাসী প্রেসিডেন্সিয়াল ও ইরানের ইসলামি গণতন্ত্রসহ আরো অনেক ধরনের গণতন্ত্রের কথা বলা হয়। এইসব গণতন্ত্র এখন সারা দুনিয়ার প্রধান শাসন ব্যবস্থা। পশ্চিমা দেশগুলো কার্যত নিজেদের স্বঘোষিত গণতন্ত্রের রক্ষক বলে দাবি করে থাকে। সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন এবং পূর্ব ইউরোপের কম্যুনিস্ট দেশগুলোর ধ্বসে পড়ায় এই পশ্চিমা ধাচের গণতন্ত্রই কার্যত দুনিয়ার প্রধান শাসন ব্যবস্থা হয়ে ওঠেছে। চীন, কিউবা, ভিয়েতনমাসহ হাতে গোনা কয়েকটি কম্যুনিস্ট দেশ এবং মধ্যপ্রাচ্যের কিছু রাজতান্ত্রিক দেশ ছাড়া গণতন্ত্রের ফাঁকে ফোঁকরে উঁকি দেয়া সামরিক শাসন চোখে পড়ে। তবে প্রায় দুই হাজার ছয় শত বছর ধরে দুনিয়াতে প্রবল প্রতাপের সাথে এই শাসন ব্যবস্থাটি কার্যকর হয়ে আসছে। সম্ভবত এর দিন এখনো শেষ হয়নি। কম্যুনিজমসহ অনেক ধরনের ব্যবস্থা এলেও গণতন্ত্রের ভিত নড়ানো যায়নি। একে পুজিবাদী গণতন্ত্র বলেও আখ্যা দেয়া হয়।

আমরা সবাই ধারনা করি আজকের দিনের প্রতিপত্তিশালী এই গণতন্ত্রের জন্ম গ্রীসে। সম্ভবত গ্রীক demos শব্দটি থেকে Democracy এর উৎপত্তি হয়েছে বলেই আমাদের এই ধারনা। এটি সত্য যে দুনিয়ার পশ্চিমাঞ্চলে গণতন্ত্র চর্চা শুরু হয় গ্রীসেই। প্রাচীন গ্রীসের সেই গণতন্ত্র ছিলো আসলে জনগণের সরাসরি অংশগ্রহণের ধরনের। তাকে নগর রাষ্ট্র বলা ভালো। আইনানুগভাবে সেখানে ‘সকল’ নাগরিকেরাই সংসদের সদস্য থাকতে পারতেন। তারা কথা বলতে পারতেন এবং ভোট দিতে পারতেন। কিন্তু সকলে নাগরিক হতে পারতেন না। মহিলা, কৃতদাস এবং বহিরাগতরা রাজনৈতিক অধিকার ও নাগরিকত্ব পেতেন না। ২.৫ লাখ লোকের মাঝে হয়তো ৩০ হাজার নাগরিক হতে পারতেন। এর মাঝে সর্বোচ্চ ৫ হাজার হয়তো নিয়মিত সংসদে যেতেন। প্রাচীন রোমান নগর রাষ্ট্রগুলোকেও গণতান্ত্রিক বলা হয়। কিন্তু গ্রীসের মতোই এসব রাষ্ট্রে নারী ও দাসদের কোন অধিকার ছিলো না। বরং ধনীদের মত ও ভোটের মূল্য ছিলো বেশি।

যদিও একে আমরা গণতন্ত্র বলছি তবুও সেই গণতন্ত্রের গুণগত মান সাংঘাতিকভাবেই প্রশ্নবিদ্ধ ছিলো। জনসংখ্যার অর্ধেক-নারী, কৃতদাসসহ শতকরা ৯০ ভাগ মানুষকে শাসনকার্যের বাইরে রেখে যে গণতন্ত্র চর্চা হতো তাকে আর যাই বলা যাক জনগণের শাসন বলা যায় না। তবুও জনগণের সাথে শাসনের একটি সম্পর্ক স্থাপন করার এক ঐতিহাসিক সূচনা ছিলো সেই শাসনব্যবস্থায়। তবে অনেকেই হয়তো এটি জানেন না যে, গ্রীসের গণতন্ত্রের আগে আমাদের সভ্যতায় গ্রীসের চাইতে আরো উন্নত গণতন্ত্র ছিলো। এমনকি আমাদের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাটি গ্রীক ও রোমানদের চাইতে গুণগত মানে আরো অনেক বেশি জনসম্পৃক্ত ছিলো। সেজন্যই আমরা গর্বের সাথেই বলতে পারি, প্রকৃত জনগণের শাসন বা জনগণের শাসনব্যবস্থার জন্ম আমাদের এই জনপদে।

এখন থেকে প্রায় ছাব্বিশ শত বছর পূর্বে খ্রীষ্টপূর্ব ছয় শতকে, মহামতি গৌতম বুদ্ধের জন্মেরও আগে আমাদের বৃহৎবঙ্গ বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার এক অংশ বর্তমান ভারতের অন্যতম পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্য বিহারের একটি স্থানের নাম ছিলো বৈশালী। এখনো বিহারে বৈশালী নামে একটি জেলা আছে। ঐ জেলায় বর্তমানে বসরা নামে একটি গ্রাম আছে। প্রাচীনকালে এটিই ছিলো একটি রিপাবলিক। শুধু বিহার নয়, এমন আরো জনপদ ও রাজ্য ছিলো হিমালয় থেকে সুন্দরবন এলাকায়। বৈশালীর মতো সেই নগরগুলো ছিলো বিশ্বের প্রথম রিপাবলিক। এগুলোকে বলা হতো মহাজনপদ। এতে সংঘ, গণ এবং পঞ্চায়েত ব্যবস্থা চালু ছিলো। পঞ্চায়েৎ প্রাচীন ভারতবর্ষের লোকতান্ত্রিক স্থানীয় শাসনব্যবস্থার এক অনন্য দৃষ্টান্ত। এমন একটি স্থানীয় শাসন ব্যবস্থা এমনকি ব্রিটিশরাও মেনে নিয়েছিলো। এছাড়াও ক্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে ‘সাবারকে’ এবং ‘সামবাস্তাই’ নামক দুটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের কথা গ্রীক বীর আলেকজান্ডার উল্লেখ করেছেন।

মধ্যযুগে আবারও আমরা গণতন্ত্রের মাইলফলক তৈরী করি। বাংলার শাসক হিসেবে গোপালের নির্বাচন ও ৭৫০ খ্রীস্টাব্দে সিংহাসন আরোহন ছিলো একটি উৎকৃষ্ট গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা। এর অনেক পরে ইংল্যান্ডে রাজতন্ত্রের অধীনস্থ সংসদ চালু হয়। এরপর লিবারেল ডেমোক্র্যাসি চালু হয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। তারপর কার্যত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর দুনিয়ায় আজকের গণতন্ত্রের চর্চা ব্যাপক হয়। স্বৈরশাসন, কমিউনিস্ট শাসন এবং গণতান্ত্রিক শাসন এই তিন ব্যবস্থায় দুনিয়া শাসিত হচ্ছে। গণতন্ত্রেরও নানা ধারা আছে। মার্কিন, ফরাসী গণতন্ত্রের সাথে ব্রিটেনের গণতন্ত্রের

অনেকটাই অমিল। ভারত সংসদীয় ফেডারেল ধরণের গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। পাকিস্তানে গণতন্ত্র আসে আর যায়। মধ্যপ্রাচ্যের ইরান ইসলামি 'গণতন্ত্র' চর্চা করছে। ইরাক গণতন্ত্রের নামে গৃহযুদ্ধ করছে। সৌদি আরব, আরব আমিরাত, বাহরাইন, কাতার, কুয়েত গণতন্ত্রের চাপ অনুভব করলেও রাজতন্ত্র চর্চা করছে। ওখানে রাজতন্ত্র বিদায় নিতে চাইছে না। নেপাল রাজতন্ত্র থেকে গণতন্ত্রের পথে পা ফেলেছে। ভূটানে এখনো রাজতন্ত্র চলছে। ভিয়েতনামে কম্যুনিস্ট শাসন বিরাজ করছে। মিয়ানমার এবং থাইল্যান্ডে সামরিক শাসন নিয়মিত ব্যাপার। তবে সার্বিকভাবে সম্ভবত এর মাঝে সবচেয়ে জনপ্রিয় ধারাটি হলো সংসদীয় গণতন্ত্রের।

ডিজিটাল বাংলাদেশ ও গণতন্ত্র: মূলত গণতন্ত্র মানে এক কথায় জনগণের শাসন। প্রাচীন গণতন্ত্রের সকল নাগরিকের সরাসরি অংশগ্রহণমূলক গণতন্ত্র সম্ভবত এখনো বাংলাদেশসহ দক্ষিণ এশিয়ার কোথাও প্রতিষ্ঠিত হয় নি। এক্ষেত্রে ভারতের অবস্থা কিছুটা ভালো। এর অন্যতম কারণ হচ্ছে, ভারতের নির্বাচন ব্যবস্থা অপেক্ষাকৃত উন্নত। তারা এরই মাঝে ই-ভোটিং পর্যন্ত পৌছে গেছে। এছাড়াও ভারতে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা শক্তিশালী। ভারত এখন পর্যন্ত সামরিক শাসনের আওতায় যায়নি। গণতান্ত্রিক সংস্থাগুলো সেজন্য ভঙ্গুর নয়। বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক সংস্থাগুলোর নাজুক অবস্থার পাশাপাশি সামরিক শাসনের যাতাকল ছাড়াও রয়েছে দুর্নীতি ও দুঃশাসনের সংকট। এমনকি সবকিছু ঠিকঠাক থাকলেও বাস্তবে আমাদের এখনকার গণতন্ত্র আসলে জনগণের শাসন নয়-জনগণের প্রতিনিধিদের শাসন। এজন্যই একে রিপাবলিক- জনগণের প্রতিনিধিদের শাসন বলা যায়।

অনলাইন ডিজিটাল বিশ্বকোষ উইকিপিডিয়ার উদ্ধৃতি অনুসারে, **Democracy** is a form of government in which power is held directly or indirectly by citizens under a free electoral system. অর্থাৎ গণতন্ত্র হচ্ছে এমন একটি শাসনব্যবস্থা যাতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে একটি মুক্ত নির্বাচন ব্যবস্থার মাধ্যমে ক্ষমতা জনগণের হাতে থাকে। কিন্তু প্রচলিত গণতন্ত্রে, বিশেষত আমাদের মতো দেশে এই অবস্থাটি ঘটেনা। বরং তথাকথিত গণতন্ত্রের নামে নির্বাচন হয়-কিন্তু সেই নির্বাচনে বেশির ভাগ সময়ে জনগণের মতের প্রতিফলন ঘটেনা। নির্বাচন হয়ে ওঠে কালো টাকা, পেশি শক্তি ও চর দখলের লড়াই। নির্বাচনের মারপ্যাচে জনগণের পছন্দের লোকেরা এমনকি প্রার্থীই হতে পারেনা। ফলে এই ধরনের নির্বাচনে ক্ষমতা আসলে জনগণের হাতে থাকেনা, কিছু লোকের হাতে থাকে।

বলা হতে পারে যে, যে ধরনের নির্বাচনের মাধ্যমেই হোক ক্ষমতা পরোক্ষভাবে জনগণের হাতেই থাকে, কেননা তারা জনগণের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধি। তবুও আসল অবস্থা হলো, এই প্রতিনিধিরা যেন তেনভাবে নির্বাচিত হয়ে যাবার পর জনগণের কথা শুনতে বাধ্য থাকেন না এবং জনগণ রাষ্ট্র পরিচালনায় কোনভাবেই অংশ নিতে পারে না। এমনকি বর্তমান ব্যবস্থায় জনগণের পরামর্শ দেবার ব্যবস্থাও নেই।

ক্ষমতা যেহেতু সংসদের হাতে থাকে-ক্ষমতাবান থাকে সংসদীয় ক্ষমতাসীন সরকার এবং সরকারি দলের সাংসদগণ। বিরোধী দলীয় সাংসদগণও তাদের ভূমিকা কার্যকরভাবে পালন করতে পারেন না। প্রায় সকল ক্ষেত্রেই সাংসদগণ হয়ে পড়েন গণবিচ্ছিন্ন। সাংসদগণ নিজেরা যদি তাদের এলাকার জন্য দায়বদ্ধতা সৃষ্টি না করেন, তবে জনগণের সাথে তাদের সেতুবন্ধন কোনভাবেই গড়ে ওঠে না।

আমাদের গণতন্ত্র হলো; নির্দিষ্ট সময়ের পর জনগণ যদি ভাগ্যবান হয় তবে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করে এবং সেই নির্দিষ্ট সময়ের মাঝে নির্বাচিতদের সাথে যোগাযোগ করার কোন উপায় থাকে না। বিদ্যমান পদ্ধতিতে সরকার গঠনের জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠানের পর জনগণ কেবলমাত্র রাজপথে আন্দোলন করেই সরকারকে কিছু শোনাতে পারে। বাংলাদেশে এমন নজির লাখো লাখো। এই উপমহাদেশে এটি নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। এই সেদিন পাকিস্তানে ক্ষমতাসীন দলের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী প্রাক্তণ বিচারপতিদের অধিকার আদায়ের জন্য কতো বড় লং মার্চ করতে হলো। বাংলাদেশে এই লড়াই বারবার গণতন্ত্র উদ্ধারের লড়াইতে পরিণত হয়েছে।

আমি মনে করি ডিজিটাল বাংলাদেশ হলে সরকারের আদল বদলে গেলে গণতন্ত্র একটি নতুন অভিজ্ঞতায় পরিণত হবে। সরকার ডিজিটাল হবার ফলে সরকারের সেবা জনগণের কাছে পৌছাবে এবং বর্তমানে জনগণের বুকের ওপর চেপে বসা আমলাতন্ত্র তাদের নিয়ন্ত্রণ শিথিল করতে বাধ্য হবে। এখন যেভাবে আমলাতন্ত্র ও সংসদ একচেটিয়াভাবে দেশ শাসন করে ডিজিটাল সরকার হলে সেটি অসম্ভব হয়ে পড়বে। এর ফলে সবচেয়ে বড় কাজটি হবে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা। ডিজিটাল পদ্ধতির সরকার স্বচ্ছ, দক্ষ ও অংশগ্রহণকারীত্বমূলক হতে পারে বলে গণতন্ত্রের প্রথম স্তম্ভ সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা যাবে।

অন্যদিকে গণতন্ত্রের ভিত্তি নির্বাচনকে স্পষ্ট, নিরপেক্ষ ও অবাধ করার ক্ষেত্রে ডিজিটাল প্রযুক্তির বিকল্প নেই। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, গণতন্ত্রের জন্য আমাদের ডিজিটাল বাংলাদেশ দরকার। নির্বাচন, ভোটার তালিকা, ভোটগ্রহণ এসবতো আছেই, রাষ্ট্র পরিচালনা ও দেশ শাসনের জন্যও ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করতে হবে।

একটি প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত হচ্ছে- এবার আমরা যখন ছবিসহ ভোটার তালিকা প্রণয়ন করলাম তখন কেবল যে ভূয়া ভোটার বিদায় হলো তাই নয়, নির্বাচনে অনিয়মের ধারা অনেকটাই কমে এলো। জাল ভোট, ভোটকেন্দ্র দখল এবং জালিয়াতি বলতে গেলে থাকলোই না। ফলে গণতন্ত্রের প্রথম স্তম্ভ নির্বাচন নিরপেক্ষ হলো। যদি এর সাথে ডিজিটাল ভোটিং পদ্ধতি চালু করা যায় তবে এমনকি প্রবাসীরাও তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবে। এছাড়াও ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করে যদি রাজনৈতিক দলগুলোসহ সরকারের সাথে জনগণের একটি সম্পর্ক গড়ে তোলা যায় তবে গণতন্ত্র প্রকৃতার্থেই জনগণের শাসনে পরিণত হবে। তবে সবচেয়ে বড় বিষয় হলো একমাত্র ডিজিটাল পদ্ধতিতেই সময় ভিত্তিক নির্বাচন ছাড়াও জনগণ সরকারের দেশ পরিচালনায়, উন্নয়ন কর্মকান্ডে বা সরকারের সমালোচনায় অংশ গ্রহণ করতে পারে। অন্যদিকে একমাত্র ডিজিটাল পদ্ধতিতেই সরকার জনগণকে সেইসব সেবা পৌছাতে পারে যা বর্তমান পদ্ধতিতে কোনভাবেই পৌছাতে পারে না। সরকারটি যদি ডিজিটাল হয়, তার কাজ করার পদ্ধতি যদি ডিজিটাল হয় বা যদি সরকারের পুরো ব্যবস্থাটি ডিজিটাল নেটওয়ার্কে যুক্ত থাকে তবে দেশের নাগরিকগণ কেবল সরকারের কাজকর্ম দেখতে পাবেনা, সরকারের দক্ষতা বাড়বে, স্বচ্ছতা বাড়বে এবং দুর্নীতি নামক কিছু থাকবেনা।

ডিজিটাল যুগে গণতন্ত্রের শত্রু সামরিক শাসনও অকার্যকর হতে বাধ্য। ডিজিটাল প্রযুক্তির জন্য সামরিক শাসকরা এখন আর তথ্য আটকে রাখতে পারে না। ফলে স্বৈরশাসন এখন আর কায়েম করাই সম্ভব হয় না। আমার নিজের মতে, পুরানা জমানার স্টাইলে ২০০৭ সালের ১১ জানুয়ারি বাংলাদেশে একটি সামরিক শাসন জারি হতে পারতো। একইভাবে ২৫/২৬ ফেব্রুয়ারিতে একটি সামরিক অভ্যুত্থান হতে পারতো। কিন্তু এখন এইসব সম্ভাবনা নষ্ট হয়ে যায় জনতার ডিজিটাল শক্তিতে। বস্তুত জনতার শক্তি আগেও ছিলো। কিন্তু এই ডিজিটাল যুগে জনতা তার শক্তি যেভাবে দেখাতে পারে তা এর আগে সম্ভব ছিলো না। সেদিন সরকার ইউটিউব বন্ধ করলো-কিন্তু বন্ধ রাখতে পারলো না। এমনি করে এমনকি সেনাকুঞ্জের সভার বিবরণ চলে এলো সাধারণ মানুষের কাছে। সেনাবাহিনী, পুলিশ, র‍্যাব বা বিডিআর কারও কোন ধরনের কাজকামই এখন আর ইচ্ছে করলে ঢেকে রাখা যায় না। বিগত জরুরি অবস্থার সময় ডিজিএফআই যা করেছে সেটিও ঢেকে রাখা যায় নি। অথচ এক সময়ে এসব কর্মকান্ড এমন গোপন থাকতো যে বছরের পর বছর কেউ সেইসব তথ্য জানতেই পারতো না। আমরা যখন ডিজিটাল বাংলাদেশের কথা বলি তখন প্রথমেই এটি স্পষ্ট করে বলতে হয় যে, ডিজিটাল সরকার হচ্ছে এমন একটি স্বপ্নের প্রথম ভিত্তি। আর এর ফলে দেশের সকল স্তরে কেবল গণতন্ত্র স্থায়ী হবে না বলা যেতে পারে অগণতান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠার পথও রুদ্ধ হয়ে যাবে। বাংলাদেশকে তাই গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য ডিজিটাল হতে হবে। **গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিদ্যমান দুর্বলতাগুলো কাটানোর জন্য ডিজিটাল সরকার ব্যবস্থার পাশাপাশি সংসদীয় ব্যবস্থা ডিজিটাল হতে হবে। সংসদ সদস্যগণ যদি ডিজিটাল পদ্ধতিতে জনগণের সাথে যোগাযোগ করার ব্যবস্থা রাখেন তবে তার সংসদীয় এলাকার জনগণ কেবল যে তাদের মতামত দিতে পারবে তা নয় তারা সংসদীয় কর্মকাণ্ডে অংশ নিতে পারবে। কর্মকাণ্ডের স্বচ্ছতা ও দক্ষতার পাশাপাশি জনগণের মতামতের প্রতিফলন ঘটানো যাবে।**

গ. দারিদ্র্য দূরীকরণ ও ডিজিটাল বাংলাদেশ: সরকার এখন আর আগের মতো পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনা তৈরী করেনা এবং সেই ছকে রাষ্ট্র পরিচালনা করেনা। এর বদলে দাতাদের- পন্ডিতদের বুদ্ধিতে আমরা এখন পিআরএসপি বা দারিদ্রদূরীকরণ কৌশলপত্র নিয়ে চলছি। এরই মাঝে এই কৌশলপত্রের প্রথম পর্যায় বা তিন বছর শেষ হয়েছে। এখন দ্বিতীয় পর্যায় চলছে। প্রতি তিন বছরব্যাপী এই কৌশলপত্র অনুসরণ করা হয়। আমরা সার্বিকভাবে সংশ্লিষ্ট সকল বিষয়াদি আমাদের ডিজিটাল বাংলাদেশে কি রকম হওয়া উচিত তা নিয়ে আলোচনা করে আসছি। এবার আমরা কিছু কিছু বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করতে চাই এবং এইসব খাতে করণীয় নিয়েও কিছু কথা বলতে চাই।

সরকারের ২০০৪ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী বাংলাদেশে দারিদ্রসীমার নিচে বসবাসকারী মানুষের সংখ্যা শতকরা প্রায় ৪১ ভাগ। ৮১-৮২ সালের তুলনায় এই হার যথেষ্ট কমেছে। তবে এটি আরো দ্রুতগতিতে শূন্য হতে হবে। এজন্য দেশের দরিদ্র জনগণকে দারিদ্র্য সীমার ওপর তুলে আনার জন্য খাস জমি বিতরণ, বাসস্থান প্রদান, প্রযুক্তিভিত্তিক শিল্প, কৃষিভিত্তিক শিল্প, কুটিরশিল্প এবং অন্যান্য শিল্প-ব্যবসা-বাণিজ্য করার জন্য পুজি সরবরাহ, ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান এবং অন্যান্য সহায়তা প্রদান করা উচিত।

কর্মসংস্থান মানুষের একটি মৌলিক চাহিদা। মানুষের শিক্ষা বা সার্টিফিকেট আছে অথচ কর্মসংস্থান নেই সেই অবস্থায় তার জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠতে বাধ্য। উন্নত দেশে রাষ্ট্র নাগরিকের কর্মসংস্থান নিশ্চিত করে। যদি কোন নাগরিক কোন কারণে কর্মসংস্থান না পায় তবে রাষ্ট্র তার জন্য বেকার ভাতা প্রদান করে। কিন্তু বাংলাদেশে বেকারদের নিয়ে কোন চিন্তাই নেই। বিগত তিনযুগে বাংলাদেশে শিক্ষার হার বাড়ার পাশাপাশি সেই অনুপাতে কর্মসংস্থান না হওয়ায় শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা ব্যাপকভাবে বেড়েছে। দৈনিক আজকের কাগজ অনুযায়ী দেশে

২০০৬ সালে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা দুই কোটি ৪০ লাখ। তারা সার্টিফিকেট হাতে নিয়ে অনিশ্চিত ও অনাগত ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে থাকে। তার কর্মসংস্থান না হলে রাষ্ট্র তার কোন দায়িত্ব নেয় না। এমনকি নাগরিকদের জন্য কর্মসংস্থান তৈরীর জন্য রাষ্ট্র এখন কোন ভূমিকাও পালন করে না। শিক্ষার আমূল সংস্কার করে একদিকে নতুন শিক্ষার্থীদেরকে নতুন সময়ের উপযোগী কর্মী হিসেবে গড়ে তুলতে হবে, যাতে এদের বেকারত্ব না থাকে। অন্যদিকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দিয়ে বর্তমানে যেসব শিক্ষিত বেকার আছে তাদের কর্মসংস্থান করতে হবে। রাষ্ট্র যোগ্যতা থাকা স্বত্ত্বেও ইচ্ছুক নাগরিকদেও কারো জন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা না করতে পারলে বেকার ভাতা প্রদান করবে। অন্যদিকে বৃদ্ধ, অক্ষম, প্রতিবন্ধী, বিধবা ও বিশেষ অবদানের জন্য রাষ্ট্র জীবনধারনের উপযোগী ভাতা প্রদান করবে। এ প্রসঙ্গে সংক্ষিপ্তসার হিসেবে বলা যায়, দেশের দরিদ্র জনগণকে দারিদ্র্য সীমার ওপর তুলে আনার জন্য খাস জমি বিতরণ, বাসস্থান প্রদান, প্রযুক্তিভিত্তিক শিল্প, কৃষিভিত্তিক শিল্প, কুটিরশিল্প এবং অন্যান্য শিল্পব ব্যবসা-বাণিজ্য করার জন্য পুজি সরবরাহ, ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান এবং অন্যান্য সহায়তা প্রদান করতে হবে। একই সাথে শিক্ষার আমূল সংস্কার করে একদিকে নতুন শিক্ষার্থীদেরকে নতুন সময়ের উপযোগী কর্মী হিসেবে গড়ে তুলতে হবে, যাতে এদের বেকারত্ব না থাকে। অন্যদিকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দিয়ে বর্তমানে যেসব শিক্ষিত বেকার আছে তাদের কর্মসংস্থান করতে হবে। প্রতিটি কর্মক্ষম নাগরিকের কর্মসর্ংস্থান নিশ্চিত করতে হবে। যদি কোন নাগরিক রাষ্ট্রের অক্ষমতার কারণে কর্মসংস্থান না পায় তবে রাষ্ট্র তার জন্য বেকার ভাতা প্রদান করতে হবে। অন্যদিকে বৃদ্ধ, অক্ষম, প্রতিবন্ধী, বিধবা ও বিশেষ অবদানের জন্য রাষ্ট্র জীবনধারনের উপযোগী ভাতা প্রদান করতে হবে।

ডিজিটাল নির্বাচন পদ্ধতি: তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক প্রধান উপদেষ্টা ফকরুদ্দিন আহমেদ গত ১২ এপ্রিল ২০০৭ সন্ধ্যায় জাতির উদ্দেশ্যে দেয়া তার ভাষণে ২০০৮ সাল শেষ হবার আগেই (সর্বশেষ দিন ৩১ ডিসেম্বর ২০০৮) জাতীয় সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। এর আগে নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে ভোটার তালিকা ও পরিচয়পত্র তৈরীর সময়সীমা আঠারো মাস হবে বলে জানানো হয়। যদিও সরকারের বিশেষজ্ঞ কমিটি এই কাজ করার জন্য এক বছর (প্রস্তুতির চারমাস এবং কাজের জন্য আট মাস) সময় লাগবে বলে রিপোর্ট দিয়েছিলো, তবুও নির্বাচন কমিশন সম্ভবত সময়ের জন্য ব্যর্থতার রিস্ক এড়াতে ছয় মাস বাড়তি সময় হাতে রেখেই সময় ঘোষণা করেছিলো। এটি একদিক থেকে প্রশংসনীয়। কারণ ব্যর্থ হবার চেয়ে একটু বেশি সময় নেয়া উত্তম। অবশেষে ছবিসহ ভোটার তালিকা প্রস্তুত করে ২৯ ডিসেম্বর জাতীয় নির্বাচন ও পরে উপজেলা নির্বাচন করে ফখরুদ্দিন সরকার বিদায় নিয়েছে। তবে যেভাবে নির্বাচন করা হয়েছে তাকে আরও উন্নত ও ডিজিটাল করা যেতো কিনা সেটি নিয়ে আলোচনা করতে পারি।

ই-ভোটিং: ১৯৬০ সালে পাঞ্চ কার্ড (কম্পিউটারের ডাটা সংরক্ষণের জন্য ব্যবহৃত এক ধরনের পদ্ধতি) প্রস্তুত হওয়া শুরু হলেই ইলেকট্রনিক ভোটিং পদ্ধতির ধারণার জন্ম হয়। তবে জাতীয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে পাঞ্চকার্ড ভোটিং পদ্ধতি তেমন জনপ্রিয়তা পায়নি। এরপর প্রচলিত হয় ডিআরই পদ্ধতি। ই-ভোটিং-এর একটি ধরন হলো কাগজভিত্তিক। একে ডকুমেন্ট-ব্যালট ভোটিং সিস্টেমও বলা হয়। অন্যটি ডিআরই (ডাইরেক্ট রেকর্ডিং ইলেকট্রনিক) ভোটিং পদ্ধতি হিসেবে পরিচিত। এখন পর্যন্ত যেসব ক্ষেত্রে জাতীয় নির্বাচনে ই-ভোটিং পদ্ধতি চালু করা হয়েছে তাতে ডিআরই পদ্ধতিই ব্যবহার করা হয়েছে। এই ডিআরই (ডাইরেক্ট রেকর্ডিং ইলেকট্রনিক) পদ্ধতিতে ভোট দান এরই মাঝে কিছু কিছু দেশে বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। ব্রাজিলে এই পদ্ধতিটি সর্বাধিক প্রচলিত। ওখানকার সবাই জাতীয় নির্বাচনে এই পদ্ধতিতে ভোট দেয়। আমাদের পাশের দেশ ভারতে এই পদ্ধতি ১৯৯৮ সাল থেকেই চালু আছে। ২০০৪ সালেও ভারত এই পদ্ধতিতে নির্বাচন করেছে। বড় দেশ বলে তারা পুরো দেশটাতে এখনো এই পদ্ধতিতে নির্বাচন চালু করতে পারেনি। তবে আগামী নির্বাচনে ভারত ব্যাপকভাবে এই পদ্ধতি ব্যবহার করবে-এটি নিশ্চিত করে বলা যায়। ভারত ছাড়াও নেদারল্যান্ড, ভেনেজুয়েলা এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও ই-ভোটিং চালু আছে। ডিআরই পদ্ধতি ছাড়াও এস্তোনিয়া এবং সুইজারল্যান্ডে ইন্টারনেট ভোটিং চালু আছে।

ভারতের অভিজ্ঞতা: ভারতের দুটি সরকারী প্রতিষ্ঠান বাঙ্গালোরের ভারত ইলেকট্রনিক্স লিমিটেড এবং হায়দারাবাদের ইলেকট্রনিক্স কর্পোরেশন অব ইন্ডিয়ার মাধ্যমে ইভিএম (ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন)-এর মাধ্যমে ১৯৮৯-৯০ সালে উৎপাদিত ইভিএম দিয়ে মধ্যপ্রদেশ (৫টি আসন), রাজস্থান (৫টি আসন) ও দিল্লীর (৬টি আসন) মোট ১৬টি আসনে ভোট গ্রহণ করে ১৯৯৮ সালে। ২০০৪ সালে এই ভোট গ্রহণের আওতা আরো বাড়ানো হয়।

যে যন্ত্রটি দিয়ে ভারত ই-ভোটিং করে তার প্রযুক্তি খুব সাধারণ। এর জন্য জাপান থেকে প্রসেসর আমদানী করা হয়। সেই প্রসেসরে নতুন কোন তথ্য প্রবেশ করানো যায়না। মোট দুটি অংশে বিভক্ত থাকে এই যন্ত্রটি। একটি ব্যালট অংশ। এটির সহায়তায় ভোটার ভোট দেয়। অন্য অংশটিতে ভোটের তথ্য সংরক্ষণ করা হয়। এই যন্ত্রগুলো ব্যাটারি চালিত। প্রতিটি যন্ত্র মোট ৩৮৪০ টি ভোট গ্রহণ করতে পারে। একটি যন্ত্রে ১৬ জন করে মোট ৬৪ জন

প্রার্থীর ভোট দেবার ব্যবস্থা করা যায়। এই যন্ত্রে কেউ একবার ভোট দিলে যন্ত্রটি লকড হয়ে যায় এবং যতোই চেষ্টা করা হোক এতে দ্বিতীয় ভোট ততোক্ষণ দেয়া যাবেনা যতোক্ষণ আবার ভোট দেবার জন্য সেটি আনলক না করা হবে। এই যন্ত্রগুলোর রেকর্ড অমোচনীয়। ফলে প্রয়োজনে পুনগণনা করা যায়।

ডিজিটাল ভোটিং-এর ভালো মন্দ: ডিআরই পদ্ধতির সমালোচকরা বলেন যে, এর ফলে জাল ভোট সম্পূর্ণ বন্ধ করা যায়না। বিশেষ করে ভোটার তার ভোট দেবার কোন প্রমাণপত্র হাতে পায়না বলে সন্তুষ্টির প্রশ্ন থেকে যায়। আমেরিকায় এই পদ্ধতির সমালোচনা করতে গিয়ে বলা হয়, DRE machines must have a voter-verifiable paper audit trails. ভারতে এই পদ্ধতির সমালোচনা করতে গিয়ে বলা হয়েছে যে, এর ফলে কোন এলাকার ভোটাররা কাকে কম বা কাকে বেশি ভোট দিয়েছে তা জানা যায়। তবে সারা দুনিয়ার যেখানেই ই-ভোটিং চালু হয়েছে সেখানেই এর সুফলগুলো খুব স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করা সম্ভব হয়েছে। সম্পূর্ণভাবে বন্ধ না হলেও ডিআরই পদ্ধতিতে জালভোট, ভোট কেন্দ্র দখল ইত্যাদি প্রায় অনেকটাই বন্ধ করা যায়। ভোটিং মেশিনে ভোট দানের সুবিধার মাঝে আছে খুব দ্রুত ভোট গণনা করতে পারার ব্যাপারটি। এটিকে সবার আগেই উল্লেখ করা যায়। এই ব্যবস্থায় আমাদের দেশের ভোট গণনার প্রচলিত নিয়ম অনুসারে ভোটকেন্দ্রে ভোট গণনা করতে কয়েক মিনিট সময় লাগবে মাত্র। এর মানে দাড়াবে যে, ভোট গ্রহণ শেষ করার সাথে সাথে ফলাফল দেয়া যাবে। কোন এলাকায় কে বেশি আর কে কম ভোট পেলো সেটি আমাদের প্রচলিত পদ্ধতিতে জানা যায়। ফলে ভারতে যে কারণে ভোটিং মেশিন সমালোচিত, সেটি আমাদের জন্য প্রযোজ্য হবেনা। অনেকেই মনে করেন, মেশিনে ভোট দেয়াটা আমাদের মতো 'অশিক্ষিত' মানুষের দেশে জটিলতা বাড়াবে। কিন্তু তারা হয়তো ভারতের কথা মাথায় রাখেননি। ভারতে প্রচলিত পদ্ধতির ভোটদানের চাইতে মেশিনে ভোট দেয়া অশিক্ষিত লোকদের জন্য সহজ বলে প্রমাণিত হয়েছে। মেশিনে বা তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করে ভোটদানে আরো যেসব সুবিধার কথা বলা হয়েছে তার মাঝে আছে ভোটের নিরাপত্তা, ভোটযন্ত্রের বহনযোগ্যতা এবং নির্বাচনের গ্রহণযোগ্যতা। কেউ কেউ বলেন যে, এই পদ্ধতির ভোট দানের জন্য যন্ত্র বাবদ ব্যয় হবে অনেক টাকা। ভারতে শুরুতে একটি ভোটিং যন্ত্র তৈরী করতে খরচ পড়তো ৫৫০০ রুপী। এখন সেটি প্রায় অর্ধেকে নেমে এসেছে। আমি বাংলাদেশের টাকায় একে বর্তমান বাজার দরে পাচ হাজার টাকার বেশী দাম পড়বে বলে মনে করিনা। কারণ প্রযুক্তির দাম কমেছে অনেক। এছাড়া এই ব্যবস্থায় ভোট গ্রহণের মোট ব্যয় কমে যাবে। কেননা এই ব্যবস্থায় ব্যালট পেপার ছাপা-পরিবহন, কালি, স্টাম্প, স্টাফের খরচ কমবে। শুধু তাই নয় সার্বিক সময়ও কমবে এতে।

যেহেতু আমরা ভোটার ডাটাবেজ করেছি সেহেতু আমাদের জন্য কাজটি আরো সহজ হতে পারতো। আমাদের ভোটার ডাটাবেজটি আমরা ভোটযন্ত্রে সংরক্ষণ করে দিতে পারি এবং সেই যন্ত্রই সরাসরি ভোটদানের হিসাব রাখতে পারে। মেমোরী কার্ড এজন্য আদর্শ সমাধান হতে পারে। ভোটযন্ত্রে বারকোড পাঠ করা, আইডি কার্ড বা আঙ্গুলের ছাপ পাঠ করা কিংবা অন্যান্য বায়োমেট্রিক্স ফিচার যোগ করা যেতে পারে। একই সাথে ইন্টারনেটে ভোটিং ব্যবস্থাও এভাবে চালু করা যায়। তখন দেশীয় ভোটার বা প্রবাসীরা ভোট দিতে পারবে তার নিজের বাড়ীতে বসে।

আমাদের ছবিসহ ভোটার তালিকা এবং জাতীয় পরিচয়পত্র যেহেতু ল্যাপটপ দিয়ে করা হয়েছে এবং যেহেতু উপজেলা পর্যায়ে তথ্যকেন্দ্র স্থাপিত হচ্ছে এবং যেহেতু সারাদেশই ইন্টারনেটের আওতায় আছে সেহেতু আমরা এমনকি ভোটিং মেশিন না কিনে ভোটার তালিকার জন্য কেনা ল্যাপটপগুলোকেই ভোট দেবার যন্ত্রে রূপান্তর করতে পারি। ল্যাপটপগুলোর সাথে একটি ডিজিটাল ব্যালটপত্র যুক্ত করে ডাটাবেজ সফটওয়্যার দিয়ে পুরো ভোটদান প্রক্রিয়া নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তায় প্রস্তুত করা যায়। এমনকি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মেশিনে ভোটদানের পাশাপাশি কাগজের ব্যালটের প্রক্রিয়ার কথা যা বলা হয়েছে সেটিও পূরণ করা যায়। কম্পিউটারগুলোর সাথে প্রিন্ট করার ব্যবস্থা এবং ব্যালট বাক্সে তা ফেলার বিকল্প ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

সার্বিকভাবে পর্যালোচনা করে আমরা একথা বলতে পারি যে, বর্তমান পরিস্থিতিতে ডিজিটাল ভোটিং সিস্টেম চালু করার জন্য বাড়তি কোন সময়েরও দরকার ছিলোনা। ভোটার তালিকার জন্য যে আঠারো মাস সময়ের প্রয়োজন হয়েছে তার সাথে আরো তিন মাস সময় যোগ করে মোট একুশ মাসের মাঝে আমরা আমাদের ভোটদান পদ্ধতিটি পুরোপুরি বদলাতে পারতাম। আমাদের রাজনীতিবিদরা সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য স্বচ্ছ ব্যালট বাক্স দাবী করেন। কিন্তু তারা এটি এখনো ভেবে দেখেননি যে, স্বচ্ছ বা কাচের বাক্স দিলেই ভোটদানের অনিয়ম সমাপ্ত হবেনা। কাগজের ব্যালটে শতবর্ষের পুরানো কায়দায় জালভোট দেবার যে অবাধ সুযোগ থাকছে তাতে প্রয়োজন প্রযুক্তিগত পরিবর্তন। আর সেই পরিবর্তনটি আসতে পারে ভোট দেবার পদ্ধতিটিকে তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর করার মাধ্যমে। আমি মনে করি, ফকরুদ্দিন সাহেবের সরকার তার কাছে থাকা ২৪ মাস থাকা সময়কে কাজে লাগিয়ে ভোটদানের জন্য ডিজিটাল পদ্ধতি প্রবর্তন করার উদ্যোগ নিতে পারতেন।

দুর্ভাগ্যক্রমে সেই কাজটি তিনি করলেন না।

গত জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অনিবাসী বা প্রবাসীরা ভোট দিতে পারেনি। তারা নাগরিক হয়েও এই নাগরিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছে। নির্বাচিত হাসিনা সরকার অবশ্য প্রবাসীদের ভোটাধিকার দানের পক্ষে।

ফিলিপাইনের একজন প্রবাসী নারীর ভোটাধিকার: ফিলিপাইনে জন্ম নেয়া একজন মহিলা সেই দেশের দ্বৈত নাগরিকত্ব আইনের অধীনে ফিলিপাইনের নাগরিকত্ব গ্রহণ করে সেই দেশের ২০০৪ সালের নির্বাচনে ভোটার হবার আবেদন জানায়। কিন্তু নির্বাচন কমিশন তাকে ভোটাদিকার দেয়নি। কমিশনের অজুহাত ছিলো যে, তিনি ফিলিপাইনের নাগরিক হলেও দেশের অধিবাসী নন। এরপর তিনি ফিলিপিন্সের উচ্চ আদালতে বিচার প্রার্থনা করেন। আদালত আগস্ট ৪, ২০০৬ তারিখে দেয়া রায়ে ঐ মহিলার ভোটার হবার অধিকারকে সমুন্নত রাখে। ফিলিপাইনের এই দ্বৈত নাগরিকের বিষয়টি বিশেষ করে যেসব দেশের প্রবাসী-অনিবাসী নাগরিকের সংখ্যা বেশি তাদের মাঝে গুরুত্ব পাচ্ছে।

প্রবাসীদের দেয়া হিসাব অনুযায়ী বাংলাদেশের প্রায় সত্তুর লাখ লোক প্রবাসে বাস করেন। এই বিশাল জনগোষ্ঠীর একটি অংশ দ্বৈত নাগরিকত্ব বহন করে। অর্থাৎ যে দেশে তারা বসবাস করে সেই দেশের নাগরিকত্ব তারা ভোগ করে। এর সাথে জন্মসূত্রে তারা বাংলাদেশের নাগরিক। এদের অনেকেরই সন্তানাদি বিদেশেই জন্ম নিয়েছে। বাবা-মার সূত্রে বাংলাদেশের সাথে তাদের সম্পর্ক থাকলেও তারা বাংলাদেশের ভোটের ব্যাপারে তেমন আগ্রহ প্রকাশ করে বলে মনে হয়না। ভারত দ্বৈত নাগরিকত্ব এবং ভোটাধিকার বিষয়টির নিস্পত্তি করার চেষ্টা করছে। ভারতে ২২ ডিসেম্বর ২০০৩ তারিখে পাশ করা ও ২ অক্টোবর ২০০৫ থেকে কার্যকর একটি আইনের অধীনে চার প্রজন্ম পর্যন্ত প্রবাসীকে ভারতীয় অরিজিন বলে গণ্য করা হয়। তারা অনেক সুবিধাই ভোগ করে। তবে তাদের ভোটাধিকার আছে এমন খবর আমি পাইনি। বাংলাদেশেরও বিপুল সংখ্যক লোক এমন সংজ্ঞায় পড়ে। এ বিষয়ে তেমন কোন সুস্পষ্ট বিধান আছে বলে আমার জানা নেই। বরং বাংলাদেশী অরিজিন হবার পরেও বিদেশের নাগরিক হবার ফলে আমাদের সরকারে অংশগ্রহণকারী কিছু লোকের বিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপিত হওয়া থেকে এটি উপলব্ধি করা যায় যে বিষয়টি আইনগতভাবে বৈধ নয়। কিন্তু বাস্তবতা হলো, বিষয়টি এখনই স্পষ্ট করা দরকার।

কিছুদিন আগে থেকেই ব্রিটেন-মার্কিন প্রবাসী অনেক বাংলাদেশীর মেইল, ফোন ও ব্যক্তিগত সাক্ষাৎ পাচ্ছি-যারা তাদের ভোটাধিকার নিয়ে কথা বলছেন। এর মাঝে প্রবাসী বাংলা পত্রিকার সম্পাদক থেকে আমার লেখার পাঠক বা বিজয় বাংলা সফটওয়্যারের ব্যবহারকারীরাও রয়েছেন। কিছুদিন আগে প্রবাসীদের পক্ষ থেকে নির্বাচন কমিশনে স্মারক লিপি প্রদান এবং নির্বাচন কমিশনারদের সাথে দেখা করার খবরও আমরা পড়েছি।

ভোটাধিকারের বিষয়টি নিয়ে যারা সত্যি সত্যি সংকটে আছেন তারা বাংলাদেশেরই অনিবাসী নাগরিক। সারা দুনিয়াতেই এরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। জাতিসংঘের শান্তিবাহিনীতে যোগদানকারী সশস্ত্রবাহিনী, দূতাবাস কর্মচারী বা বিদেশে
সরকারি-বেসরকারিভাবে কর্মরত, বসবাসকারী বা শিক্ষারত বাংলাদেশী নাগরিকেরা এই শ্রেণীভুক্ত। প্রবাসীদের এই অংশ অস্থায়ীভাবে দেশের বাইরে ছয় মাসের বা তার চেয়ে বেশি সময়ের জন্য কর্মজীবন কাটায়। এরা সকলেই কেবলমাত্র বাংলাদেশের নাগরিকত্ব ধারণ করে। বাস্তব অবস্থা হলো, এই প্রবাসীরা দেশের রাজনৈতিক ধারা থেকে মোটেই বিচ্ছিন্ন নয়। বিদেশে তারা বাংলাদেশী রাজনৈতিক দলগুলোর শাখা গঠন করে সকল রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডই পরিচালনা করে থাকে। কিন্তু দেশে অবস্থান না করায় বা আরো স্পষ্ট করে বলতে গেলে ভোটার তালিকা প্রণীত হবার সময়ে দেশে না থাকার কারণে তারা ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হতে পারেনা। আবার যদি কেউ ঐ সময়ে দেশে এসে বা তাদের পছন্দমতো সময়ে দেশে এসে ভোটার হতেও পারে তথাপি তারা দেশে অবস্থান না করলে ভোট দিতে পারেনা। প্রবাসে ভোট গ্রহণের কোন উপায় এখনো আমাদের নির্বাচন কমিশন করতে পেরেছে বলে আমি জানতে পারছিনা। বিদেশে কর্মরত বাংলাদেশের সৈনিক এবং দূতাবাসের কর্মচারীরা কিভাবে ভোট দিতে পারে বা আদৌ ভোট দিতে পারে কিনা বা ভোট দিলেও তাদের ভোট আদৌ হিসাবে আসে কিনা এই বিষয়টিও আমার কাছে স্পষ্ট নয়। আমার জানামতে, পোস্টাল ব্যালট ব্যবস্থাটি কেবলমাত্র দেশে কর্মরত ভোটারদের বা অত্যন্ত সীমিতভাবে বিদেশের জন্য প্রযোজ্য হচ্ছে। তবে জয় পরাজয়ে এই ভোটগুলো কোন ভূমিকা রাখে কিনা সেটি আমি বুঝিনা। এসব ভোট যথাস্থানে পৌছানোর আগেই সম্ভবত নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা হয়ে যায়। অন্যদিকে হয়তো এই ভোটগুলো সংখ্যায় এতো কম যে, ফলাফল নির্ণয়ে এগুলো কোন ভূমিকাই পালন করতে পারেনা। কিন্তু সকল অনিবাসীর ভোট জাতীয় নির্বাচনে অবশ্যই বিরাট ভূমিকা পালন করবে। নীতিগতভাবে বাংলাদেশের দ্বৈত নাগরিকদের বিষয়ে বিতর্ক থাকলেও একমাত্র বাংলাদেশের নাগরিক অথচ অনিবাসী (প্রবাসী) জনগোষ্ঠীর ভোটাধিকার না থাকার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই। খুব স্পষ্টভাবেই একথা আমাদের স্বীকার করা উচিত যে এরা

কেবল বৈদেশিক মুদ্রাই দেশে পাঠায়না, এরা এদেশের অর্থনীতি, সমাজ ও জীবনধারার একটি শক্তিশালী প্রবাহ। এরা দেশশাসনে অংশ নেবেনা এটা হতেই পারেনা। তবে এক্ষেত্রে একটিই অজুহাত হতে পারে যে, তারা দেশে বাস করেনা। কিন্তু যারা বাংলাদেশের নাগরিক এবং অন্য কোন দেশের নাগরিক নয় তাদের ভোটাধিকার নিয়ে কোন প্রশ্ন ওঠার সুযোগ নেই। বিশেষ করে জাতীয় নির্বাচনে তাদের ভোট দেবার পুর্ণ অধিকার আছে এবং নির্বাচন কমিশনের উচিত তাদেরকে ভোটার করা ও তাদের ভোট গ্রহণ করার ব্যবস্থা করা। প্রশ্ন উঠতে পারে, তাদেরকে ভোটার বানালে ভোট নেয়া হবে কেমন করে? তবে ভোটাধিকার প্রশ্নে আরো এক ধরনের প্রশ্ন নিয়ে কিছু খবর দেয়া উচিত বলে আমি মনে করছি।

<u>অনাগরিকদের ভোটাধিকার:</u> সাম্প্রতিককালে কেবল দেশের নাগরিকদের ভোটাধিকার নয় বরং এই ধারনাটি প্রবল হচ্ছে যে কেবল অনাগরিক কিন্তু নিবাসী তাদেরকেও অন্তত স্থানীয় নির্বাচনে ভোটাধিকার দিতে হবে। সারা দুনিয়াতেই এখন ভোটাধিকার বা গণতন্ত্রের সংজ্ঞা বদলাচ্ছে। ফলে কেবলমাত্র নাগরিকেরা নন, অনাগরিক নিবাসীরাও ভোটাধিকার পেতে শুরু করছেন।

আমেরিকার নিউইয়ক পোস্ট-এর সূত্র ধরে তাইপে টাইমস পত্রিকার ৩ মার্চ ২০০৭ তারিখে প্রকাশিত খবরে বলা হয়েছে যে, নিউইয়র্কের অনাগরিকরা স্থানীয় নির্বাচনে ভোট দেবার অধিকারের দাবি তুলছে। তারা মনে করে, নাগরিকদের মতোই তারা ট্যাক্স প্রদান করে। সূতরাং তারাও নাগরিকদের মতোই ভোট দেবার অধিকার রাখে। পত্রিকার খবর অনুযায়ী বিশ্বের অন্তত ২৪টি দেশ নিবাসী অনাগরিকদেরকে ভোট প্রদানের অধিকার প্রদান করে। “At least 24 nations let non-citizens vote at some level. EU members allow resident aliens from other EU countries to vote in local elections. New Zealand lets any resident of a year or more vote in local and even national elections. Chile and Uruguay also allow non-citizen voting at the national level.”

১২ এপ্রিল ২০০৭ তারিখের টাইম পত্রিকার খবর হলো, ওয়াশিংটনের একটি উপশহরে অনাগরিকেদেরকে স্থানীয় নির্বাচনে ভোট দিতে অনুমতি দেয়া হয়েছে “ Earlier this year, Takoma Park, Md., A suburb of Washington with a liberal tilt, held a special election to fill a vacant city-council seat. It was the town’s latest contest under a 1992 law that allows any adult resident—including noncitizens—to vote for local offices.”

২৭ এপ্রিল ২০০৭ তারিখের কানাডীয় পত্রিকা ন্যাশনাল পোস্ট পত্রিকার খবর হলো, দুই ডজনের বেশি কাউন্টিতে অনাগরিকদেরকে ভোট প্রদান করতে দেয়া হয়। “More than two dozen countries today give voting rights to non-citizen residents. This includes the United Kingdom, Ireland and even parts of the United States where non-citizen permanent residents can vote in local elections. The most permissive voting system is in New Zealand, where all immigrants can vote in both local and national elections after one year of residency.

সার্বিকভাবে এ বিষয়টি পরিষ্কার যে, দিনে দিনে ভোটের বিষয়টি পুরানো ধারা অতিক্রম করছে। একদিকে দেশের জাতীয় এবং স্থানীয় এই দুই ধরনের নির্বাচনে দুটি ভিন্ন ভোটার তালিকা রাখার প্রয়োজন। কারণ একজন নাগরিক ইচ্ছে করলে জাতীয় নির্বাচনে এক স্থানের এবং স্থানীয় নির্বাচনে অন্যস্থানের ভোটার হতে চাইতে পারে। আমি আমার স্থায়ী ঠিকানায় জাতীয় নির্বাচনের ভোট দিতে পারি। আবার স্থানীয় নির্বাচনে আমি বর্তমানে বসবাস করার ঠিকানায় ভোট দিতে চাইতে পারি। অন্যদিকে অনাগরিক নিবাসী ভোটারদেরকে স্থানীয় নির্বাচনে ভোট দেবার সুযোগ দেয়া যায়, যারা স্থানীয় নির্বাচনে ভোট দিতে পারলেও জাতীয় নির্বাচনে ভোট দেবার অধিকার নাও পেতে পারে। আবার অনিবাসী বাংলাদেশের নাগরিকেরা জাতীয় নির্বাচনে ভোট দিতে পারে। তাদেরকে স্থানীয় নির্বাচনে ভোট দেবার অধিকার নাও দেয়া হতে পারে।

আমি বিশ বছর যাবতই একথা বলে আসছি যে, ভোটার তালিকাটি ডিজিটাল করুন। বলার অপেক্ষা রাখেনা, কেবলমাত্র একটি ডিজিটাল ভোটার ডাটাবেজ থেকেই অতি সহজে স্থানীয় এবং জাতীয় উভয় নির্বাচনের জন্য ভিন্ন ধরনের ভোটার তালিকা প্রনয়ণ করা যেতে পারে। সেজন্য ভোটার তালিকা প্রণয়ন ফর্মে একটি নতুন তথ্য যুক্ত করা উচিৎ। সেই তথ্যটি হলো, ভোটার জাতীয় নির্বাচনে কোথায় বা স্থানীয় নির্বাচনে কোথায় অংশ নিতে চায় তার বিবরণ। অনিবাসী বাংলাদেশীদের ভোটার তালিকা দূতাবাসের মাধ্যমে প্রণীত হতে পারে। যেসব দেশে উল্লেযোগ্য সংখ্যক বাংলাদেশী আছে, যেমন যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, জার্মানী, ইটালি, সৌদি আরব, কাতার, সংযুক্ত আরব আমিরাত, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, জাপান, কোরিয়া, অস্ট্রেলিয়া ইত্যাদি এসব বা অন্যসব দেশে বাংলাদেশের

দূতাবাসের মাধ্যমে বাংলাদেশীদেরকে ছবিসহ ভোটার ডাটাবেজে অন্তর্ভুক্ত করা যায়। তারা এই তথ্যটি জানাবে যে, কোন সংসদীয় এলাকায় তারা ভোট দেবে। সেই সূত্র ধরে জাতীয় ভোটার ডাটাবেজ আপডেট হবে এবং ভোটার তালিকার খসড়া ও চূড়ান্তটি মুদ্রিত হবে।

তবে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হবে ভোট গ্রহণ করা নিয়ে। সারা দুনিয়া থেকে দেশের তিনশোটি সংসদীয় আসনে কিভাবে ভোট গ্রহণ করা হতে পারে। এটি সম্ভব যে, দূতাবাসগুলো ভোটগ্রহণ কেন্দ্র হতে পারে। দূতাবাসের আওতায় প্রয়োজনে একই দেশে একাধিক ভোট কেন্দ্রও স্থাপিত হতে পারে। ভোট গ্রহণের সময় নিয়ে প্রশ্ন উঠবে। কারণ বাংলাদেশে যখন ভোট গ্রহণ করা হবে তখন কোন দেশে হয়তো রাত বা ভোট না দেবার সময় হতে পারে। এই সমস্যাটি অতিক্রম করার জন্য বাংলাদেশে ভোট গ্রহণ করার সময় শেষ হবার আগেই বিদেশে ভোট নিতে হবে। প্রয়োজনে একদিন আগে ভোট নেয়া যাবে। কিন্তু তখন ভোট গননা করা যাবেনা। ভোট গননা করা হবে বাংলাদেশে ভোট গ্রহণ কাজ সমাপ্ত হবার সময়ে।

কিন্তু কোন অবস্থাতেই কাগজের ব্যালট পেপারে এই ভোট গ্রহণ করা যাবেনা। এজন্য ডিজিটাল ভোট পদ্ধতি প্রয়োগ করতে হবে। (দ্রষ্টব্যঃ দৈনিক জনকণ্ঠ ১৫ এপ্রিল ২০০৭)। একটি ভোট যন্ত্রে (এটি কোন জেনালের পারপাস কম্পিউটার বা এমবেডেড যন্ত্র হতে পারে) ভোটার ভোট দেবেন। সেই যন্ত্রে জাতীয় সংসদের তিনশো আসনের ব্যালট পেপার সংরক্ষণ করা থাকবে। সেই যন্ত্রে আসন নম্বর অনুসারে ডিজিটাল ব্যালট পেপার ইস্যু করা হবে। এরপর ভোটার তার ভোট প্রদান করবেন। এই যন্ত্রটি অত্যন্ত স্বয়ংক্রিয়ভাবে ভোটগুলোকে সংসদ এলাকা ভিত্তিতে বাছাই করে ফলাফল প্রদান করবে। দেশেও ভোটিং মেশিনে ভোট নেয়া হবে। এখানে জেনারেল পারপাস কম্পিউটারের প্রয়োজন হবেনা। কিন্তু ভোট গননার ফলাফল সার্ভার জাতীয় কম্পিউটারে প্রস্তুত করা হবে বলে বাইরের ভোটগুলোও সরাসরি এই সার্ভারে ডাটা আপলোড করবে। দূতাবাসগুলোর এই ডাটায় হস্তক্ষেপ করার কোন সুযোগই রাখা হবেনা।

সূতরাং আমি আবারো অনুরোধ করবো একটি ডিজিটাল ভোটার তালিকায় ডিজিটাল পদ্ধতিতে ভোটগ্রহণ করে দেশটিকে একুশ শতকে প্রবেশ করতে দিন।

<u>ডিজিটাল সরকারের আরও কতিপয় ক্ষেত্র:</u> ডিজিটাল সরকার ব্যবস্থায় গণতন্ত্র, স্থানীয় সরকার নির্বাচন ও দ্রারিদ্রদূরীকরণ বিষয়গুলো নিয়ে পর্যালোচনা করার পাশাপাশি সরকারের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু কাজকে ডিজিটাল পদ্ধতিতে রূপান্তর করার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে কথা বলা যায়।

<u>ক. ডিজিটাল ভূমি ব্যবস্থা:</u> সম্পতি ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল অব বাংলাদেশ ঘোষণা করেছে যে, বাংলাদেশের দুর্নীতির সবচেয়ে বড় আখড়াটি হলো ভূমি ব্যবস্থা। বাংলাদেশে বসবাসকারী কোন মানুষকে এই বিষয়টি সম্পর্কে নিশ্চিত করার জন্য কোন তথ্যপ্রমাণ দিতে হবেনা। কারণ প্রায় প্রতিটি মানুষই জানে যে, এর সাথে কেবল দুর্নীতিই নয়, দেশের মামলা মোকদ্দমার সিংহভাগও জড়িত। সম্ভবত এটিও সত্য যে, বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় সমস্যাটিও হতে যাচ্ছে ভূমি সংক্রান্ত। আমরা জানি জনসংখ্যার তুলনায় বাংলাদেশের ভূমির পরিমাণ অত্যন্ত নগণ্য। আমরা কিলোমিটার প্রতি এতোবেশি লোক বাস করি যে, এক সময়ে আমাদের সকল মানুষের জন্য শুধুমাত্র বাসস্থান পাওয়াই দুরূহ হয়ে পড়বে। এখনই মাত্র ৫৫ হাজার বর্গমাইল একটি ভূখন্ডে ১৫ কোটি মানুষের বসবাস সত্যিই অভাবনীয়। তদুপরি প্রতিদিন বাড়তি জনসংখ্যার চাপ নিতে হচ্ছে এই দেশটিকে। দেশের কিছু বিশেষ এলাকা যেমন উপকূল, দ্বীপ, জলাভূমি-নিম্নাঞ্চল, বিল অঞ্চল, পার্বত্য অঞ্চল বা হাওর অঞ্চল; যেখানে মানুষের বসবাস প্রাকৃতিক প্রতিকূলতার মুখোমুখী, সেইসব অঞ্চল ছাড়া প্রয়োজনীয় বাসস্থান এবং চাষের জমি বলতে গেলে নেই। নগরায়ণ বা শিল্পায়ন জমির ওপর আরো বাড়তি চাপ সৃষ্টি করছে।

দৈনিক জনকণ্ঠ পত্রিকার ০৮ জুলাই ২০০৭ সংখ্যায় প্রকাশিত একটি খবর অনুযায়ী দেশে প্রতিদিন ৪৪৪ একর কৃষিজমি কমে যাচ্ছে। এই হিসাবে প্রতি ঘণ্টায় কমছে ১৮ একর জমি। এভাবে চললে আগামী ৫০ বছরে এক ইঞ্চি জমিও থাকবেনা চাষাবাদ করার জন্য। পত্রিকার খবরে আরো বলা হয়, ১৯৭৪ সালে মোট আবাদি জমি ছিলো মোট জমির শতকরা ৫৯ শতাংশ। ১৯৯৬ সালে সেটি কমে ৫৩ শতাংশে নেমে আসে। এখনকার হিসাব অনুযায়ী প্রতি বছর ১ লাখ ৬০ হাজার একর আবাদী জমি কমছে।

দুর্ভাগ্যজনকভাবে দেশের কারো মাঝেই এ বিষয়ে কোন উদ্বেগ বা শঙ্কা লক্ষ্য করছি না। কেউ যেন ভাবছেন না, ফসলি জমি না থাকলে আমাদের পরিণতি কি হবে? বড় কষ্ট নিয়ে বলতে হচ্ছে, ফসলের জমি না থাকলে কোটি কোটি মানুষের খিদায় অন্ন আসবে কোন উৎস্য থেকে এই কথাটি অনুগ্রহ করে কেউ না কেউ ভাবুন।

এ বিষয়ে সম্ভবত কেউ বিতর্ক করবেন না যে, দিনে দিনে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং জনগণের বসবাস করার জন্য জমি ব্যবহৃত হওয়ায় চাষযোগ্য জমি কমছে। এছাড়াও হাট-বাজার, রাস্তাঘাট, বাধ-কালভার্ট-সেতু, কল-কারখানা.

পেট্রোল পাম্প এবং অন্যান্য কাজেও প্রচুর ভূমি ব্যবহৃত হচ্ছে। ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে পরিবেশ। পরিবেশ বা অন্য কোন আইন কোনভাবেই কার্যকর নয়।

তবে ভূমি নিয়ে বাংলাদেশের বড় সংকট হলো এর ব্যবস্থাপনায়। ব্রিটিশ আমল থেকে বিরাজিত এই ভূমিব্যবস্থায় কার্যকর কোন সংস্কার হয় নি। বিগত দিনগুলোতে ভূমি ব্যবস্থাপনায় ছোট খাটো কিছু পরিবর্তন করা হলেও আমূল ভূমিসংস্কার কেউ করে নি। কারো কর্মসূচিতেও ভূমি সংস্কার নেই। কোন রাজনৈতিক দল এই কাজটি করতে চায়না। বড় দলগুলোতো বটেই ছোট, বাম বা প্রগতিশীল দলগুলোও এ বিষয়ে সুনির্দিষ্ট কোন প্রস্তাব প্রদান করেনা। তারা হাসিনা-খালেদা বদলালেও ভূমির মালিকানা বদলাতে রাজী নন।

স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধু ভূমির সিলিং ১০০ বিঘায় করলেও নানা ফাঁক ফোকর দিয়ে জোতদারের জমি জোতদারের কাছেই থেকে গেছে। তারা নানা নামে-বেনামে, এক পরিবারকে নানা পরিবারে বিভাজিত করে এইসব জমি কাগজে কলমে হস্তান্তর করে নিজের পরিবারের মাঝেই জমি রেখে দিয়েছে। প্রকৃতপক্ষে তখনকার প্রেক্ষিতে ১০০ বিঘার সিলিংটাই সঠিক ছিলোনা। সেটি দশ একর বা ১০০০ শতাংশ হলে কিছু ফলাফল পাওয়া যেতো। ফলে বঙ্গবন্ধুর ভূমি সংস্কারের পরও দেশের মোট চাষযোগ্য ভূমির বৃহদাংশ স্বল্প সংখ্যক লোকের (পরিবার বললে ভালো হয়) হাতে পুঞ্জিভূত রয়েছে। এই জনগোষ্ঠী আবার নিজেরা জমির সাথে সম্পর্কযুক্ত নয়। তারা শহুরে বা অন্য পেশায় জীবনধারণ করে। কৃষক বা ভূমিহীন বা বর্গাচাষীরা এদের জমি চাষ করে। দেশে ভূমিহীন মানুষের সংখ্যা কোটি কোটি। বাসস্থান নেই কোটি কোটি মানুষের। শহরের বস্তি এলাকার অধিবাসীরা প্রকৃতার্থেই ছিন্নমূল। ভূমি ব্যবস্থাপনার ত্রুটির জন্য সরকারের খাসজমি ব্যবস্থাপনায় রয়েছে চরম দুর্নীতি। প্রকৃত ভূমিহীনরা খাসজমি পায়না। জোতদাররাই নামে-বেনামে খাসজমি দখল করে থাকে। ভূমি ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত সরকারী কর্মচারীরাও দুর্নীতির মহাসমুদ্রে বাস করে। জমি রেজিস্ট্রি থেকে জরীপ; সর্বত্রই ঘুষ ছাড়া কিছুই হয় না। কিন্তু এর চাইতে ভয়ংকর বিষয় হচ্ছে ভূমি নিয়ে বিরোধ। দীর্ঘদিন ধরে কায়িকভাবে ভূমির রেকর্ডপত্র রক্ষা, রেজিস্ট্রেশন, নকশা প্রস্তুত ও জালিয়াতি ইত্যাদি করার ফলে ভূমি নিয়ে বিরোধ দিনে দিনে বাড়ছে।

সন্ত্রাস, খুন-খারাবি, ঝগড়া-বিবাদের বড় উৎস্যই হলো ভূমিসংক্রান্ত। দেশের সর্বাধিক সংখ্যক মামলা-মোকদ্দমাও ভূমি সংক্রান্ত। জালিয়াতি, প্রতারণা, জবরদখল ইত্যাদির সাথেও ভূমি ব্যবস্থাপনা জড়িত। সম্প্রতি ভূমিদস্যুতা নামের নতুন একটি অপরাধ যুক্ত হয়েছে। এক ধরনের লুটেরা ধনিক গোষ্ঠী অস্ত্রের শক্তিতে, টাকার জোরে, প্রতারণায়, চাপে ফেলে, সন্ত্রাস করে সাধারণ মানুষের জমি কেড়ে নিচ্ছে। বিগত খালেদা জিয়ার আমলে সাভারে সাবেক স্বরাষ্ট্রপ্রতিমন্ত্রী লুৎফুজ্জামান বাবরের আত্মীয়দের গ্রাম দখল নিয়ে ব্যাপক তোলপাড় হয়। এখনো ঢাকার আশেপাশে ডেভলপার, হাউজিং কোম্পানী এসবের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের অসংখ্য অভিযোগ উঠছে। সরকারের অনীহা, সরকারি ছত্রছায়া এবং ভুমি ব্যবস্থাপনায় দুর্নীতির জন্য প্রায় সকল ক্ষেত্রেই ভূমির প্রকৃত মালিকরা আইনের দ্বারস্থও হতে পারে না।

সম্প্রতি ভূমি ব্যবস্থাপনার রেজিস্ট্রেশন পদ্ধতি পরিবর্তন করা হলেও অন্য কোন ক্ষেত্রে অন্য কোন পরিবর্তন করা হয়নি। আমার জানামতে এমন কোন পরিকল্পনাও কারো নেই। সাধারণ মানুষ ভূমি নিয়ে এতোবেশি সমস্যাকবলিত হয় যে, সেখান থেকে পরিত্রাণ পাবার উপায়ও তার জানা নেই। ভূমিসংক্রান্ত মামলা বা বিরোধ বছরের পর বছর সম্প্রসারিত হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের শিক্ষক ও সাবেক চেয়ারম্যান ডঃ মিজানুর রহমান-এর মতে, দেশে ভূমি সংক্রান্ত একটি মামলার সাধারণ নিষ্পত্তি হতে ৮ বছর সময় লাগে। এইসব মামলার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হতে সময় লাগে ১৪ বছর। (সূত্র দৈনিক আজকের কাগজ ২৭ এপ্রিল ২০০৭) কোন কোন সময় প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে ভূমি সংক্রান্ত মামলা চলে। এতে বোঝা যায়, ভূমি এদেশের সাধারণ মানুষের জন্য কি ভয়ংকর সংকট তৈরী করে চলেছে। গত ৬ই জুন ০৯ অর্থমন্ত্রী আবুল মাল মুহিত ভূমি ব্যবস্থাকে সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত বলেছেন। ডিজিটাল পদ্ধতি ছাড়া এই অবস্থা থেকে পরিত্রানের উপায় নেই।

উত্তরাধিকারী আইন, ভূমি সংক্রান্ত অন্যান্য আইন কার্যত ব্রিটিশ বা পাকিস্তান আমলের। ডিজিটাল বাংলাদেশের একটি বড় লক্ষ্য হবে ভূমি সংস্কার এবং এর ব্যবস্থাপনার আমূল সংস্কার। প্রথমত এজন্য ভূমি সংক্রান্ত আইনগুলো বদলাতে হবে। এসব ক্ষেত্রে দ্রুত বিচারের ব্যবস্থা করতে হবে। বছরের পর বছর মামলা ঝুলিয়ে রাখা যাবেনা। প্রয়োজনে পৃথক আদালত করে ভূমি সংক্রান্ত মামলাগুলোর নিষ্পত্তি করতে হবে। দ্বিতীয়ত ভূমির তথ্যাদি বিদ্যমান এনালগ কাগুজে পদ্ধতি থেকে ডিজিটাল করতে হবে। ভূমি সংক্রান্ত সকল ধরনের নকশা ডিজিটাল করতে হবে। জমি রেজিস্ট্রি, হস্তান্তর, রেকর্ড, মামলা মোকদ্দমা, আইনী ব্যবস্থা ইত্যাদি সবকিছুই ডিজিটাল পদ্ধতিতে করতে হবে। স্যাটেলাইটের মাধ্যমে সংগৃহিত চিত্রকে ভিত্তি করে ডিজিটাল নকশা তৈরী করে এর সাথে জমির মালিকানা এবং অন্যান্য তথ্য ডিজিটাল পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করতে হবে। এইসব তথ্য সাধারণ মানুষ যাতে খুব সহজেই পেতে পারে

তার জন্য এগুলো ইন্টারনেটে পাবার ব্যবস্থা করতে হবে। মানুষ যেমন করে টেলিফোন বিল বাড়ীতে বসে জানতে পারে তেমনি এটিও জানতে পারবে যে, কোন জমিটি কার মালিকানায় আছে। মালিকানার বদল বা অন্য কোন রেকর্ডের পরিবর্তনও সঙ্গে সঙ্গে আপডেট করতে হবে। ফলে জালিয়াতি-প্রতারণা করার কোন সুযোগ থাকবেনা। ভূমি রেকর্ডের সাথে ডিজিটাল ভোটার তালিকা এবং ডিজিটাল জাতীয় পরিচয়পত্র প্রকল্পকে যুক্ত করা হলে তাৎক্ষণিকভাবে এটি জানা যাবে যে, কোন ব্যক্তির কোথায় জমি আছে এবং কোন সম্পদের মালিক কে। প্রতিটি মানুষেরই একটি সম্পদের বিবরণী থাকতে হবে। দেশের (প্রয়োজনে বিদেশেরও) যেখানেই তার যেসব সম্পদ থাকবে তার বিবরণ ঐ হিসাবে থাকবে । কেউ সেই সম্পদ বিক্রি করলে সেটি তার হিসাব থেকে বাদ যাবে। আবার কেউ কোন সম্পদ কিনলে তার হিসাবে সেই সম্পদ যোগ হবে। এই পদ্ধতিতে ব্যাঙ্ক হিসাব থেকে শুরু করে আয়কর পর্যন্ত সবকিছুই একটি বোতামের নিচে নিয়ে আসা যাবে।

বর্তমানে নিয়ন্ত্রণহীন অপরিকল্পিকভাবে পুরো দেশের ভূমি ব্যবহার করা হচ্ছে। যার যেখানে যা খুশী তাই করছে। জলাশয় ভরাট করা হচ্ছে, কেটে ফেলা হচ্ছে পাহাড়। ফলে পরিবেশে বিপর্যয় ঘটছে। এভাবে চলতে থাকলে আগামী ২০২১ সালে বাংলাদেশের মানুষের বাসস্থান এবং ফসলি জমি-কোনটাই পাওয়া যাবেনা। সেজন্য বাংলাদেশের ভূমি ব্যবহার পরিকল্পিত করার জন্য নিয়ন্ত্রণ করে প্রতিটি নাগরিকের বাসস্থান এবং ফসলি জমি রক্ষা; দুটিই করতে হবে। রাষ্ট্র ধনী-গরীব নির্বিশেষে প্রতিটি নাগরিককে ন্যূনতম মূল্যে তার পরিবারের জন্য ন্যূনতম বাসস্থান প্রদান করবে। যার বাসস্থান একসাথে বা কিস্তিতে কেনার সামর্থ নেই রাষ্ট্র তাকে ন্যুনতম বাসস্থান প্রদান করবে। এই ন্যূনতম ব্যবস্থার বাইরে নাগরিকেরা নিজস্ব অর্থে বড় আকারের বা নির্ধারিত উন্নত স্থানে বাসস্থান কিনতে পারবে। দেশের সকল জমি বাসস্থান, ফসলি জমি, খাল-বিল, জলাশয়, শিল্পাঞ্চল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল, মসজিদ-মন্দির, ঈদগা, পার্ক বা খেলার জায়গা ইত্যাদিতে চিহ্নিত থাকবে। বর্তমানের ছনের-টিনের-সেমিপাকা-পাকা ঘরবাড়ীর বদলে হাইরাইজ সমবায়ভিত্তিক উচু দালান নির্মাণ করে বাসস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে। এইসব বাসস্থানের জন্য পানি-পয় নিষ্কাষণ, বিদ্যুৎ, বিনোদন, টেলি যোগাযোগ ইত্যাদি নিশ্চিত করা হবে। ফসলি জমির সর্বোচ্চ সিলিং হওয়া উচিত পাচ একর বা ৫০০ শতাংশ। ফসলি জমি কেবল কৃষকের কাছেই থাকা উচিত। বাসস্থানের জন্য রাজধানী শহরে ব্যক্তিগতভাবে তিরিশ শতাংশের বেশি, জেলা শহরে ৫০ শতাংশের বেশি, উপজেলা বা থানা সদরে ১০০ শতাংশের বেশি জমির মালিক থাকা উচিৎ নয়। সকল খাস জমি কেবলমাত্র ভূমিহীনদেরকে প্রদান করা হবে। রাষ্ট্র উদ্বৃত্ত জমি বাজার দরে কিনে ভূমিহীনদের প্রদান করবে। ভূমিহীনরা এই জমি ব্যবহার করতে পারবে-কিন্তু কোনভাবেই বিক্রি করে স্বত্ত্ব হস্তান্তর করতে পারবে না। স্বত্ত্ব হস্তান্তর করতে হলে তাকে জমির মূল্য রাষ্ট্রকে পরিশোধ করতে হবে। অন্যথায় সরকারের বরাদ্দ বাতিল হয়ে যাবে এবং সেই ভূমিটি সরকার পুনরায় কোন ভূমিহীনকে বরাদ্দ দিতে পারবে। ভূমি সংক্রান্ত এসব বিষয় একটি ডাটাবেজে সংরক্ষিত থাকতে হবে। ভূমিরেকর্ড ব্যবস্থা জিআইএস প্রযুক্তিনির্ভর ডাটাবেজভিত্তিক হতে হবে। জমির নকশা থেকে শুরু করে দেশের প্রতি ইঞ্চি ভূমির ডিজিটাল নকশা থাকতে হবে। জমির বেচা-কেনা, উত্তরাধিকার, বণ্টন, দান ইত্যাদি এবং সকল ধরনের হস্তান্তরের রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণভাবে কম্পিউটারে করতে হবে। জমি সংক্রান্ত সকল তথ্য কম্পিউটারে সংরক্ষণ করতে হবে। সরকারের ভূমি মন্ত্রণালয়ের হিসাব অনুসারে মাত্র পাচ বছরে এক হাজার কোটি টাকায় এই কাজটি সম্পন্ন করা সম্ভব। (ডিএলআর কর্তৃক আয়োজিত ২৮ জুন ২০০৮ তারিখের সভায় প্রদত্ত তথ্য) এতে আর যাই হোক, টিআইবির রিপোর্টে সবচেয়ে বেশী দুর্নীতিবাজ খাত হিসেবে এই খাতটিকে সনাক্ত করা সম্ভব হবে না।

সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবনা: ক) বাংলাদেশের প্রতিটি নাগরিকের জন্য বাসস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে। রক্ষা করতে হবে ফসলি জমি ও পরিবেশ। বর্তমানের নিয়ন্ত্রণহীন অপরিকল্পিতভাবে ভূমি ব্যবহার পরিকল্পিতভাবে নিয়ন্ত্রণ করে প্রতিটি নাগরিকের বাসস্থান এবং ফসলি জমি রক্ষা; দুটিই করতে হবে। রাষ্ট্র ধনী-গরীব নির্বিশেষে প্রতিটি নাগরিককে ন্যূনতম মূল্যে তার নিজের ও পরিবারের জন্য ন্যূনতম বাসস্থান প্রদান করবে। যার বাসস্থান একসাথে বা কিস্তিতে কেনার সামর্থ নেই রাষ্ট্র তাকে ন্যুনতম বাসস্থান বিনামূল্যে প্রদান করবে। এই ন্যূনতম ব্যবস্থার বাইরে নাগরিকেরা নিজস্ব অর্থে বড় আকারের বা নির্ধারিত উন্নত স্থানে বাসস্থান কিনতে পারবেন।

খ) দেশের সকল জমি; বাসস্থান, ফসলি জমি, খাল-বিল-নদী, জলাশয়, শিল্পাঞ্চল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল, মসজিদ-মন্দির, ঈদগা, বনাঞ্চল, প্রত্নতত্ত্ব এলাকা, অভয়ারণ্য, মৎস্য প্রজনন কেন্দ্র, পার্ক বা খেলার জায়গা ইত্যাদিতে সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত থাকবে। এসব নির্দিষ্ট স্থানের জমি কেবলমাত্র নির্দিষ্ট কাজেই ব্যবহার করা যাবে।

গ) বর্তমানের ছনের-টিনের-সেমিপাকা-পাকা ঘরবাড়ীর বদলে কম্যুনিটিভিত্তিক বহুতল উচু দালান নির্মাণ করে বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হবে। এইসব বাসস্থানের জন্য পানি-পয় নিষ্কাষণ, বিদ্যুৎ, বিনোদন, টেলি যোগাযোগ ইত্যাদি নিশ্চিত করা হবে। পরিবারপ্রতি ফসলি জমির সর্বোচ্চ সিলিং হবে ৫ একর বা পাচশো শতাংশ। বাসস্থানের

জন্য রাজধানী শহরে ব্যক্তিগতভাবে তিরিশ শতাংশের বেশি, জেলা শহরে ৫০ শতাংশের বেশি, উপজেলা বা থানা সদরে ১০০ শতাংশের বেশি জমির মালিক থাকা যাবেনা। সকল খাস জমি কেবলমাত্র ভূমিহীনদেরকে প্রদান করা হবে। রাষ্ট্র উদ্বৃত্ত জমি বাজার দরে কিনে ভূমিহীনদের প্রদান করবে। ভূমিহীনরা এই জমি ব্যবহার করতে পারবে- কিন্তু কোনভাবেই বিক্রি করে স্বত্ত হস্তান্তর করতে পারবে না। তেমন অবস্থায় সরকারের বরাদ্দ বাতিল হয়ে যাবে এবং সেই ভূমিটি সরকার পুনরায় কোন ভূমিহীনকে বরাদ্দ দেবে।

ঘ) ভূমি ব্যবস্থা জিআইএস প্রযুক্তিনির্ভর ডাটাবেজভিত্তিক হবে। জমির রেজিস্ট্রি ও নকশা থেকে শুরু করে দেশের প্রতি ইঞ্চি ভূমির ডিজিটাল নকশা থাকবে। জমির বেচা-কেনা, উত্তরাধিকার, বন্টন, দান ইত্যাদি এবং সকল ধরনের হস্তান্তরের রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণভাবে কম্পিউটারে করা হবে। জমি সংক্রান্তও সকল তথ্য কম্পিউটারে সংরক্ষণ করা হবে এবং জনগণের জন্য উন্মুক্ত রাখা হবে।

খ. ডিজিটাল স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা ব্যবস্থা: একদিন আমার পনেরো বছর বয়েসী ছেলে জানানো যে তার জ্বর জ্বর লাগছে। ওর শরীরে হাত দিয়ে তাপমাত্রা পাওয়া গেলো। সাথে কাশি। ভাবলাম রিস্ক নেবো কেন? পরীক্ষা সামনে। আগেই চিকিৎসা করানো ভালো। ধানমন্ডির লেকের পারের বাসার দুই বাড়ী পরেই একটি প্রাইভেট ডায়াগনোস্টিস সেন্টার। সেখানকার পাচতলায় মেডিসিনের ডাক্তার ফজলুল কাদেরের সাথে দেখা করা গেলো তিন ঘন্টা বসে থাকার পর। ছয়শো টাকা ফিস নিয়ে তিনি ধানমন্ডির একটি হাসপাতালে ভর্তি হবার জন্য ঐ হাসপাতালটির কার্ড হাতে তুলে দিলেন। ওদেরকে ফোন করে জানলাম দৈনিক সাড়ে চার হাজার টাকা কেবিন ভাড়া। তিনি কিছু টেস্ট করতে দিলেন - খরচ পড়লো ১৯৩০ টাকা। হিসেব কষে দেখলাম সর্দি-জ্বর থেকে ছেলেকে বাচাতে ২৫ হাজার টাকার দরকার। কেউ কি আমাকে জানাতে পারেন, বাংলাদেশের শতকরা কতো ভাগ লোক এই অঙ্কের অর্থ দিয়ে চিকিৎসা নিতে পারেন? এই ঘটনার এক সপ্তাহের মাঝেই স্ত্রীর পেটে ব্যথা দেখা দিলো। আবারও ধানমন্ডির একটি ডায়াগনোস্টিক সেন্টারে যাওয়া হলো। সার্জন সাহেবের ফিস ৬০০ টাকা। টেস্ট দেয়া হলো। ২৯৩০ টাকার টেস্ট। রিপোর্ট দেখাতে ২০০ টাকা। এবারও ডাক্তারের উপদেশ হাসপাতালে ভর্তির। ক্যাবিনের দাম সাড়ে চার হাজার। অপারেশন, এনেসথেসিয়া, ঔষধ-পথ্য, টেস্ট ইত্যাদি মিলিয়ে ৫ দিনে ৫০ হাজার। এপেনডিক্স অপারেশনের পর সার্জন জানালেন পেট ব্যথার কারণটা আসলে এপেনডিক্স নয়। তবে সেটি ফেলে দেয়াতে তো ক্ষতি নেই। বলা যাবে এভাবে জীবন বাচিয়ে রাখতে পারে কতো জন? এক সময়ে এদেশে সরকারী হাসপাতাল আর সরকারী-বেসরকারী ডাক্তার ছিলো। শিক্ষার মতোই চিকিৎসা বা স্বাস্থ্য সেবার বস্তুত কোন বিকল্প ছিলো না। এক সময়ে প্রাইভেট স্বাস্থ্য ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে সেই ব্যবস্থাটি এখন সবচেয়ে বড় রমরমা বাণিজ্য। কিন্তু স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের চিকিৎসা ব্যবস্থা এমন হবার কথা ছিলো না। কথা ছিলো রাষ্ট্র দেশের নাগরিকদের জন্য ন্যূনতম স্বাস্থ্য সেবা দেবে ও ন্যূনতম চিকিৎসা ব্যবস্থা গড়ে তুরবে। কিন্তু সেটি হয়নি। বাংলাদেশের মানুষের স্বাস্থ্যব্যবস্থা কার্যত ভাগ্যের উপর নির্ভরশীল। সারা দুনিয়ায় একটি আধুনিক রাষ্ট্র তার নাগরিকদের জন্য যেসব ন্যূনতম বিষয় নিশ্চিত করে তার একটি হলো স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা। বাংলাদেশের প্রায় সকলেই (কিছুসংখ্যক ভাগ্যবান ছাড়া) ঔষধ পায়না, ডাক্তার পায়না বা হাসপাতালের টিকিও দেখেনা। সরকারি স্বাস্থ্যসেবা অপ্রতুল ও দুর্নীতিতে ভরা। সরকার স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের দায়িত্বও পালন করেনা। সরকারি হাসপাতালে মানুষ মরতে যায় বা মরার সার্টিফিকেট পেতে যায়। শহরে কিছু বেসরকারি স্বাস্থ্য সেবা উচ্চমূল্যে পাওয়া যায়। ফলে গ্রামে বসবাসকারী এবং গরীব মানুষের কাছে চিকিৎসা নামক কিছু পৌছায় না। স্বাধীনতার আগে ও অব্যবহিত পরে সরকারি হাসপাতালগুলোই মানুষের একমাত্র ভরসা ছিলো। সেখানে যাই থকুক সেই চিকিৎসাই মানুষকে নিতে হতো। স্বৈরশাসক এরশাদ বেসরকারী হাসপাতাল বা ক্লিনিকের ধারণা বাস্তবায়ন করেন। ফলে দেশে টাকা দিয়ে স্বাস্থ্য সেবা পাবার একটি ব্যবস্থা হয়। কিন্তু দেশের শতকরা ৯৫ জন মানুষ এসব বেসরকারী হাসপাতালের সেবা গ্রহণ করার আর্থিক সামর্থ রাখেনা। বরং এইসব ফাইভ স্টার হাসপাতালের কাছে দিয়ে হেটে যাবার সামর্থ্যও সাধারণ মানুষের নেই। ওখানে দেশীয় ধনিকশ্রেণী চিকিৎসা নেয়। এর বাইরেও বিদেশে চিকিৎসা নেবার জন্য রাজনৈতিক গোষ্ঠী ও ধনিক গোষ্ঠী রয়েছে। এদের আরো বেশী টাকা রয়েছে। তারা ভারত, থাইল্যান্ড, সিঙ্গাপুর বা আমেরিকা ও সৌদী আরবে নিজেদের চিকিৎসা করান। আমরা লক্ষ্য করেছি যে, এরই মাঝে সরকার উপজেলায়, ইউনিয়নে স্বাস্থ্য কেন্দ্র গড়ে তুলেছে। অন্তত দালানকোঠাতো আছে। তবে তাতে ডাক্তার, ঔষধ, নার্স বা চিকিৎসা নামক কিছু পাওয়া যায়না। দেশের মানুষ কার্যত বিণা চিকিৎসায়, প্রাকৃতিক উপায়ে বা কুসংস্কারের মাঝে বেচে থাকে। এখনও কবজ-তাবিজ, ওঝা, বৈদ্য, হোমওপ্যাথি, কবিরাজি; এসব দিয়েই সাধারণ মানুষের জীবন চলে। তিনযুগ পার করে একটি রাষ্ট্র স্বাস্থ্য সেবায় এমন দেওলিয়াত্ব প্রকাশ করতে পারেনা। বরং রাষ্ট্রকে এটি অনুধাবন করতে হবে যে প্রতিটি নাগরিককে বেচে থাকার মতো চিকিৎসা প্রদান করা তার দায়িত্ব।

এজন্য বিদ্যমান ব্যবস্থাটির আমূল পরিবর্তন করতে হবে। স্বাস্থ্য সেবা সকলের জন্য সমান এবং সকল নাগরিকের জন্য চিকিৎসা পাবার ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। প্রতি পাচ হাজার মানুষের জন্য একজন করে নিবন্ধিত ডাক্তার ও ফার্মেসী থাকার পাশাপাশি প্রতি বিশ হাজার লোকের জন্য একটি করে ৫০ শয্যার পূর্নাঙ্গ হাসপাতালের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

গ্রামের মানুষের জন্য বিশেষজ্ঞ চিকিৎসা পৌছানোর জন্য টেলিমেডিসিন পদ্ধতির সহায়তা নেয়া যেতে পারে। রাষ্ট্রের পুরো চিকিৎসা ব্যবস্থা ডিজিটাল করতে হবে। এটি সরকারের কেন্দ্রিয় ডাটাবেজের অংশ হিসেবে কাজ করলেও দেশের সকল স্বাস্থ্য সেবা একটি নেটওয়ার্কের আওতায় থাকতে পারে। স্বাস্থ্যখাতের বিপুল তথ্যাবলী, প্রাথমিক চিকিৎসা বা স্বাস্থ্য সচেতনতা ডিজিটাল পদ্ধতিতে মানুষের হাতের নাগালের মাঝে দিতে হবে। প্রতিটি নাগরিকের স্বাস্থ্য সম্পর্কিত ডাটাবেজ আকারে সংরক্ষিত থাকবে। প্রাথমিক চিকিৎসাসহ মানুষের প্রয়োজনীয় আপতকালীন চিকিৎসার তথ্য অনলাইনে থাকবে। জীবনরক্ষাকারী ঔষধের স্বল্পমূল্য, সহজলভ্যতা ও দেশে উৎপাদনের ব্যবস্থা করাসহ অপ্রয়োজনীয় ঔষধের উৎপাদন ও আমদানী নিষিদ্ধ করাসহ একটি জাতীয় ঔষধ ও স্বাস্থ্য নীতিমালা প্রস্তুত এবং প্রয়োগ করতে হবে।

সংক্ষেপে আমরা এই প্রস্তাবনাগুলো পেশ করতে পারি যে স্বাস্থ্য সেবা সকলের জন্য সমান এবং সকল নাগরিকের জন্য চিকিৎসা পাবার ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। প্রতি পাঁচ হাজার মানুষের জন্য কমপক্ষে একজন করে নিবন্ধিত ডাক্তার, নার্স, ধাত্রী ও কমপক্ষে একটি ঔষধালয় থাকার পাশাপাশি প্রতি বিশ হাজার লোকের জন্য কমপক্ষে একটি করে ৫০ শয্যার হাসপাতালের ব্যবস্থা করতে হবে। গ্রামের মানুষের জন্য বিশেষজ্ঞ চিকিৎসা পৌছানোর জন্য টেলিমেডিসিন পদ্ধতির সহায়তা নিতে হবে। রাষ্ট্রের পুরো চিকিৎসা ব্যবস্থা ডিজিটাল করতে হবে। এটি সরকারের কেন্দ্রীয় ডাটাবেজের অংশ হিসেবে কাজ করলেও দেশের সকল স্বাস্থ্য সেবা একটি নেটওয়ার্কের আওতায় থাকবে। স্বাস্থ্যখাতের বিপুল তথ্যাবলী, প্রাথমিক চিকিৎসা বা স্বাস্থ্য সচেতনতা ডিজিটাল পদ্ধতিতে মানুষের হাতের নাগালের মাঝে দিতে হবে। প্রতিটি নাগরিকের স্বাস্থ্য সম্পর্কিত তথ্য ডাটাবেজ আকারে সংরক্ষিত থাকবে।

গ. ডিজিটাল নিরাপত্তা: যে কোন স্বাধীন রাষ্ট্রের প্রধানতম দায়িত্ব হলো জনগণকে এবং রাষ্ট্রকে নিরাপত্তা রাখা। সেনাবাহিনী রাষ্ট্রকে বাইরের শত্রুর হাত থেকে নিরাপদ রাখে। বিডিআর সীমান্ত রক্ষা করে। র‌্যাব, পুলিশ ও আনসার জনগণের নাগরিক জীবনের নিরাপত্তা বিধান করে।

বর্তমানে বিদ্যমান ও প্রচলিত পদ্ধতির এসব নিরাপত্তা বিধানের জন্য সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জটি হলো যুদ্ধ ও অপরাধের চরিত্র বদলে যাওয়া। কামান-বন্দুক রাইফেলের যুদ্ধ শেষ না হলেও দুনিয়াতে এক রাষ্ট্র কর্তৃক অন্য রাষ্ট্রের জন্য ক্ষতিকর কাজ করার পথ ও পদ্ধতি পাল্টে গেছে। আগ্রাসনের হাতিয়ার হচ্ছে ডিজিটাল প্রযুক্তি। যুদ্ধকে সাইবার যুদ্ধ বলা হচ্ছে। ফলে দেশরক্ষাবাহিনীকে সাইবার যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করতে হচ্ছে। পরমানু বোমা থেকে সাধারণ মারনাস্ত্র পর্যন্ত মাইক্রোপ্রসেসর ও সফটওয়্যার নির্ভর হয়ে যাচ্ছে। যুদ্ধ ব্যবস্থাপনা-কৌশল নির্ধারণ-উপাত্ত সংগ্রহ সম্পূর্ণভাবেই ডিজিটাল প্রযুক্তি নির্ভর। কিন্তু আমরা কি সেই যুগে পা দিতে পেরেছি? অন্যদিকে নাগরিক জীবনে অপরাধের ধরন পাল্টেছে। মোবাইল ফোনে চাঁদাবাজি কল দিয়ে বিরক্ত করা, ক্রেডিট কার্ডে জালিয়াতি, ডিজিটাল পদ্ধতিতে তথ্য বিনষ্ট করা, ইন্টারনেটে প্রতারনা করা, ডিজিটাল পর্নোগ্রাফি, ইন্টারনেট বা অন্যান্য নেটওয়ার্কে অপপ্রচার, এটিএম কার্ড দিয়ে জারিয়াতি ইত্যাদি হাজার হাজার ডিজিটাল ক্রাইম মোকাবেলা করার জন্য র‌্যাব, পুলিশ বা আনসারের মতো বাহিনীগুলোর প্রস্তুতি দরকার।

কিন্তু বিডিআরের তো নিজেরই বাহিনীর ডাটাবেজ নেই। পুলিশ জানে না অপরাধীর পরিচয়। তাদের দক্ষতা প্রাগৈতিহাসিক। আমাদের এসব বাহিনীর লোকেরা যখন জাতিসংঘে কাজ করতে যায়, তখন বোঝা যায় তাদের দক্ষতা আন্তর্জঅতিক মানে কতো নীচে। ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের জন্য শক্তিশালী সামরিক-আধা সামরিক বাহিনী গড়ে তুলতে হবে। এসব বাহিনীকে কেবল আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত করা হবেনা তাদের হাতে দিতে হবে একুশ শতকের সর্বাধুনিক তথ্যপ্রযুক্তি। তিন বাহিনীর ডিজিটাল সজ্জিতকরণ ব্যবস্থা সম্পন্ন করার পাশাপাশি বিডিআর, পুলিশ, র‌্যাব, আনসারসহ সকল বাহিনীকে তথ্যপ্রযুক্তিসমৃদ্ধ করতে হবে। এই দেশের সীমারেখা, জনসম্পদও ধনসম্পদসহ সকল কিছুর পূর্ণ নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। প্রতিটি নাগরিক তার নিজের দেশে স্বাধীনতার সাথে নিরাপদ জীবন যাপন করতে চায়। কিন্তু বাংলাদেশে এখন প্রায় সকল মানুষই নিরাপদ নয়। সেজন্য সে আত্মবিশ্বাসীও নয়। রাষ্ট্রের দায়িত্ব হবে প্রতিটি নাগরিকের জন্য নিরাপত্তা বিধান করা। রাষ্ট্রের কোন নাগরিক কোন ধরনের সন্ত্রাস, হুমকি, চাদাবাজী, এসিড নিক্ষেপ, নির্যাতন বা রাজনৈতিক নিপীড়নের শিকার হবেনা। রাষ্ট্রের সকলক্ষেত্রে প্রয়োজনে বায়োমেট্রিকস নিরাপত্তা বিধান করতে হবে এবং অপরাধীদের বিরুদ্ধে কার্যকর শাস্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। একই সাথে রাষ্ট্র ব্যক্তির প্রাইভেসি বজায় রাখার নিশ্চয়তা দেবে।

আমাদের প্রস্তাবনা হলো, সামরিক বাহিনী, আধা সামরিক ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে তথ্যপ্রযুক্তিসহ সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ও অস্ত্র দিয়ে সজ্জিত করতে হবে। এই দেশের সীমারেখা, ধনসম্পদসহ সকল কিছুর পূর্ণ নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। রাষ্ট্রের দায়িত্ব হবে প্রতিটি নাগরিকের জন্য নিরাপত্তা বিধান করা। রাষ্ট্রের কোন নাগরিক কোন ধরনের সন্ত্রাস, হুমকি, চাঁদাবাজী, এসিড নিক্ষেপ, নির্যাতন বা রাজনৈতিক নিপীড়নের শিকার হবেনা। রাষ্ট্রের সকলক্ষেত্রে প্রয়োজনে বায়োমেট্রিক্স নিরাপত্তা বিধান করবে এবং অপরাধীদের বিরুদ্ধে কার্যকর শাস্তির ব্যবস্থা করবে। একই সাথে রাষ্ট্র ব্যক্তির প্রাইভেসি বজায় রাখার নিশ্চয়তা দেবে।

ঘ. অপরাধ, আইন ও বিচারঃ বলা হয়ে থাকে আইন হলো সভ্যতার রক্ষাকবচ। মানুষের সভ্যতার বিবর্তনের সাথে সাথে তাই আইনও বদলায়। কৃষি যুগের আইন শিল্পযুগে বদলেছে। সেই কারনেই শিল্প যুগের আইন তথ্য যুগে টিকবেনা। আমরা যদি বর্তমান অবস্থার দিকেই তাকাই তবে ডিজিটাল যুগের পরিবর্তনের সাথে খাপ খাওয়ানো সম্ভব নয় এমন অনেক আইন খোজে পাবো।

সাইবার ক্রাইম ছাড়াও ব্যক্তিগত পারিবারিক ও সামাজিক সম্পর্কের পরিবর্তনের পাশাপাশি উৎপাদন ব্যবস্থার পরিবর্তনের কথা আমাদেরকে ভাবতে হবে। দিনে দিনে বেড়ে ওঠা একটি নতুন অর্থনীতির সাথে তাল মিলিয়ে আইনী ব্যবস্থা গ্রহন করাও জরুরী।

সাম্প্রতিককালের একটি দৃষ্টান্ত আমি তুলে ধরতে পারি। আমার ভাতিজা মহিউদ্দিন জালালের এক বন্ধু যার নাম হাবিবুর রহমান আমাকে একদিন ফোন করে দেখা করতে এলো। তার বক্তব্যটি এমন, যে একজন লোককে সঙ্গে নিয়ে তার মালিকানাধীন একটি সফটওয়্যার কোম্পানী থেকে একটি ওয়েব পোর্টাল তৈরী করেছিলো। তারই এক কর্মচারী ওয়েব পোর্টালের সকল সোর্স কোর্ড চুরি করে নিয়ে যায়। সে মুহম্মদ থানায় ঐ কর্মচারীর বিরুদ্ধে মামলা করতে গেলে পুলিশ ফৌজদারী দন্ডবিধির কোন ধারায় মামলা নেবে তা খোজে পায়নি।

একটি মেয়ে তার সেল ফোনে প্রতিদিন বিরক্ত, উত্যক্ত ও কুপ্রস্তাব দেবার জন্য কি মামলা করতে পারে? ডিজিটাল বাংলাদেশের সাথে সমন্বয় করে দেশের প্রচলিত আইনসমূহ পরিবর্তন করতে হবে এবং নতুন আইনসমূহ জ্ঞানভিত্তিক সমাজের কথা চিন্তা করেই প্রণীত হবে। পরিবর্তিত অবস্থার প্রেক্ষিতে সৃষ্ট নতুন ধরনের অপরাধ, সাইবার অপরাধ, সাইবার কম্যুনিকেশন, নিউ মিডিয়া, মেধাসম্পদ ইত্যাদি সকল বিষয়কে পর্যালোচনা করে অপরাধ সংক্রান্ত ফৌজদারী কার্যবিধিসহ অন্যান্য আইন পরিবর্তন করতে হবে। অপরাধ দমন ও নিয়ন্ত্রণ করার জন্য নতুন পদ্ধতি প্রয়োগ করতে হবে। প্রয়োজনমতো বায়োমেট্রিক্স জিন পরীক্ষা, অপরাধীর অবস্থান নির্ণয়ের জন্য গ্লোবাল পরিজশনিং সিস্টেম, অপরাধীর ডাটাবেজ তৈরী করা ছাড়াও বিচার ব্যবস্থাকে ডিজিটাল করতে হবে। আইনসমূহ অনলাইনে পাবার পাশাপাশি, ডিএলআর অনলাইনে প্রাপ্য হতে হবে। বিচারপ্রার্থী অনলাইনে বিচার প্রার্থনা করার পাশাপাশি তার মামলা কোথায় কি অবস্থায় আছে তা অনলাইনে জানতে পারার ব্যবস্থা করতে হবে। আইনজীবি অনলাইনে তার বক্তব্য পেশ করতে পারবেন এবং প্রয়োজনে ভিডিও কনফারেন্সের সহায়তায় বাদী-বিদাবীর বক্তব্য বা সাক্ষ্য গ্রহণ করা যাবে।

ঙ. গণবাহন ও যোগাযোগঃ দেশের গণবাহন বা পাবলিক ট্রান্সপোর্ট ব্যবস্থাকে দ্রুতগতির, আরামদায়ক, নিরাপদ এবং স্বল্পব্যয়ী করতে হবে। ঢাকা-চট্টগ্রাম, ঢাকা-সিলেট, ঢাকা-দিনাজপুর, ঢাকা-রাজশাহী, ঢাকা-খুলনা, ঢাকা-ময়মনসিংহ-মোহনগঞ্জ, চট্টগ্রাম-সিলেট, খুলনা-রাজশাহী-দিনাজপুর ইত্যাদি জাতীয় রুটে দ্রুতগামী ট্রেন সার্ভিস চালু করার পাশাপাশি ঢাকা-চট্টগ্রাম রেললাইনকে টেকনাফ পর্যন্ত সম্প্রসারিত করতে হবে। চট্টগ্রাম-ঢাকা-কলিকাতা রেলপথের পাশাপাশি ঢাকা-আগরতলা ও চট্টগ্রাম-আগরতলা রেল যোগাযোগ স্থাপিত হতে হবে। ঢাকা, চট্টগ্রামসহ অন্যান্য মহানগরীতে পরিকল্পিত নগর রেল, চক্রাকারে রেল, উপশহর রেল, আকাশ রেল বা পাতাল রেল স্থাপন করতে হবে। ঢাকাসহ বড় বড় মহানগরীতে ক্রসরোড, লেবেল ক্রসিং-এ ফ্লাইওভার-সুড়ঙ্গ পথ নির্মাণ করতে হবে। সিগনেলিংসহ যোগাযোগ ব্যবস্থাকে কম্পিউটার নিয়ন্ত্রিত করতে হবে এবং পরিবহন খাতের সকল ধরনের চাঁদাবাজি, অবৈধ টোল, ঘুষ-দুর্নীতি কঠোরভাবে দমন করতে হবে। সারাদেশে জাতীয় সড়ক ব্যবস্থাকে প্রশস্ত, আধুনিক ও নিরাপদ করার পাশাপাশি স্থানীয় পর্যায়ের, আঞ্চলিক মহসড়ক নেটওয়ার্ককে ব্যাপকভাবে সম্প্রসারিত করতে হবে। ঢাকা, চট্টগ্রাম ও দেশের প্রধান প্রধান শহরগুলোর সাথে কলিকাতা ও আগরতলা ছাড়াও ইয়াঙ্গুন, ভিয়েনশিয়েন, নমপেন, ব্যাঙ্কক, কুয়ালালামপুর, সিঙ্গাপুর, দিল্লী, করাচী, কাবুলসহ আঞ্চলিক রুটগুলোতে আঞ্চলিক বাস সার্ভিস চালু করা যেতে পারে। বাংলাদেশকে এশিয়ান হাইওয়েতে যোগ দিতে হবে। যেসব এলাকায় স্থায়ী সড়ক নির্মাণ করা যাবেনা সেইসব জায়গায় ডুবোসড়ক নির্মাণ করতে হবে। নদীমাতৃক বাংলাদেশের নৌপথকে কেবল নাব্য করা হবেনা এতে আরামদায়ক নৌযান চালু করাসহ স্পীডবোট, সীট্রাক ও হোভার ক্রাফটসহ দ্রুতগামীর যানবাহন চালু করতে হবে। বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক আকাশচলাচল সুসংহত, উন্নত ও আধুনিক করতে

হবে। এমন ব্যবস্থা করতে হবে যাতে সকল গণবাহনের তথ্য, বুকিং, সময়সূচী, চলাচল, অবস্থান ইন্টারনেটে পাওয়া যায়।

দ্বিতীয় অগ্রাধিকার ॥ ডিজিটাল শিক্ষাব্যবস্থা

আওয়ামী লীগ সরকার শিক্ষাকে গুরুত্ব দিয়েই তাদের দ্বিতীয় মেয়াদ শুরু করে। পাঠ্যবই-এর সংকট এবং মন্ত্রী মহোদয়ের বাংলা বাজার দৌড়ঝাপ দিয়ে যাত্রা শুরু করার পর সরকার এখন নতুন শিক্ষা কমিটি গঠন করেছে। কমিটির একটি সভাও হয়েছে এই কমিশনে আমাদের জানা মতো বিশিষ্ট শিক্ষাবিদদেরকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। নামী দামী এইসব শিক্ষাবিদদের ওপর জাতির অনেকে আস্থা। কামনা করি, তারা জাতির সেই প্রত্যাশা পূরণ করবেন। অতীতেও এমন কমিশন গঠন করা হয়েছে। অতীতের কমিশনগুলো যথারীতি তাদের প্রতিবেদন দাখিল করেছে এবং সরকার সেইসব প্রতিবেদন গ্রহণ করেছে। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে যে, কোন সরকারই এখন পর্যন্ত শিক্ষার সংকট থেকে জাতিকে উদ্ধার করতে পারেনি। এই না পারাটা যে কি ভয়ংকর পরিণতি ডেকে এনেছে, আমি জানিনা সেটি কোন মহল অনুভব করেছেন কিনা। আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ প্রফেসর আনিসুজ্জামান বলেন, "বাংলাদেশের শিক্ষার দিকে তাকালে যে দুটি সত্য আমাদের চোখে প্রথমে ধরা পড়ে। তা এই যে, শিক্ষা সকল মানুষের কাছে পৌছায়নি এবং দ্বিতীয়ত যাদের কাছে পৌঁছেছে তারা একই ধরনের শিক্ষা লাভ করছে না।" শিক্ষার সমস্যা সম্পর্কে তার চূড়ান্ত মন্তব্য হলো, "আমরা বাইরে নানারকম প্রসাধন করে রেখেছি এই শিক্ষাব্যবস্থার। এই প্রসাধনের অন্তরালে গভীর ক্ষত রয়েছে। আমরা একটু খুঁটিয়ে দেখলে সে ক্ষত দেখতে পাব। সে ক্ষত কিভাবে নিরাময় হবে, আপনারা সবাই মিলে তা ভাববেন।" (যুগান্তর ২৪ মার্চ ২০০৭)

আমি আমার শ্রদ্ধেয় স্যারের সাথে একটু যোগ করতে চাই। কার্যত বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা কেবল প্রসাধন মাখানোই নয়, এটি দূরারোগ্য ক্যান্সার আক্রান্তও। এর সর্বাঙ্গে দগদগে ঘা। একে বিদ্যমান পদ্ধতিতে কোনভাবেই সারানো যাবেনা। এটি কেবল যে সকলের কাছে পৌছাতে ব্যর্থ হয়েছে তাই নয়-এটি এখন বেকার তৈরী করা ছাড়া আর কোন উদ্দেশ্য সাধন করেনা। ফলে শিক্ষার সামগ্রিক সংস্কার করতে হবে। বাস্তবতা হলো, দুই বছর মেয়াদী ফখরুদ্দিনের তত্ত্বাবধায়ক সরকার আর যে খাতেই যাই করুক না কেন শিক্ষা খাতে কোন পরিবর্তন করার কোন উদ্যোগই নেয়নি। তারা বিদায়ের শেষ প্রান্তে একটি টাস্কফোর্স গঠন করে কোনমতে একটি প্রতিবেদন তৈর করেছিলো-কিন্তু সেটি বাস্তবায়ন করা হয়ে ওঠেনি। নতুন সরকার সেটিকে পাশ কাটিয়ে নতুন শিক্ষা কমিটি গঠন করেছে। এটি আমাদের সাংবিধানিক অধিকার যে, রাষ্ট্র দেশের প্রতিটি নাগরিকের জন্য সমমানের উপযুক্ত শিক্ষা নিশ্চিত করবে। কিন্তু স্বাধীনতার আটত্রিশ বছর পরও আমরা সেই অধিকার পাইনি। বরং শিক্ষাব্যবস্থার নামে একটি জগাখিচুড়ি বিরাজ করছে সর্বত্র। আমরা সবাই জানি, উনিশ শতকে সারা দুনিয়ায় শিল্পযুগের যে শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলিত হয় তারই আলোকে বাংলাদেশে এখনো ইংরেজ প্রচলিত সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি মাদ্রাসা শিক্ষা নামক আরেকটি ধারা বিরাজ করে। সাধারণ শিক্ষার মাঝেও বাংলা মাধ্যম, ইংরেজী মাধ্যম, এ লেভেল-ও লেভেল, সিনিয়র ক্যামব্রিজ-জুনিয়র ক্যামব্রিজ ইত্যাদি বিভাজন আছে। অন্যদিকে মাদ্রাসা শিক্ষা নানাভাবে বিভক্ত।

সাধারণ শিক্ষার পাঠক্রম শিল্প বিপ্লবের হলেও মাদ্রাসা শিক্ষার পাঠক্রম মোটেই জীবন বা কর্মমুখী নয়। তবে এই সময়ে এসে কার্যত উভয় ধারার পাঠক্রম প্রাগৈতিহাসিক হয়ে গেছে। বর্তমানের প্রয়োজন অনুযায়ী এই পাঠক্রম প্রস্তুত করা নয়। পাঠ্যপুস্তকের মানও অত্যন্ত নিম্ন। পাঠদান পদ্ধতি সেকেলে। বই খাতা-কলম-চক-ডাস্টার-ব্ল্যাকবোর্ড দিয়ে এক ধরনের গতানুগতিক শিক্ষা দেয়া হয়। এই শিক্ষাব্যবস্থার মূল্যায়ন ব্যবস্থাটিও চরমভাবে মুখস্থবিদ্যা ও লেখা-টিকচিহ্ননির্ভর। আমি মনে করি, এই ঘুণে ধরা ও পচা শিক্ষাব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন না করলে আমাদের স্বাধীনতার লড়াইটাই ব্যর্থ হয়ে যাবে। দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তন বা উন্নয়নের জন্য পূর্ববর্তী সরকারের প্রচেষ্টা ইতিবাচক নয়। এদেশে বারবার শিক্ষা কমিশন হয়েছে। একমুখী-বহুমুখী-সমন্বিত ইত্যাদি নানা নামে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়েছে। ইংরেজি বাধ্যতামূলক না অপশনাল সেইসব বিষয় নিয়েও পরীক্ষা নিরীক্ষা হয়েছে। কমিশন থেকে গাদার গাদা সুপারিশ করা হয়েছে। এক কমিশন যাকে হ্যা বলেছে অন্য কমিশন তাকে না বলেছে। এক বোতলের মদ অন্য বোতলে ঢালা হয়েছে। থোড়বড়ি খাড়া এবং খাড়াবড়ি থোড় করে এক ধরনের জোড়াতালির শিক্ষা এখন চলছে। কার্যত কোন কমিশনই বাস্তব অবস্থা উপলব্ধি করেনি। ফলে শিশুশিক্ষা থেকে উচ্চশিক্ষা পর্যন্ত কোন স্তরের শিক্ষাই একুশ শতক/ তথ্যযুগ বা জ্ঞানভিত্তিক সমাজের উপযোগী নয়।

অথচ শিক্ষাব্যবস্থা একটি দেশের, একটি সমাজের সার্বিক অগ্রগতির ভিত্তি। বিশেষ করে জ্ঞানভিত্তিক সমাজের জন্য উপযুক্ত, প্রয়োজনীয় ও পর্যাপ্ত জ্ঞান অর্জন করতে না পারলে ব্যক্তিগত ও সামাজিক সংকট তৈরি হবে। আমাদের মনে রাখা দরকার বর্তমানের সাধারণ শিক্ষা পদ্ধতিটির প্রচলন হয়েছিলো উনিশ শতকের শিল্প বিপ্লবকে মনে রেখে। তখনকার হোয়াইট কলার কর্মীবাহিনীর দিকে লক্ষ্য করে তৈরি ঐ শিক্ষা ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা তথ্যযুগে নেই। সেজন্যই হোয়াইট কলার কর্মীকে ব্লু কলার জ্ঞানকর্মীতে রূপান্তর করার ব্যবস্থা করতে হবে।

বলার অপেক্ষা রাখেনা, এই কাজটি করার জন্য শিক্ষার বিষয়বস্তু, শিশু থেকে উচ্চ শিক্ষা স্তর পর্যন্ত স্তরে স্তরে সেই বিষয়বস্তু বিন্যস্ত করার জন্য স্তরবিন্যাস করা প্রয়োজন। প্রথমে স্থির করা উচিত আমরা একটি মানুষকে কোন স্তরে কতোটা শিক্ষা দিতে চাই। শিশু পর্যায়ের একটি শিশু কি শিখবে, প্রাথমিক পর্যায়ে সেই শিশুটি আরো কতোটা শিখবে, নিম্ন মাধ্যমিক স্তরে তার কোন বিষয়ে জ্ঞান কতোটা হওয়া উচিত বা মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক এবং উচ্চশিক্ষা পর্যায়ে তার কি শিক্ষার দরকার সেটি নির্ণয় করতে হবে।

আমাদের সমাজ এবং রাষ্ট্রে কি ধরনের কর্মী দরকার সেই অনুপাতেই আবার শিক্ষিত জনগোষ্ঠী তৈরী করতে হবে। বিশেষ করে আমাদের সাধারণ শিক্ষার মাঝে বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি শিক্ষার গুরুত্ব ব্যাপকভাবে বাড়াতে হবে। বিজ্ঞান বা অঙ্কভীতির জগৎ থেকে আমাদের নতুন প্রজন্মকে আত্মবিশ্বাসী, জ্ঞানী এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিমনস্ক করতে হবে। কিন্তু সাম্প্রতিক খবর অনুযায়ী মাধ্যমিক থেকে উচ্চশিক্ষা পর্যায় পর্যন্ত সর্বত্রই বিজ্ঞান শিক্ষার প্রতি আমাদের ছেলেমেয়েদের আগ্রহ কমছে। গণিত অলিমপিয়াড ও অন্যান্য অনুপ্রেরণাদায়ক কোন কাজই এক্ষেত্রে আমাদের অধোগতি রোধ করতে পারছেনা।

এই উদ্দেশ্য সাধন করতে প্রথমেই কাঠামোগত পরিবর্তন দরকার। প্রচলিত দালানকোঠা-চেয়ার-টেবিল-বেঞ্চির পাশাপাশি তথ্যপ্রযুক্তির ল্যাব প্রতিষ্ঠা করতে হবে। আমি প্রস্তাব করি প্রচলিত ক্লাশরুমগুলোকে কম্পিউটার ল্যাবে পরিণত করার। আমি আরো প্রস্তাব করি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য স্তরভিত্তিক একটি করে কেন্দ্রীয় তথ্যভান্ডার তৈরি করে তার সাথে প্রতিটি শিক্ষার্থীকে ল্যাপটপ/নেটবুক কম্পিউটার দিয়ে যুক্ত করতে হবে। সম্প্রতি এমআইটি ল্যাবে উদ্ভাবিত, ওএলপিসি কার্যক্রমের অধীনে ১০০ ডলারের ল্যাপটপের যে কার্যক্রম চলছে সেটি বা তার মতো সাশ্রয়ী মূল্যের ল্যাপটপ কম্পিউটারকে অবলম্বন করে শিক্ষার্থীর বাড়ী ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পরিবেশ বা অবকাঠামো গড়ে তুলতে হবে। নেটবুক কম্পিউটার দিয়েই ইন্টারনেটভিত্তিক শিক্ষা কার্যক্রম চলতে পারে। কার্যত এই যন্ত্রটিই হতে পারে শিক্ষার কেন্দ্র। এটি পাঠ্যপুস্তক, মূল্যায়ন যন্ত্র, পাঠাগার বা খেলার সামগ্রী সবকিছুই হবে। ছাত্র-শিক্ষকরা এর সহায়তাতেই নতুন ডিজিটাল শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তুলবেন। তারা পাঠ্যপুস্তককে সফটওয়্যার হিসেবে পাবে। এমনকি বই না কিনে সেটি তারা ইন্টারনেট থেকে ব্যবহার করতে পারে।

প্রচলিত বইতে যেখানে কেবলমাত্র স্থির বর্ণ ও চিত্র দিয়ে শিক্ষা দেয়া হয় সেখানে এই ব্যবস্থায় ছবি ও বর্ণকে চলমান করার পাশাপাশি শব্দ বা সাউন্ড ব্যবহার করা হবে। দ্বিমাত্রিকতা এবং ত্রিমাত্রিকতার সাথে চলমানতা ও বিশেষ এফেক্টস যুক্ত করে শিক্ষার্থীর সামনে একটি নতুন অভিজ্ঞতা প্রদান করা হবে। এর ফলে শিক্ষার্থীদের অনুভব করার ক্ষমতা দ্বিগুণ বাড়বে। বর্তমানে তারা বিষয়বস্তুর যে শতকরা ৪০ ভাগ উপলব্ধি করতে পারে সেটি তখন শতকরা ৮০ ভাগে উন্নীত হবে।

শিক্ষাদান পদ্ধতিতে নতুন এই উপকরণ ব্যবহার করার ফলে মূল্যায়ন ব্যবস্থারও পরিবর্তন হবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো একটি স্থির বাড়ীঘর থেকে সর্বত্র বিরাজমান প্রতিষ্ঠানে পরিণত হবে। ছাত্র-ছাত্রীরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আশে পাশে-বাড়ীতে যেখানেই থাকুক এমনকি দূরবর্তী স্থানেও যদি থাকে, তবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করার পাশাপাশি সারা দুনিয়ার সাথে যুক্ত থাকবে। স্কুলের তথ্যভাণ্ডারের পাশাপাশি শিক্ষার্থীরা বিশ্ব জ্ঞানভান্ডারের সাথে সম্পর্কযুক্ত হতে পারবে। এদের জন্য গড়ে তুলতে হবে ডিজিটাল লাইব্রেরী। পাঠ্যপুস্তকগুলোর পাশাপাশি অন্যান্য বইগুলোকে ডিজিটাল পদ্ধতিতে রূপান্তর শুরু হলে শিক্ষা গ্রহণ করার সুযোগও অবারিত হবে। বাড়ীতে, স্কুলে, ক্লাশরুমে যেখানেই সে থাকুক পাঠাগার তার হাতের মুঠোয় থাকবে। শিক্ষকের সাথে তার যোগাযোগ ক্লাশরুমের বাইরে বিস্তৃত হবে, হবে সার্বক্ষণিক।

ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে ল্যাপটপ/নেটবুক দেবার ফলে দেশের সার্বিক অবস্থার আমূল পরিবর্তন হবে। কার্যত পুরো দেশটিতেই একটি পরিবর্তনের ছোঁয়া লাগবে। ছাত্র-ছাত্রীরা অগ্রসেনানী হিসেবে কাজ করবে এবং তাদের অভিভাবকদের জন্য নতুন জ্ঞানভাণ্ডার খুলে দেবে। ছাত্র-ছাত্রীদের ল্যাপটপ থেকেই অভিভাবকদের ডিজিটাল যাত্রা শুরু হবে। তার প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত পাবার পাশাপাশি এটি পরিবারের যোগাযোগ যন্ত্রে পরিণত হবে। শিক্ষার কার্যক্রমটি বদলে যাবার মানেই জনসংখ্যার বৃহত্তম অংশ বদলে যাওয়া।

এদের পাশাপাশি এর সাথে সংশ্লিষ্ট খাতগুলোও বদলাবে। প্রকাশনা, মুল্যায়ন বা শিক্ষা সেবাদানকারীদের অবস্থাও বদলে যাবে। ফলে সারা দেশে একটি ডিজিটাল সংস্কৃতির জন্ম হবে।

ডিজিটাল বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থার একটি লক্ষ্য হবে ধনী-দরিদ্র, নারী-পুরুষ, হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে প্রতিটি মানুষকে শিক্ষাদান করা। আর্থিক কারণে বা শহর-গ্রামের জন্য শিক্ষায় কোন বিভাজন রেখা তৈরী করা যাবেনা। কোন ডিজিটাল ডিভাইড থাকতে পারবেনা। শিক্ষার বিভিন্ন ধারাকে একত্রিত করে সকল নাগরিকের জন্য একই শিক্ষাধারা প্রদান করতে হবে।

শিক্ষার সর্বনিম্ন স্তর থেকে ডিজিটাল প্রক্রিয়া শুরু করতে হবে। এর অর্থ দাঁড়াবে শিশুরা সবার আগে ডিজিটাল শিক্ষা পাবে। তাদের হাতে কম্পিউটার দিয়ে তাদের শিক্ষার অভিজ্ঞতাকে আনন্দময় করতে হবে। স্কুলের ভীতিকর অবস্থার বদলে শিশুরা স্কুলে হাসতে খেলতে আসবে-এমন একটি পরিবেশ তৈরী করতে হবে। শিশুদেরকে হালের বলদের মতো কাধে শিক্ষার জোয়াল না দিয়ে এমন ব্যবস্থা করতে হবে যাতে সে নিজেই ভাবে যে এটি তার প্রয়োজন। ধাপে ধাপে এই ডিজিটাল ব্যবস্থা উপরের দিকে উঠবে এবং এক সময়ে পুরো শিক্ষা ব্যবস্থাটি ডিজিটাল হবে। এই ব্যবস্থা প্রচলনের প্রথম বছরে প্রস্তুতি নিতে হবে। এর পরের বছরে শিশুশ্রেণী থেকে দ্বিতীয় শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষাকে ডিজিটাল করা হবে। এজন্য পাঠ্যপুস্তককে সফটওয়্যারে পরিণত করা- প্রয়োজনীয় ল্যাপটপ/নেটবুক সংগ্রহ ও অবকাঠামো তৈরি করা এবং শিক্ষক প্রশিক্ষণের কাজ করতে হবে। পরবর্তী বছরে তৃতীয় থেকে ৫ম শ্রেণী, এর পরের বছরে ৬ষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণী এবং তার পরের বছরে নবম-দশম শ্রেণীর শিক্ষাকে ডিজিটাল করতে হবে। দশম শ্রেণীর শিক্ষাকে ডিজিটাল করার পরের বছরে উচ্চমাধ্যমিক এবং পরবর্তী বছরগুলোতে উচ্চ শিক্ষাকে ডিজিটাল করতে হবে। সার্বিকভাবে মোট দশ বছরে পুরো শিক্ষাব্যবস্থাকে ডিজিটাল করা হবে। প্রস্তুতি ও পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি অনুযায়ী সময়পরিকল্পনা সমন্বয় করা যাবে।

উপসংহারে বলা যায়, রাষ্ট্র দেশের ধনী-দরিদ্র, নারী-পুরুষ, হিন্দু-মুসলমান জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে প্রতিটি মানুষের জন্য মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত একই মানের একই ধারার উপযুক্ত শিক্ষা নিশ্চিত করতে হবে। মাদ্রাসা এবং স্কুল নামক ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষাব্যবস্থা থাকবেনা। প্রয়োজনে ধর্মীয় শিক্ষার সুব্যবস্থা থাকবে। প্রতিটি নাগরিকের জন্য এই শিক্ষা অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করতে হবে। বিদ্যমান অবকাঠামোর উন্নয়ন করে প্রতিটি প্রাথমিক, মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও মাদ্রাসায় তথ্যপ্রযুক্তির ল্যাব প্রতিষ্ঠা করতে হবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের একটি কেন্দ্রিয় তথ্যভান্ডার তৈরি করে তার সাথে প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীকে (১০০ ডলারের বা সম কিংবা কাছাকাছি দামের ল্যাপটপ) কম্পিউটার দিয়ে যুক্ত করতে হবে। এই কম্পিউটারকে অবলম্বন করে শিক্ষার্থীর বাড়ী ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পরিবেশ বা অবকাঠামো নেটওয়ার্ক সিস্টেমে গড়ে তুলতে হবে। কার্যত কম্পিউটার যন্ত্রটিই হবে শিক্ষার কেন্দ্র। এটি পাঠ্যপুস্তক, মূল্যায়ন যন্ত্র, পাঠাগার বা খেলার সামগ্রী সবকিছুই হবে। ছাত্র-শিক্ষকরা এর সহায়তাতেই নতুন ডিজিটাল শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তুলবেন। তারা পাঠ্যপুস্তককে সফটওয়্যার হিসেবে পাবে। বাড়ীতে, স্কুলে, ক্লাশরুমে যেখানেই সে থাকুক পাঠাগার তার হাতের মুঠোয় সকল শিক্ষাবিষয় থাকবে। শিক্ষকের সাথে তার যোগাযোগ ক্লাশরুমের বাইরে বিস্তৃত হবে, হবে সার্বক্ষণিক।

তৃতীয় অগ্রাধিকার ॥ কৃষি, শিল্প বাণিজ্য ও অর্থনীতি

কৃষি: ডিজিটাল বাংলাদেশ নিয়ে আলোচনা করার সময় অতি গুরুত্বপূর্ণভাবেই আলোচনা করতে হবে কৃষি, শিল্প ও অর্থনীতির কথা। সভ্যতার বির্বতনে বাংলাদেশের অর্থনীতি বদলাবে। নতুন অর্থনীতি বা জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতি বা জন্ম নিচ্ছে, বদলে যাচ্ছে কৃষি, শিল্প বা শিল্প ব্যবস্থা। এটি শুধু আমাদের নয় বিশ্বের তাবত শিল্পোন্নত দেশেরই অতীত। আমি শুধু কোরিয়ার দৃষ্টান্ত দিতে পারি। এক সময়ে যে দেশটির জাতীয় আয় সম্পূর্ণভাবে কৃষিনির্ভর ছিলো তখন তা একেবারে নগন্য। এক সময়ে যেখানে কোরিয়ার সকল মানুষই কৃষিতে কাজ করতো তখন সেটিও নগন্য। অথচ কোরিয়া এখন তথ্যপ্রযুক্তি বিকাশের প্রথম কাতারের দেশ হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। বাংলাদেশকেও ডিজিটাল যুগের নতুন অর্থনীতি, কৃষি ও শিল্পের সন্ধান করতে হবে।

বাংলাদেশ একটি কৃষিপ্রধান দেশ। এটি অস্বাভাবিক কিছু নয়। প্রায় দশ হাজার বছর আগে সারা দুনিয়ায় কৃষি যুগের সূচনা হয়। প্রথমে কায়িক শ্রম ও প্রাকৃতিক উপায়ে কৃষিব্যবস্থা গড়ে ওঠে। মানুষ তার সহজাত বুদ্ধি ও আদি জ্ঞান দিয়ে হাজার হাজার বছর ধরে প্রায় একই কায়দায় কৃষি কাজ করতে থাকে। গাছে বীজ হয় এবং সেই বীজ মাটিতে ফেললে আরেকটি গাছ জন্ম নেয়। গাছের গোড়ায় পানি দিলে সে বৃদ্ধি পায়-বেচে থাকে; গাছের ফসল-ফল দিনে দিনে বাড়ে, প্রাপ্তবয়স্ক হয় এবং তারপর পাকে। পাকা ফসল-ফল মানুষ নানাভাবে নানা প্রক্রিয়ায় তা ভোগ করতে পারে; এমন সাধারণ জ্ঞান দিয়ে কৃষির সূচনা।

মিসর থেকে ভারতীয় উপমহাদেশ; চীন ও আফ্রিকা থেকে সারা দুনিয়ায় সম্প্রসারিত হয় এই চাষাবাদের জ্ঞান। নদী ও প্রকৃতি নির্ভর কৃষি মানুষকে আর যাই করুক বেচে থাকার উপায় বাতলে দিয়েছে। পরে ধীরে ধীরে কৃষিতে প্রযুক্তি আসতে থাকে। সেটি অবশ্য হাজার হাজার বছরের কথা নয়। বিগত এক শতকেই কৃষিতে প্রযুক্তির প্রভাব পড়েছে বেশি। এই সময়ে মানুষ কর্ষণের জন্য যন্ত্র পেয়েছে, ফসল রক্ষার জন্য কীটনাশক পেয়েছে, পেয়েছে কৃত্রিম সেচের উপায়। এখন কৃষির প্রসারে বড় ভূমিকা সম্ভবত জেনেটিক প্রযুক্তির। কৃষিতে প্রযুক্তির প্রসার হতে থাকে নানা দিক থেকে। কায়িক শ্রমের বিকল্প হিসেবে প্রযুক্তি আসে।

বাংলাদেশের কৃষি এখনও প্রধানত কায়িকশ্রম নির্ভর। এতে সেচ, সার, কীটনাশক বা বীজের প্রযুক্তি যুক্ত হলেও উন্নত দেশের সাথে এর তুলনা করা যাবেনা। এখানে আমরা প্রায় শতবর্ষের পুরানো কায়দায় চাষাবাদ করছি। পরিসংখ্যাণ ব্যুরোর তথ্য অনুযায়ী এখনো দেশের শতকরা প্রায় ৬০ জন মানুষ কৃষিনির্ভর। এর অর্থ হচ্ছে দেশের সিংহভাগ মানুষকে কেবল কৃষির ওপর নির্ভর করতে হয়। অথচ দেশের বার্ষিক গড় আয়ের শতকরা মাত্র ২২ ভাগ কৃষি থেকে আসে। সাম্প্রতিক কালে মৎস্য ও হাস মুরগী খামারসহ সব্জি ও ফসল উৎপাদনে পুজি ও প্রযুক্তি দুটোই ব্যবহৃত হচ্ছে। কৃষিতে শস্য বৈচিত্রও এসেছে। তবে কৃষির মূল ধারাটি এখনও ধাননির্ভর। বিগত শতকের ষাটের দশকে প্রচলিত ধানের বদলে উচ্চফলনশীল ইরিধান প্রচলনের মধ্য দিয়ে ধানচাষে প্রযুক্তিগত উৎকর্ষতা শুরু হয়। সেচ, সার কীটনাশক ব্যবহারের পাশাপাশি ট্রাক্টর, পাওয়ার টিলার ব্যবহৃত হতে থাকে। এখন কোন কোন ফসলে হাইব্রিড বা জেনেটিক্যালি মডিফাইড বীজ ব্যবহৃত হচ্ছে। কিন্তু একে কোনভাবেই উন্নত দেশগুলোর কৃষির সাথে তুলনা করা যায় না। তবে শিক্ষার হার বাড়ায় এবং শহরমুখী জীবন যাপন ও কর্মসংস্থান আকর্ষণীয় হওয়ায় কৃষিতে শ্রমিকের সংখ্যা দিনে দিনে কমছে। ফলে এই খাতে বেকারত্ব নেই বললেই চলে। অবশ্য কৃষি শ্রমিকদের সংগঠিত করার কোন উদ্যোগ নেই।

কৃষিজাত শিল্প কারখানা স্থাপনের উদ্যোগটি সাম্প্রতিক। ফলের রস থেকে মসলা বা অন্যান্য কৃষিজাত পণ্য কল কারখানার উপজীব্য হয়েছে একেবারেই অতি সাম্প্রতিক কালে। এই খাতে রপ্তানীর সম্ভাবনাও বেড়েছে। বিশেষত যেসব এলাকায় বাংলাদেশের শ্রমিক রয়েছে সেইসব স্থানে বাংলাদেশের কৃষিপণ্যের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে।

ডিজিটাল বাংলাদেশ কৃষিতে কি নতুনত্ব আনতে পারে সেটি অবশ্যই একটি বিশাল প্রশ্ন। যেহেতু দেশের শতকরা ষাট ভাগ লোক কৃষির সাথে জড়িত সেহেতু কৃষিতে যদি ডিজিটাল বাংলাদেশ কোন ভূমিকা পালন করতে না পারে তবে ডিজিটাল বাংলাদেশ দেশের বৃহত্তম জনগণের জন্য কোন অবদান রাখবে না।

প্রথমত ডিজিটাল বাংলাদেশ মানে হবে কৃষির জন্য সর্বাধুনিক ও সর্বশেষ তথ্য কৃষকের হাতের নাগালে পৌছানো। এখন কৃষক নির্ভর করে আকাশ আর মাটির ওপর। কোন কোন স্থানে কৃষিবিভাগ, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কৃষির তথ্য দিয়ে থাকে বটে। টিভিতে কৃষি বিষয়ক অনুষ্ঠানও প্রচারিত হয়। কিন্তু কার্যত কৃষিকাজের জন্য প্রতি মুহূর্তে যে ধরনের তথ্য কৃষকের হাতে থাকা প্রয়োজন তা এখন কোনভাবেই পাওয়া যায়না। কৃষিপণ্যের বাজার দর বা সরকারের প্রদত্ত সুযোগ সুবিধা কৃষক কার্যত জানেইনা। সরকার যদি ডিজিটাল হয় এবং সরকারি তথ্য কৃষকের কাছে পৌছে দেবার ব্যবস্থা করা হয় তবে কৃষক উপকৃত হবে। কৃষকের জন্য সার, সেচ, বীজ দেয়ার যেসব ব্যবস্থা বিরাজ করে তার সাথে কৃষিঋণের আবেদনপত্র প্রসেস করা ও ঋণ বিতরণ করা তথ্যপ্রযুক্তিভিত্তিক হতে পারে। এভাবে কৃষকের বর্তমান অবস্থার পরিবর্তনের জন্য প্রয়োজন হবে ইন্টারনেটে কৃষিভিত্তিক ইন্টারএ্যাকটিভ, অডিও ভিজুয়াল তথ্য রাখা। কৃষি তথ্য এ্যানিশেন, সাউন্ড এবং ভিডিও হিসেবে থাকতে হবে। এইসব তথ্য যে কেবল ইন্টারনেটে থাকবে তা নয়, এসব তথ্য সিডি-ভিসিডিতে বিতরণ করা হতে পারে। টিভিতে এসব তথ্য প্রচার করা হতে পারে। এমনকি এজন্য কৃষিভিত্তিক রেডিও-টিভি চালু করা যেতে পারে।

ডিজিটাল প্রযুক্তি দিয়ে কৃষককে আধুনিক ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থায় যুক্ত করা যায়। এজন্য মোবাইল ব্যাঙ্কিং একটি কার্যকর ব্যবস্থা হতে পারে। ডিজিটাল প্রযুক্তি দিয়ে নিরক্ষরতা দূর করার পাশাপাশি বয়স্ক শিক্ষার ক্ষেত্রেও ব্যাপক অগ্রগতি সাধন করা যেতে পারে। বিভিন্ন বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং হাতে কলমে শিক্ষা দানের জন্য ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহৃত হতে পারে।

কৃষি খাতের জন্য তথ্য ডিজিটাল উপায়ে তৈরী করা বা রাখাটাই বড় কথা নয়। এমনকি ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করাটাও বড় কথা নয়। প্রয়োজন হচ্ছে কৃষকের কাছে ডিজিটাল সুযোগ সুবিধা সহজলভ্য করা। আমাদেরকে এটি বুঝতে হবে যে, কৃষক শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত এবং সমাজের অন্য অংশের মতো ইন্টারনেট বা অন্যান্য ডিজিটাল টুল ব্যবহার করার দক্ষতা রাখে না। ফলে কেবলমাত্র কৃষি তথ্য ইন্টারনেটে থাকলেই কৃষক উপকৃত হবে না। দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এক্ষেত্রে লক্ষ্য রাখতে হবে। প্রথমত কৃষকের প্রয়োজনীয় তথ্য তার নিজের ভাষায় দিতে হবে। এখন যেভাবে সরকারী তথ্য ইংরেজিতে রাখা হয় তা না রেখে সকল কৃষি তথ্য বাংলায় রাখতে হবে।

প্রয়োজনে আঞ্চলিক ভাষায় অডিও হিসেবে কৃষি তথ্য রাখা যেতে পারে। দ্বিতীয়ত কৃষক যাতে এইসব তথ্য ব্যবহার করতে পারে তার ব্যবস্থাও করতে হবে। কৃষক যাতে প্রয়োজনে তার মোবাইল ফোনে এইসব তথ্য পেতে পারে তার ব্যবস্থাও করতে হবে। গ্রামে তথ্যকেন্দ্র স্থাপন করে কৃষকের জন্য কৃষি তথ্য সহজলভ্য করা যেতে পারে। স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসা, ইউনিয়ন কাউন্সিল অফিস বা কমিউনিটি সেন্টার এজন্য ব্যবহৃত হতে পারে।

শিল্প: ব্রিটিশ আমলে বাংলাদেশ (তথা ভারতবর্ষ) শিল্প কারখানার দেশ হবার বদলে ইংল্যান্ডের শিল্প কারখানার কাচামালের যোগানদার হয়। বাংলাদেশের পাট, তূলা, নীল ডান্ডির পাটকল-কাপড় কলে চালান হয়। চাষীরা বাধ্য হয় ব্রিটিশ কারখানার কাঁচামাল উৎপন্ন করতে। অন্যদিকে ব্রিটিশরা এদেশে যেসব অবকাঠামো তৈরী করে তারও প্রধান উদ্দেশ্য থাকে ব্রিটেনে কাচামাল যোগান দেয়া। ব্রিটিশরা বিদায় হলে বাংলাদেশ নামক ভূখণ্ডটিতে শিল্পায়ন শুরু হয় পাকিস্তান সৃষ্টির বেশ পরে। কৃষিভিত্তিক পাটকল ছিলো এই অঞ্চলের প্রথম শিল্পখাত। কৃষিভিত্তিক চা শিল্পও বেশ বিস্তৃত হয়। এরপর টেক্সটাইল মিলসমূহ গড়ে উঠে। মেশিনারিজ কারখানার পাশাপাশি ছোট খাটো ওয়ার্কশপও জন্ম নেয় আস্তে আস্তে। কসমেটিক্স এবং ভোক্তাসহ গৃহস্থালী পণ্য উপাদনের জন্য কিছু কারখানা তৈরী হয়। গড়ে উঠতে থাকে চামড়া ও পাদুকা শিল্প। কাগজ, নিউজপ্রিন্ট, সার, চিনি ও সিমেন্টের বড় বড় শিল্পও প্রতিষ্ঠিত হয়। খুব সঙ্গতকারণেই এইসব কল-কারখানার মালিকেরা প্রায় সকলেই ছিলো হয় পাকিস্তান সরকার, নয়তো তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানের অধিবাসী। সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা ছিলো এদের প্রতি। তৎকালীন বাঙ্গালী ধনিকরা বড়জোর পাটের গুদাম বা পাটসহ কৃষি ও ভোক্তাপণ্যেও ট্রেডিং-এর সাথে যুক্ত হতে পারতো। এই অঞ্চলের মানুষের না ছিলো শিল্প স্থাপনের পুজি, না ছিলো জ্ঞান। পাকিস্তান ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন এবং ইস্ট পাকিস্তান ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন প্রধানত এই অঞ্চলে শিল্পায়নের বিষয়টি দেখাশোনা করতো। এই সংস্থাগুলো কিছু সরকারি শিল্প প্রতিষ্ঠানেরও জন্ম দেয়। এসবের ব্যবস্থাপনাও ছিলো তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানীদের হাতে। ফলে ব্রিটিশ শাসন এবং পাকিস্তানী শাসন কার্যত একটি ধারাবাহিকতায় পরিণত হয়। এসব কল-কারখানাকে কেন্দ্র করে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে ধীরে ধীরে ছোট একটি শ্রমিক শ্রেণীও জন্ম নেয়। ক্রমশ শ্রমিক সংগঠনগুলো শক্তিশালী হতে থাকে। তাদের মাঝে বাম রাজনীতি ও বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের প্রভাব তীব্র হতে থাকে। কম্যুনিস্ট, বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদী এবং প্রগতিশীল বাম রাজনৈতিক দলগুলো এইসব শ্রমিকদের সংগঠিত করার উদ্যোগও নেয়। এমনকি পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের গণতান্ত্রিক আন্দোলন এবং স্বাধীনতা সংগ্রামে শ্রমিক শ্রেণী গুরুত্বপূর্ণভাবে অংশগ্রহণ করে। বিশেষ করে ৬২, ৬৬ ও ৬৯ সালে বাঙ্গালী শ্রমিকদের অংশগ্রহণ ছিলো উল্লেখযোগ্য। অধুনা বন্ধ করা আদমজী জুট মিল এদেশের সর্ববৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠান ছিলো। সময়ের চাপে শুধু আদমজী নয় অন্যসব পাটকলও পাইকারী হারে বন্ধ হয়েছে। ফলে সেই সময়কার ক্ষুদ্র শ্রমিকশ্রেণীটিও বিলুপ্ত হয়েছে। এর বাইরে এখানে তাঁতশিল্প, মসলিন ইত্যাদি কাপড় শিল্প প্রথমে ব্রিটেনের ও পরে যন্ত্রের প্রতিযোগিতার জন্য ব্যাপক চাপের মুখে পড়ে। একাত্তরের স্বাধীনতার পর পাকিস্তানী শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলো জাতীয়করণ করার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের সরকারী শিল্পখাতের জন্ম হয়। ব্যর্থ, দুর্নীতিপরায়ণ ব্যবস্থাপনা ও লুটপাটের জন্য সেইসব কল-কারখানা কার্যত সরকারের সম্পদের বদলে দায়ে পরিণত হয়। তবে বিগত প্রায় তিনযুগে বেসরকারী শিল্পখাতের বেশ বিকাশ ঘটে। প্রসাধন সামগ্রী, গৃহস্থালি-ভোক্তা পণ্য, গার্মেন্টস, গাড়ী ও ইলেকট্রনিক্স পণ্য সংযোজন, কৃষিভিত্তিক খামার ও প্রক্রিয়াকরণ শিল্প, সার, রসায়ণ, আসবাবপত্র, প্লাস্টিক, কাপড়, সূতা, গার্মেন্টস সহায়ক, সিমেন্ট ইত্যাদি খাতের শিল্প প্রতিষ্ঠান জন্মগ্রহণ করে। তবে এখন বাংলাদেশের বৃহত্তম শিল্পখাতটি হলো গার্মেন্টস। দুর্ভাগ্যজনকভাবে গামেন্টসের শ্রমিকরা অমানবিক অবস্থায় বাস করে ও নির্মমভাবে শোষিত হয়। তারা যে ন্যুনতম মজুরী পায় তা জীবনধারন তো দূরের কথা যাতায়াত ব্যয়ও হয়না। যদিও এই খাতে সর্বাধিক সংখ্যক নারীর কর্মসংস্থান হয়েছে তথাপি ট্রেড ইউনিয়নের অধিকার বঞ্চিত এই শ্রমিকরা সংগঠিতও নয়। ২০০৬ সালে গার্মেন্টস শ্রমিকদের আন্দোলনের সময় সরকার মালিকদের পক্ষে নগ্নভাবে অবস্থান নেয়। তখনকার বিরোধীদলও গার্মেন্টস মালিকদের পক্ষেই অবস্থান নেয়।

অতি সাম্প্রতিককালে দেশে কিছু আইসিটি সেবাখাতের শিল্প প্রতিষ্ঠান জন্ম নিয়েছে যেগুলোকে আমরা জ্ঞানভিত্তিক শিল্প খাত বলতে পারি। তবে এসবের অবস্থা তেমন ভালো নয়। সার্বিকভাবে বাংলাদেশের শ্রমিকশ্রেণী রাজনৈতিক পরিবর্তনের নেতৃত্ব দিতে সক্ষম বা সংগঠিত নয়।

ডিজিটাল বাংলাদেশের শিল্পসমূহ কৃষিভিত্তিক, ভোক্তা বা লাইফ স্টাইলভিত্তিক এবং জ্ঞানভিত্তিক হিসেবে বিবেচিত হবে। কৃষিভিত্তিক শিল্পের প্রধানতম উদ্দেশ্য হবে দেশের কৃষিসম্পদের উন্নয়ন, কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াকরণ, দেশবাসীর খাদ্যের যোগান দেয়া এবং রপ্তানি করা। ভোক্তা বা লাইফস্টাইল ভিত্তিক শিল্প মানুষের দৈনন্দিন প্রয়োজন, জীবন যাপনের মানবৃদ্ধি এবং সমৃদ্ধির সহায়তার জন্য গড়ে উঠবে।

জ্ঞানভিত্তিক শিল্প ও সেবার জন্য হবে মেধাভিত্তিক। পূর্বোক্ত খাতসমূহে প্রযুক্তি সরবরাহ, উচ্চতর প্রযুক্তির জন্য গবেষণা, তথ্যপ্রযুক্তিভিত্তিক ব্যবস্থাপনা, দক্ষ-জবাবদিহিতামূলক গতিশীল সুশাসন, আমলাতন্ত্রের হাত থেকে মুক্তি, দুর্নীতিরোধ ছাড়াও রপ্তানি আয় এই খাতের অন্যতম লক্ষ্য হবে।

এইসব শিল্প কারখানাকে রাজধানী মেট্রোসিটি থেকে জেলা, উপজেলা, থানা এবং গ্রামে স্থানান্তরিত করতে হবে। কৃষি ও জ্ঞানভিত্তিক শিল্প স্থাপনে গ্রামই হবে আদর্শ স্থান। দৈনন্দিন ভোক্তা পণ্য গ্রামেই উৎপাদিত হবে। প্রতি দশ হাজার মানুষের জন্য একটি ক্ষুদ্র শিল্পাঞ্চল থাকবে। উপজেলা বা জেলায় সেটি আরো বিস্তৃত হবে। সরকার শিল্পখাতে ব্যাপক সহায়তা প্রদান করবে। শিল্পের বিকাশের অনুকূল শিল্পপতি থাকা ছাড়াও শিল্প স্থাপনে জমি, সরঞ্জামাদি এবং অর্থের যোগান দেবে। দেশে উপযুক্ত স্থানে হাইটেক পার্ক, শিল্প পার্ক, সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক, গার্মেন্টস পল্লী, চামড়া পল্লী ইত্যাদি স্থাপন করা হবে। ইক্যুইটি এন্টারপ্রনেরশিপ ফান্ডের ব্যবস্থা করা হবে। একই সাথে রপ্তানি সহায়তা ও ক্ষুদ্র-মাঝারি উদ্যোক্তা তহবিল গড়ে তুলে সরাসরি উদ্যোক্তাকে সহায়তা করা হবে।

নতুন অর্থনীতি: নিউ ইকোনমি বা নতুন অর্থনীতি পুজিবাদী দুনিয়ারই আবিষ্কার। এটি হচ্ছে বস্তুত মানব সভ্যতার যুগ পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট পুজিবাদী অর্থনীতিকে নতুন ব্যবস্থায় উত্তরণের উপায়। দুনিয়ার বৃহত্তম বিশ্বকোষ উইকিপিডিয়ায় নিউ ইকোনমিকে এভাবে বলা হয়েছে, The **New Economy** was an evolution of developed countries from an industrial/manufacturing-based wealth producing economy into a service sector asset based economy, brought about by globalization and currency manipulation by governments and their central banks. কার্যত এটি হচ্ছে শিল্পযুগোত্তর অর্থনীতি। এই অর্থনীতিতে কৃষি ও শিল্প উৎপাদনের চাইতে সেবাখাতের গুরুত্বকে বাড়িয়ে দেখা হয়েছে। অনেকেই তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিতে ব্যাপক বিনিয়োগকে এই অর্থনীতির ভিত্তি হিসেবে দেখছেন। According to many commentators in the late 1990s, investment in Information & Comunication Technology (ICT) had eliminated economic fluctuations and ushered in a golden age of economic prosperity. (উইকিপিডিয়া) । এ প্রসঙ্গে আরও বলা হচ্ছে যে, The general idea is that a business should focus on those areas of its operation which are critical to its success and where it has a competitive advantage. Other areas of its operation should be outsourced, typically using technology as the facilitator. In a developed economy, the critical success factors to a leading business are likely to be intellectual things such as brands, products specifications and technical capabilities. Many routine business functions (such as manufacturing and customer service desks) may be outsourced.

Ashot Grigoryan believes that the “new economy” is a current Kondratiev wave which will end after a 50-year period in 2040’s. Its innovative basis includes Internet, nanotechnologies, telematica and bionica[3].

ডিজিটাল বাংলাদেশ তৈরীর জন্য একটি নতুন অর্থনীতি গড়ে তুলতে হবে। এর নাম হবে নিউ ইকোনমি বা নলেজ ইকোনমি। এটি বিদ্যমান অর্থনীতিকে প্রতিস্থাপিত করবে। অর্থনীতির চরিত্র হবে মিশ্র। এটি পুরোপুরি পুঁজিবাদী হবেনা-আবার পুরোপুরি সরকার নিয়ন্ত্রিত হবে না। অর্থনীতি প্রতিযোগিতার সৃষ্টি করলেও প্রয়োজনে সরকার অর্থনীতির ক্ষেত্রবিশেষে কোন কোন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতে পারবে। এতে রাষ্ট্রীয় মালিকানার পাশাপাশি ব্যক্তি মালিকানা থাকবে, তবে বৃহৎ প্রতিষ্ঠানকে অবশ্যই জনগণের অংশীদারিত্বের মধ্য দিয়ে বিকশিত হতে হবে। ৫ কোটি টাকা বা তার বেশি মূলধনের কোম্পানীকে অবশ্যই পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী হতে হবে এবং শেয়ার বাজারে শেয়ার ছেড়ে জবাবদিহিতামূলকভাবে প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করতে হবে। কোন ব্যক্তি, গোষ্ঠী, পরিবার বা প্রতিষ্ঠান এককভাবে কোন কোম্পানীর শতকরা ৫ ভাগের বেশি শেয়ারের মালিক হতে পারবে না। সরকার বেসরকারি খাতের কাছে লাভজনক নয় অথচ জনকল্যাণমূলক এমন খাতে সরাসরি বিনিয়োগ করবে। রপ্তানি, জনকল্যাণমূলক, নিত্যপ্রয়োজনীয় ও কৃষিসহ জরুরি সেবাখাতে রাষ্ট্র প্রয়োজনমতো ভর্তুকি দেবে। অর্থনীতির বার্ষিক প্রবৃদ্ধি অবশ্যই দুই ডিজিটের বা শতকরা ১০ ভাগের বেশী হতে হবে। নতুন অর্থনীতির প্রয়োগের মাধ্যমে ২০২১ সালে বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় দুই হাজার ডলারে উন্নীত করতে হবে। ধীরে ধীরে জিডিপি-এর বৃহৎ অংশ মেধাজাত সম্পদ থেকে উৎপন্ন হবে। মেধাসম্পদ সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। তথ্যপ্রযুক্তিসহ, প্রযুক্তি পণ্য ও সেবা, কৃষিপণ্য, শিল্পপণ্য, গার্মেন্টস এবং সেবাখাতের রপ্তানিকে ব্যাপকভাবে

উৎসাহিত করা হবে। প্রয়োজনে এইসব খাতে অর্থের যোগান দেয়া হবে এবং রপ্তানি সহায়তাও করা হবে। একই সাথে দেশে আমদানী বিকল্প সেবা খাত, শিল্প যন্ত্রপাতি ও ভোক্তাপণ্য উৎপাদনে আর্থিক ব্যবস্থাকে পুনঃবিন্যস্ত করতে হবে। বাংলাদেশের বর্তমান অর্থনীতির ধারা অনুসারে নিরঙ্কুশ পুজিবাদ, লুটেরা ধনিক-বণিক-শিল্পগোষ্ঠীর পৃষ্ঠপোষকতাকে বিপরীত শ্রোতে প্রবাহিত করতে হবে। ধনীকে আরও ধনী বানানোর বা বৃহৎ পুজিকে আরও শক্তিশালী করার পথ রুদ্ধ করে ক্ষুদ্র, মাঝারি ও মধ্যবিত্ত জনগোষ্ঠীর স্বপক্ষে আর্থিক ব্যবস্থাপনা চালু করতে হবে। কৃষি, ক্ষুদ্র শিল্প, কুটির শিল্প, মেধাজাত শিল্প ইত্যাদি খাতের অনুকূলে আর্থিক ব্যবস্থা নিতে হবে ও ব্যাংক ঋণ প্রদান সহ সকল সহায়তা দিতে হবে। তরুণ উদ্যোক্তাদের জন্য থাকতে হবে ভেনচার ক্যাপিটাল।

চতুর্থ অগ্রাধিকার ॥ ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি

ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি একটি জাতির পরিপূর্ণ পরিচয়ের ভিত্তি। বাংলাদেশের জন্য এটি আরো অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কারণ আমরা এমন এক জাতি যারা ভাষার জন্য জীবন দিয়েছি এবং ভাষা-সাহিত্য সংস্কৃতির ভিত্তিতেই বাংলাদেশ নামক একটি স্বাধীন সার্বভৌম দেশ তৈরী করেছি। আমাদেরই আছে একুশে ফেব্রুয়ারি। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে স্বাধীনতা পরবর্তীকালে বাংলা ভাষা, বাংলা সাহিত্য ও বাঙ্গালীসহ দেশের অন্য ভাষাভাষী বা ভিন্ন সংস্কৃতির মানুষদের ভাষা-সাহিত্য ও সংস্কৃতির উন্নয়নে রাষ্ট্র তেমন কোন সহায়ক ভূমিকা পালন করে নি। অফিস আদালতের নিম্নপর্যায়ে বাংলা ভাষা চালু হলেও উচ্চ আদালত সহ অনেক কাজেই বাংলা ভাষা ব্যবহার করা হয়না। বাংলা সাহিত্যের বিকাশ বা বাঙ্গালী সংস্কৃতির সমৃদ্ধিতে সরকার উৎসাহমূলক কোন কাজ করে নি। বরং অনেক সময়েই প্রযুক্তির (যেমন কম্পিউটারের) নামে বাংলা ভাষার ব্যবহারকে সীমিত বা বন্ধ করা হয়েছে। কম্পিউটারের দোহাই দিয়ে যেসব স্থানে বাংলা ব্যবহার করা হতো সেখানে ইংরেজি ব্যবহার করা হচ্ছে। সরকার যেসব ওয়েব পেজ তৈরী করছে সেখানে বাংলার অবস্থান নেই বললেই চলে। শিক্ষার বাহন হিসেবে বাংলা এখনো মূলস্রোত হলেও বাংলাকে পরাভূত করার চেষ্টার কমতি নেই।

বাংলাদেশে বসবাসকারী উপজাতি বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিগোষ্টীর ভাষা সাহিত্য ও সংস্কৃতিও পড়েছে আগ্রাসনের কবলে। এইসব ভাষার নতুন প্রজন্মের কাছে তারা তাদের ভাষা ও সাহিত্য তুলে ধরতে পারছেনা। তাদের মূল হরফ এখন আর খোঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। কখনো রোমান হরফ এসে এদের নিজস্ব বর্ণমালাকে বিদায় করে দিচ্ছে। সাহিত্য বিলুপ্ত হচ্ছে। এদের নিজস্ব সংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রেও রাষ্ট্রের ভূমিকা ইতিবাচক নয়। এই অবস্থার পরিবর্তন করে বাংলা সহ সকল ভাষাভাষীদের ভাষা, সাহিত্য এবং সংস্কৃতির বিকাশ ঘটাতে হবে।

স্বাভাবিকভাবে ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির যে সংকট বিদ্যমান রয়েছে ডিজিটাল যুগে তা আরও বাড়ছে। এক সময়ে বাঙ্গালী ভাবতেই পারতোনা যে রোমান হরফ দিয়ে বাংলা লেখা হবে। কিন্তু এখন যে প্রতিনিয়ত রোমান হরফে মোবাইলে এসএমএস লিখছে ওখানে বাংলা হরফ নেই। থাকলেও ব্যবহারের ইচ্ছা নেই। মান নেই। নেই প্রমিতকরণ। ই-মেইলে, ব্লগে ঘটছে এর পুনরাবৃত্তি।

দিনে দিনে আরও ডিজিটাল প্রযুক্তি আসবে এবং প্রমিতকরণ ছাড়া সমস্যার পাহাড় তৈরী হবে। ইতিমধ্যেই প্রমিতকরণ জটিলতায় মগ্ন আছে বাংলাদেশ সরকার। এসব সংকট উত্তরণের কোন চেষ্টাও নেই। অন্যদিকে ডিজিটাল প্রযুক্তি বাংলার ব্যবহার নিয়ে সরকার কোন বিনিয়োগ করেনা বা কোন বিনিয়োগকে উৎসাহিত করে না। বাংলা ব্যাকরণ, বানান শুদ্ধিকরণ, অপটিক্যাল ক্যারেক্টার রিডার, যথাশব্দ, টেক্সট টু স্পীচ ও স্পীচ টু টেক্সট কিংবা স্ক্রীন রিডার ইত্যাদি ক্ষেত্রে সরকার কোন সহায়তা করে না। বাংলা একাডেমী বা কম্পিউটার কাউন্সিল এসব কাজে কোন বলিষ্ঠ উদ্যোগ নেয় নি।

বাংলা সাহিত্য ভান্ডারকে সমৃদ্ধ করা এর ডিজিটাইজেশন বা ডিজিটাল প্রকাশনায় নজর নেই কারও। ডিজিটাল লাইব্রেরি গড়ে তোলার কোন উদ্যোগ নেই। ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়তে হলে সরকারকে এসব ক্ষেত্রে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে।

বাংলাসহ রাষ্ট্রের সকল ভাষার সাহিত্য চর্চার পরিবেশ তৈরী করা ছাড়াও এসবের গবেষণার জন্য রাষ্ট্রকে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে হবে। প্রাচীন সাহিত্যকে প্রকাশ করতে হবে। প্রাচীন সাহিত্যের রূপান্তর ও অন্যান্য পর্যায়ের উন্নীতকরণ করা হচ্ছে। বিশ্ব সাহিত্য ভান্ডারকে অনুবাদের মাধ্যমে দেশীয় ভাষাভাষীদের নাগালে আনা যায়। উচ্চশিক্ষাসহ সকল স্তরের পাঠ্যপুস্তক দেশীয় ভাষায় অনুবাদ করা এবং বাংলা সাহিত্যকে ইংরেজিসহ বিশ্বভাষাসমূহে অনুবাদ করা যেতে পারে। ডিজিটাল মাধ্যমে বাংলাসহ অন্যান্য ভাষার সাহিত্য প্রকাশ করা হবে। প্রযুক্তিতে বাংলাসহ অন্যান্য ভাষা ব্যবহারের সকল সমস্যা দূরীভূত করতে হবে।

সকল মানুষকে তার নিজের ভাষায় প্রাথমিক শিক্ষা দিতে হবে। মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত সকল শিক্ষাকে রাষ্ট্রভাষায় দিতে হবে। তবে শিশুশ্রেণী থেকেই দ্বিতীয় বা তৃতীয় ভাষা হিসেবে সকল শিক্ষার্থীকেই ইংরেজি শিক্ষাও দিতে হবে। বাংলা

ভাষা চর্চার সকল সুযোগ অবারিত করতে হবে। বাংলাদেশের প্রতিটি দূতাবাসের সাথে বাংলা শিক্ষার ব্যবস্থা রাখতে হবে। বাংলাদেশের বাঙ্গালীদের সংখ্যা বিবেচনা করে দূতাবাসের সাথে সংযুক্ত করে বাংলা স্কুল রাখতে হবে। (দৃষ্টান্ত: মার্কিন দূতাবাসের সাথে যুক্ত আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল স্কুল। ঢাকাতেও এমন একটি স্কুল আছে।)।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিগুলোর সংস্কৃতির মূল উপাদানকে অবিকৃতভাবে সংরক্ষণ করতে হবে। উপজাতীয় একাডেমীগুলোকে এদের সংস্কৃতির বিকাশের ও চর্চার উৎকৃষ্ট কেন্দ্র হিসেবে সহায়তা করতে হবে। প্রয়োজনে এসব উপাদানের আধুনিকায়ন বা প্রযুক্তি সংশ্লিষ্টতা দিতে হবে। তবে কোনভাবেই এর এতিহ্যগত রূপ বা বৈশিষ্ট্য ক্ষতিগ্রস্ত করা যাবে না। বাঙ্গালী সংস্কৃতিকে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দেবার জন্য সকল উদ্যোগ নিতে হবে। দেশে সংস্কৃতি চর্চার জন্য শিল্পকলা একাডেমী ছাড়াও বাঙ্গালী সংস্কৃতি কেন্দ্র গড়ে তুলতে হবে। অপসংস্কৃতি বা শেকড়বিহীন কালচার প্রতিরোধ করার জন্য সরকারকে সার্বিক প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে হবে। টিভি, মিউজিক, ভিডিও, সিনেমা বা অন্য কোন উপায়ে বাঙ্গালী সংস্কৃতিকে বিলীন করার যতো প্রচেষ্টা লক্ষ্যগোচর হবে তাকে প্রতিরোধ করতে হবে।

রাষ্ট্রভাষাসহ সকল ভাষার বিকাশ, সকল সংস্কৃতির উন্নয়ন করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব হবে। রাষ্ট্রের কাজকর্ম হবে কেবলমাত্র রাষ্ট্রভাষা বাংলায়। রাষ্ট্রের সকল তথ্য অবশ্যই বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হতে হবে। তবে বিদেশের সাথে যোগাযোগ করার ক্ষেত্রে বাংলার পাশাপাশি ইংরেজী বা অন্য ভাষা ব্যবহার করা যাবে। কোন অবস্থাতেই দেশের অভ্যন্তরীণ কাজে এককভাবে বিদেশী ভাষা ব্যবহার করা যাবে না। আদিবাসী বা বাংলা ব্যতীত অন্যান্য ভাষাভাষীরা তাদের ভাষা স্থানীয় প্রশাসনিক কাজে ব্যবহার করতে পারবে। সেজন্য যেসব এলাকায় বাংলা ছাড়া অন্যান্য ভাষাভাষী রয়েছে সেইসব এলাকায় বাংলার পাশাপাশি ঐসব ভাষা ব্যবহার করার সুযোগ তৈরী করতে হবে। রাষ্ট্রকে বাংলা ভাষার উন্নয়ন ও বিকাশে সর্বপ্রকারের গবেষণার দায়িত্ব নিতে হবে। তদুপরি বাংলা ছাড়া যেসব ভাষা-সাহিত্য দুর্বল তাদের ক্ষেত্রেও রাষ্ট্রকে সহায়তা প্রদান করতে হবে। রাষ্ট্র বাংলা সাহিত্য ও বাঙ্গালী সংস্কৃতির বিকাশকে সহায়তা এবং অন্য সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে যেকোন ধরনের আগ্রাসন থেকে রক্ষা করতে হবে।

পঞ্চম অগ্রাধিকার ॥ ধর্ম

যেভাবেই বিবেচনা করা হোক, স্মরণাতীতকাল থেকেই ধর্ম নাগরিকদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় হয়ে আসছে। আমাদের দেশের প্রেক্ষিতে এটি আরো অনেক বেশি তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ আমরা এক সময়ে ধর্মের নামে একটি রাষ্ট্রের নাগরিক হয়েছিলাম। এখনো সেই বিষাক্ত নিঃশ্বাস আমাদের ঘাড়ের ওপর পড়ছে। শোনা যাচ্ছিলো, শামুসল হুদা সাহেবের নির্বাচন কমিশন বিগত সাধারণ নির্বাচনকে গ্রহণযোগ্য, নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু করার জন্য কেবল বিগত সময়ের রাজনীতির সাধারণ দুর্বৃত্তায়ন বা লুটেরা কালচারই ধ্বংস করবেনা, দেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের মূল ভিত্তিকে সমুন্নত রাখার জন্য ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধ করবে। যদি তাই হতো, তবে আমরা বহু বছরের একটি অভিশাপ থেকে মুক্ত হতে পারতাম। কিন্তু শেষাবধি পর্বতের মুষিক প্রসবের মতো নির্বাচন কমিশন 'কেবলমাত্র ধর্মীয় উপাসনালয়ে নির্বাচনী প্রচারণা নিষিদ্ধ' করেছে। এর মানে দাঁড়াচ্ছে যে, কোন নির্বাচন প্রার্থী উপাসনালয়ে ভোট চাইতে পারবেনা। কিন্তু ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধ না করার ফাঁকে জামাতসহ ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলগুলো যথারীতি মসজিদকে রাজনীতির ঘাটি হিসেবে ব্যবহার করার চলমান সুযোগ অব্যাহত রাখতে পারবে। ইসলামের নামে জঙ্গীবাদও মসজিদকে ঘাটি হিসেবে ব্যবহার করতে পারবে।

নির্বাচন কমিশনের ঘোষণা থেকে এটি প্রতীয়মান হচ্ছে, তারা এটি উপলব্ধি করতে পারছেনা যে, সাম্প্রতিককালে ধর্মভিত্তিক রাজনীতি ও জঙ্গীবাদ কেবল আমাদের দেশেই নয়, সারা দুনিয়াতেই একটি বিশাল সংকটের সৃষ্টি করে চলেছে। ৯/১১-এ যুক্তরাষ্ট্রের টুইন টাওয়ারে হামলা ও ধ্বংস করার ঘটনা, বহু বছর ধরে চলমান প্যালেস্টাইন-ইসরায়েল সংঘর্ষ, চলমান কাশ্মির নিয়ে পাক-ভারত বিরোধ, আফগানিস্তানে তালেবান উত্থানের অজুহাতে ও ইরাকে গণবিধ্বংসী মারণাস্ত্র থাকার অজুহাতে বর্বর মার্কিন হামলা, থাইল্যান্ডে ইসলামি জঙ্গীবাদের জেগে ওঠা, মিয়ানমারের আরাকান অঞ্চলে বিরাজমান মুসলিম রোহিঙ্গা বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন এবং পাকিস্তান, ইরাণ ও বাংলাদেশে ধর্মভিত্তিক রাজনীতির আশাতীত প্রসারের ফলে ইসলামি জঙ্গীবাদ দিনে দিনে সারা দুনিয়ার জন্যই আতঙ্কের বিষয়ে পরিণত হয়েছে। আফগানিস্তানের ওসামা বিন লাদেনের আল কায়দা গ্রুপ এখন ইসলামি জঙ্গীবাদের সবচেয়ে বড় সংগঠন। পাকিস্তানের আফগান সীমান্ত অঞ্চলে ও পাকিস্তানী মোল্লাদের মাঝে এর প্রভাব ব্যাপক রয়েছে। অবশ্য পাকিস্তান নিজেই ধর্মভিত্তিক জঙ্গী তৈরীর সবচেয়ে বড় কারখানা হয়ে আছে। পাকিস্তানের জামাতে ইসলামি নিজেও একটি ইসলামি জঙ্গীবাদি সংগঠন। কাশ্মির, ভারততো আছেই বাংলাদেশেও পাকিস্তানীরা ইসলামি জঙ্গী রপ্তানী করে। লন্ডনের ট্রেন ও বাসে বোমা হামলায় পাকিস্তানী জঙ্গীরা জড়িত ছিলো। অভিযোগ আছে যে, মিয়ানমারের আরাকান অঞ্চল ও থাইল্যান্ডের মুসলিম অধ্যুষিত এলাকাতেও পাকিস্তান মুসলিম জঙ্গীদেরকে সহায়তা করে থাকে। বাংলাদেশে পাকিস্তানী গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআই-এর তৎপরতা থাকার পাশাপাশি পাকিস্তানী জঙ্গীদের তৎপরতা

থাকা ছাড়াও বাংলাদেশকে ভিত্তি করে ভারতে জঙ্গী হামলার বিষয়েও ভারতের অভিযোগ রয়েছে। বাংলাদেশে মিয়ানমার ও ভারতীয় জঙ্গী সংস্থাগুলোর ঘাটি আছে এমন অভিযোগও পাওয়া যায়।

বাংলাদেশ একটি মুসলিমপ্রধান দেশ। সেজন্য অন্তর ও বাইর থেকে এখানেও মুসলিম জঙ্গীবাদের প্রসারের তৎপরতা বিরাজ করে। এইসব তৎপরতা বিষয়ে অতীতের কোন সরকারই সঠিকভাবে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। ২৭ বছর ধরে জিয়া-এরশাদ-খালেদা সরকারসমূহ ইসলামি জঙ্গীবাদী কর্মকাণ্ডকে সহায়তা করেছে। তবে আমরা ভাগ্যবান যে, এখানে ধর্মান্ধতা, মৌলবাদ ও উগ্র জঙ্গীবাদ কখনোই কোন পর্যায়ের জনসমর্থন পায়নি। জামাতে ইসলামিসহ ইসলামি দলগুলোর স্বল্প ভোটপ্রাপ্তি এই বক্তব্যের সত্যতা প্রমাণ করে।

পক্ষান্তরে অনাদিকাল থেকে এদেশে হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রীস্টান ধর্মাবলম্বীরা পাশাপাশি বসবাস করে আসছে। ঐতিহাসিক কাল থেকেই এখানে ধর্মীয় সহিষ্ণুতা বিরাজ করছে। প্রত্যেকেই পূর্ণ স্বাধীনতায় নিজ নিজ ধর্ম চর্চা করতে পারছে। সংবিধানে অনেক কাট ছাট ও পরিবর্তন করার পরও বাংলাদেশ রাষ্ট্র তার প্রকৃত চরিত্র একেবারে বদলায়নি। এখানে বিশেষ কোন ধর্মকে ভিত্তি করে কারো প্রতি অন্যায়-অবিচার বা অসাম্য সৃষ্টি করা হয়না। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ, দেশের ৭১ সালের সংবিধান ও সকল রাষ্ট্রীয় আইন সেই স্বাধীনতা ও সাম্য নিশ্চিত করে। কিন্তু কিছুসংখ্যক লোক নিজেদের হীন রাজনৈতিক স্বার্থে সাম্প্রদায়িকতা সৃষ্টি করার চেষ্টা করে আসছে। কেবল হিন্দু-মুসলমান ইস্যু নয়, মুসলমান-মুসলমান প্রসঙ্গে কাদিয়ানীদের ওপর ব্যাপক জঙ্গী হামলা করা হয়। এটি কার্যত পাকিস্তানী রাজনীতির ধারাবাহিকতা। পাকিস্তানে মওদুদীবাদ এবং কাদিয়ানী বিরোধীতার পাশাপাশি শিয়া-সুন্নী, বিহারী-অবিহারী দাঙ্গাও ভয়ংকর রূপ নিয়ে আছে। ভারত বিরোধীতা এবং ইসলাম গেল-এই শ্লোগান দিয়ে পাকিস্তানী জঙ্গী শাসকরা যেভাবে পাকিস্তান আমলে পাকিস্তানের সাধারণ মানুষ এবং বাঙ্গালীদের ন্যায্য অধিকার ও জীবন সংগ্রামের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করছিলো, মরহুম জিয়া, স্বৈরশাসক এরশাদ এবং বিএনপি ও চারদলীয় জোটের শরীকসহ ধর্মান্ধরা সাতাশ বছর ধরে তাই করে আসছিলো। এদের আশ্রয়-প্রশ্রয়ে দেশে ধর্মীয় জঙ্গীবাদেরও চরম উত্থান ঘটেছে। দেশব্যাপী একের পর এক নারকীয় জঙ্গী হামলা এবং জঙ্গীদের ফাঁসি ধর্মভিত্তিক রাজনীতিরই অনিবার্য পরিণাম। পাকিস্তান শাসনামলে ৫২-এর ভাষা আন্দোলন, বাঙ্গালীর ভাষা-সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চা, ছয় দফা, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা ইত্যাদিতো বটেই স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়ও 'বাংলাদেশের স্বাধীনতার নামে ইসলাম ও ইসলামি রাষ্ট্রকে ধ্বংস করা হচ্ছে' এমন বিভ্রান্তিকর প্রচারণা চালানো হয়েছে। কিন্তু সৌভাগ্য আমাদের যে, এদেশে সাধারণ মানুষের কাছে ধর্ম পরম প্রিয় বিষয় হলেও ধর্মীয় জঙ্গীবাদ এবং ধর্মভিত্তিক রাজনীতি কখনো শেকড় গাড়তে পারেনি।

সদ্যবিদায়ী সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার চারদলীয় জোটের শাসনকালে হিন্দু ও কাদিয়ানীদের উপর একদল ধর্মান্ধ লুটেরার সীমাহীন নারকীয় অত্যাচার ইতিহাসের সকল সীমা অতিক্রম করেছে। তারা মুসলমান অথচ ভিন্ন মতাবলম্বী হিসেবে চিহ্নিত করে কাদিয়ানীদের বাড়ীঘর জ্বালিয়েছে। লুটপাট করেছে তাদের সহায় সম্পদ। যেসব এলাকায় এই ভিন্ন মতাবলম্বীরা বসবাস করতো সেখানে তাদেরকে একঘরে করে রেখেছে। তাদের উপাসনালয়ে হামলা করার পুনপৌণিক চেষ্টা হয়েছে। সেই সময়ে এমনকি নিজামী-খালেদা জিয়ার পুলিশ পর্যন্ত কাদিয়ানিদের উপাসনালয়ের সাইনবোর্ড বদল করে দিয়েছে। ধর্মান্ধদের দাবি ছিলো, কাদিয়ানীদের অমুসলিম ঘোষণা করা। এজন্য তারা বছরের পর বছর কাদিয়ানীদের ওপর ক্রমাগত চাপ সৃষ্টি করে রেখেছে।

এদের জন্য ধর্মীয় ভিন্নমত ও অন্যধর্ম নিয়ে এদেশে সংখ্যালঘুদের বসবাস কঠিন হয়ে পড়ে। অন্যদিকে ভিন্ন ধর্মালম্বী হিন্দুরা পড়েছে চারদলীয় জোটের লুটেরাদের কবলে। খালেদা জিয়ার শাসনকালে রাজনৈতিক কারণে হিন্দুদের ওপর অত্যাচার ও নির্যাতন অতীতের সকল রেকর্ড অতিক্রম করে। এর আগে জিয়া বা এরশাদের আমলে হিন্দুদের ওপর নির্যাতন হলেও খালেদার শেষ আমলটি ছিলো অন্ধকার যুগের মতো। পাকিস্তানী হায়েনাদের মতো হিন্দুদের বাড়ীঘর জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে দেয়া, লুটপাট করা, মাহিমা-পূর্ণিমার মতো কিশোরীদের ধর্ষণ করা, চট্টগ্রামের বাশখালিতে সংঘটিত ঘরের ভেতরে রেখে আগুন দিয়ে সবংশ পুড়িয়ে মারা এবং চাটগার গোপাল কৃষ্ণ মুহুরীর মতো শিক্ষককে খুন করা ছাড়াও দেশব্যাপী হিন্দুদের বাড়ী-ঘর-ব্যবসা প্রতিষ্ঠান দখল করা ছিলো এই আমলের প্রাত্যহিক ঘটনা। চারদলীয় জোটের লুটেরারা সন্ত্রাসী দিয়ে এসব কাজ করেছে এবং নিজেরা নেতৃত্ব দিয়েছে এসব অপকর্মের। খালেদা জিয়ার সরকার এসব অপরাধের দমন বা কোন বিচারই করেনি। বরং এই সাম্প্রদায়িকতা পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছে খালেদা জিয়ার সরকার, দল এবং প্রশাসন থেকে। ফলে এটি নিশ্চিত করে বলা যায় যে, সাধারণ মানুষের মাঝে ধর্মীয় সহাবস্থান থাকলেও খালেদা জিয়ার সময়ে এদেশে ধর্মীয় সম্প্রীতি বিনষ্ট হয় ধর্ম ব্যবহার করে ধর্মান্ধ রাজনীতি করার ফলে।

এদেশে ধর্ম একটি সংবেদনশীল বিষয় হিসেবে রাজনীতিতে বহুলভাবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। পাকিস্তান সৃষ্টি থেকে এর সূচনা। স্বাধীনতার পর এদের রাজনীতি নিষিদ্ধ ঘোষণা করার পরও ৭৫ পরবর্তীকালে জামাতে ইসলামিসহ ধর্মান্ধ কিছু রাজনৈতিক দল বাংলাদেশের স্বাধীনতার মূল ঘোষণার বিপক্ষে মুসলিম বাংলা, ইসলামি প্রজাতন্ত্র, ইসলামি শাসন, আল্লাহর আইন ইত্যাদি লক্ষ্য নিয়ে প্রকাশ্যে রাজনীতি করর অনমুতি ও বৈধতা পায়। এদের ঘোষিত নীতি ও আদর্শ সরাসরি রাষ্ট্রদ্রোহিতার শামিল। এরা দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব মানেনা। গণতন্ত্র এদের লক্ষ্য নয়। এরা দেশের সংবিধানের মৌলিক বিষয়গুলোর সাথে স্পষ্ট বিরোধীতা করে। এদের কাছে ভাষা আন্দোলন, শহীদ দিবস, ছয় দফা, স্বাধীনতা অর্জন, স্মৃতিসৌধ, মুক্তিযোদ্ধা এসবের কোন মূল্য নেই। তারা এখনো পাকিস্তানে বিশ্বাস করে। এদেশের সাধারণ মানুষের ধর্মপ্রাণতার সুযোগ নিয়ে ধর্মান্ধ দলগুলোর এই কার্যক্রম দেশের রাজনীতিতে এক চরম সংকট তৈরী করেছে। তবুও বিগত পয়ত্রিশ বছরের মাঝে ২৭ বছরই তারা সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছে।

৭৫ সালে বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুর পর জিয়া-এরশাদ-খালেদা বাংলাদেশবিরোধী রাজাকার-আলবদরদের সংগঠিত ও পুনর্বাসন করেন। জিয়া রাজাকারদেরকে সরাসরি তার নিজের মন্ত্রীসভায় অন্তর্ভুক্ত করেন। এমনকি শাহ আজিজের মতো চিহ্নিত বাংলাদেশ বিরোধী পাকিস্তানপন্থীকে জিয়া প্রধানমন্ত্রী বানান। কার্যত ধর্মভিত্তিক রাজনীতি ও মৌলবাদের সূচনা করেন জেনারেল জিয়া। এটি ছিলো একজন মুক্তিযোদ্ধার পক্ষ থেকে মুক্তিযুদ্ধবিরোধী একটি জঘন্য কাজ। কে এম সোবহানের মতে, “জিয়া বঙ্গবন্ধুর কৃপাধন্য ছিলেন। বঙ্গবন্ধু তাকে রেকর্ড সময়ে মেজর থেকে মেজর জেনারেল পদে উন্নীত করেন। তখন তিনি বঙ্গবন্ধুর প্রশংসায় অন্ধ ছিলেন। বঙ্গবন্ধুর হত্যার পেছনে জেনারেল জিয়ার ভূমিকা ছিল তা অত্যন্ত পরিষ্কার ভাষায় লেখা আছে এন্থনি ম্যাসকারেনহাসের ‘লিগ্যাসি অব ব্লাড’ পুস্তকে। জেনারেল জিয়া বাংলাদেশ থেকে ধর্মনিরপেক্ষতা বিদায় করেন। তিনি বাংলাদেশের সংবিধান সংশোধন করে সংবিধানের ১২ অনুচ্ছেদ বাতিল করে বাংলাদেশের রাজনীতিতে ধর্মীয় দলগুলোকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে সাজানো নির্বাচনে তাদের ৬টি আসন দিয়ে সংসদ সদস্য হওয়ার সুযোগ করে দেন। ’৭৯ সালের নির্বাচনের পর থেকে বাংলাদেশের রাজনীতিতে আবার ধর্মভিত্তিক দলগুলো প্রবেশ করে।” (যুগান্তর ২০ এপ্রিল ২০০৭)

এরশাদও জিয়ার পথেই চলেন। তার চারপাশে নীতি নির্ধারণ পর্যায়ে-দলে-মন্ত্রীসভায় বাংলাদেশবিরোধীরাই দাপটের সাথে বিচরণ করেছে। এরশাদ জিয়ার চাইতে আরো একধাপ আগে বেড়ে ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম ঘোষণা করে। এরপর খালেদা জিয়া এরশাদের জুতাতেই পা ঢোকান। তিনি বিশেষ করে ২০০১ সালের নির্বাচনে জিতে এই ঘাতকদের নিয়ে সরকার গঠন করেন। নিজামী-মুজাহিদদেরকে মন্ত্রীসভায় বসিয়ে খালেদা পাঁচ বছর দেশ শাসন করেন। বলা যায়, শুরু থেকেই এরশাদ এবং খালেদার রাজনীতি ছিলো মানুষের ধর্মপ্রাণতা এবং তার সাথে ভারতবিরোধীতাকে যুক্ত করে। এরা দুজনেই ধর্মান্ধ রাজনৈতিক সংগঠন জামাতে ইসলামিকে আর্থিকভাবেও সহায়তা করেছেন। দেশের অন্যতম প্রধান অর্থনীতিবিদ এবং অর্থনীতি সমিতির সাধারণ সম্পাদক প্রফেসর ড. আবুল বারকাত তার গবেষণালব্ধ একটি পুস্তিকায় প্রকাশ করেছেন, জামাতে ইসলামী বিভিন্ন ব্যবসা থেকে বছরে নিট আয় করে ১২০০ কোটি টাকা। এই ব্যবসার অধিকাংশই জোট সরকারের শরিক থাকাবস্থায় ক্ষমতার অপব্যবহার করে এসব ব্যবসা শুরু করেছে, না হয় পৃষ্ঠপোষকতা করেছে। এরশাদ আমলেও এসব ব্যবসার পৃষ্ঠপোষকতা করা হয়। এইসব ব্যবসার সঙ্গে যারা যুক্ত তারা সবাই কোন না কোনভাবে ক্ষমতার অপব্যবহার ও দুর্নীতির সাথেও জড়িত।

কার্যত বিগত ৩৫ বছরের মাঝে ২৭ বছরের লালন পালনের পরিণামে দেশ এখন মৌলবাদের আখড়ায় পরিণত হয়েছে। ১১ জানুয়ারি জরুরী অবস্থা জারির পর দেশে সকল ক্ষেত্রেই একটি নতুন সম্ভাবনা তৈরী হয়েছে। দুর্নীতি থেকে শুরু করে রাজনীতি পরিষ্কার করার সকল কাজেই একটি দৃঢ় পদক্ষেপ আমরা দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিয়ে কোন কার্যকর পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে না। বলা হয়েছে, নির্বাচন কমিশন ধর্মীয় উপাসনালয়ে নির্বাচনী প্রচারণা নিষিদ্ধ করবে। (প্রথম আলো, ২০ এপ্রিল ২০০৭) এটি আদৌ কোন বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নয়। ধর্মভিত্তিক রাজনীতি বহাল রেখে এই ব্যবস্থা নেয়া হলে বরং সাপ জীবন্ত রেখে লেজ মারার শামিল হবে। এর ফলে বাংলাদেশের রাজনীতিতে ধর্মভিত্তিক সাম্প্রদায়িকতার লিগ্যাসি পাকাপোক্তভাবে টিকিয়ে রাখা হবে।

বাংলাদেশে ধর্মভিত্তিক রাজনীতির জন্য জঙ্গীবাদের সাথেও পুরো দেশটিকেই যুদ্ধ করতে হচ্ছে। আমাদেরকে বুঝতে হবে যে, জঙ্গীবাদ ও ধর্মভিত্তিক রাজনীতি একসূত্রে গাথা। ফলে কেবল ধর্মীয় উপাসনালয়ে নির্বাচনী প্রচারণা নিষিদ্ধ করলেই কোন সুফল পাওয়া যাবেনা। প্রথমেই ধর্মভিত্তিক রাজনীতি সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করতে হবে। এছাড়া ধর্মীয় জঙ্গীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবার পাশাপাশি মৌলবাদের শেকড় উপড়ে ফেলা এবং ধর্মভিত্তিক রাজনীতির মূল নষ্ট করার জন্য প্রয়োজন হবে আরো কিছু সুনির্দিষ্ট কাজ করা।

অন্য অনেক কাজের মাঝে আমি শুধুমাত্র একটি বিষয়ের প্রতি এখানে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। যেসব কারখানায় ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক কর্মী এবং জঙ্গীদের জন্ম হয় তার নাম অনিবন্ধিত মাদ্রাসা। ব্রিটিশ আমল থেকেই এই অঞ্চলের মুসলমানদেরকে পশ্চাদপদ শিক্ষাদানের জন্য সবেচেয়ে বেশি অবদান রাখছে এই অনিবন্ধিত মাদ্রাসাগুলো। গরীব মানুষেরা অর্থের অভাবে এবং ধর্মপ্রাণ মানুষেরা ধর্মীয় অনভূতির কারণে এই মাদ্রাসাগুলোতে সন্তানদেরকে লেখাপড়া শেখার জন্য পাঠায়। মাদ্রাসাগুলোর সিলেবাসে দৈনন্দিন জীবন যাপন, ভাষা-সাহিত্য, অঙ্ক, ইতিহাস, ভূগোল ও বিজ্ঞান ইত্যাদি নেই। ইংরেজীতো দূরের কথা এমনকি কোন কোন মাদ্রাসায় মাতৃভাষাও পড়ানো হয় না। আমরা মনে করি, দেশের প্রচলিত মক্তবগুলোতে ধর্মশিক্ষার যে ব্যবস্থা আছে; কোরান, হাদিস, নামাজ শিক্ষা ইত্যাদি ওখানে যা পড়ানো হয় ধর্মচর্চার জন্য তাই যথেষ্ট। স্কুল পর্যায়ে অপশনাল বিষয় হিসেবে ধর্মশিক্ষা, আরবী-সংস্কৃত-পালি ইত্যাদি থাকতে পারে। তবে কেউ যদি ধর্ম বিষয়ে উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণ করতে চায় তবে সেজন্য বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে ধর্মের বিভিন্ন বিষয় পড়ানো হতে পারে। দেশের ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়টি এজন্য চমৎকার ভূমিকা পালন করতে পারে। অন্যান্য সরকারি ও বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোও এক্ষেত্রে বিভাগ খুলে উজ্জ্বল ভূমিকা পালন করতে পারে। তবে স্কুল পর্যন্ত বাংলাদেশের সকল মানুষের শিক্ষার ধারা হতে হবে একটিই।

অন্যদিকে ধর্মীয় উপাসনালয়গুলোর অপরিকল্পিত বিকাশকে পরিকল্পিত করতে হবে। জনসংখ্যা অনুপাতে তাদের ধর্মচর্চার ভিত্তিতে সরকারকে মসজিদ, মন্দির, গীর্জা, ঈদগাহ, কবরস্থান, শ্মশান ইত্যাদি তৈরী করে দিতে হবে। এইসব প্রতিষ্ঠানের নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ এবং কর্মচারীদের বেতন, বিদ্যুৎ বিল, পয়ঃ-পানির ব্যবস্থা ইত্যাদি রাষ্ট্রকেই করতে হবে। প্রতিটি মসজিদের সাথে মক্তব থাকবে যাতে ধর্মশিক্ষা প্রদান করতে হবে। এইসব মক্তবের শিক্ষকের বেতন ছাড়াও শিক্ষা উপকরণ সরকার সরবরাহ করবে। হিন্দুদের জন্য সংস্কৃত টোলের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

কর্মসূচি: রাষ্ট্র ইসলাম ধর্মসহ আদিবাসী বা সংখ্যালঘিষ্ঠ জনগণের ধর্মচর্চার অধিকার সংরক্ষণ করবে ও ধর্ম বিষয়ক গবেষণা উৎসাহিত এবং এর অনুশীলনে সবপ্রকার সহায়তা করবে। রাষ্ট্র তার সকল নাগরিককে তাদের নিজ নিজ ধর্ম চর্চা করার পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করতে দেবে এবং কোন নাগরিকের ওপর কোন ধর্ম চাপিয়ে দেবেনা বা কোন বিশেষ ধর্ম পালনে কাউকে বাধ্য করবেনা। ধর্মচর্চার জন্য প্রয়োজনীয় সকল সহায়তার পাশাপাশি ধর্মীয় অবকাঠামো পরিকল্পিত উপায়ে গড়ে তুলতে হবে। অপরিকল্পিত মন্দির মসজিদ-গীর্জার বদলে পরিকল্পিত বাসস্থানের মতোই জনসংখ্যার ভিত্তিতে বাসস্থান ও কর্মক্ষেত্রের সাথে ধর্মস্থান সরকারী ব্যয়ে নির্মাণ করতে হবে। রাষ্ট্র সকল ধর্ম প্রতিষ্ঠানের রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামতসহ সকল ব্যয়ভার বহন করবে। রাষ্ট্র প্রতিটি ধর্মচর্চার ক্ষেত্রে ভিন্নমতের সহ অবস্থানকে নিশ্চিত করবে। ধর্মীয় গোড়ামি প্রতিরোধ করার পাশাপাশি সঠিক ধর্মশিক্ষার ক্ষেত্রে রাষ্ট্র সহায়ক হবে।

ষষ্ঠ অগ্রাধিকার ॥ মেধাসম্পদ সৃষ্টি ও সুরক্ষা

মেধা সম্পদ কি: যদিও এই বিষয়টি নিয়ে অনেকগুলো সেমিনার হয়েছে এবং আমরা বারবার এর সংজ্ঞা উচ্চারণ করেছি তবুও আমাদেরকে যতোটা সম্ভব ভালো করে বারবার এটি বুঝতে হবে যে মেধা সম্পদ বলতে কি বোঝায়। ওয়াইপোর মতে, Intellectual property refers to creations of the mind: inventions, literary and artistic works, and symbols, names, images, and designs used in commerce.

অর্থাৎ মেধাসম্পদ মনের সৃষ্টি। এসব সৃষ্টি আবিষ্কার, সাহিত্য ও শিল্পকর্ম, প্রতীক, নাম, চিত্র ও বাণিজ্যিক ডিজাইনের মাঝে পরিস্ফূট। আমি ওয়াইপোর এই সংজ্ঞায় পরিপূর্ণভাবে তৃপ্ত নই। কারণ এটি কেবল যে মনের সৃষ্টির মাঝেই সীমিত তা হয়তো এখন আর বলা যাবেনা। মনে কিছু সৃষ্টি করলে কি সেটি মেধাসম্পদ হয়ে যায়। আমি মনে মনে একটি গান রচনা করলাম-সেটি কি মেধা সম্পদ? যতোক্ষন পর্যন্ত মনের ভাব প্রকাশ না পায় মেধার দ্বারা যখন সেটি সম্পদে পরিণত না হয় ততোক্ষণ পর্যন্ত সেটি মেধাসম্পদ নয়। বরং একে মেধা ও মনন নামক দুটি শব্দ দিয়ে সৃষ্ট বলে চিহ্নিত করা উচিত। মনের সাথে মেধার যোগসূত্র না হলে সেটি সম্পদে পরিণত হয়না। তাছাড়া আমরা যখন একটি জ্ঞানভিত্তিক সমাজের কথা বলি তখন একে কেবল বাণিজ্যিক ডিজাইনের বিষয় বলা ঠিক নয়। এটি এখন শিল্প, সমাজ ও অর্থনীতির মূল বিষয়ে পরিণত হয়েছে।

ওয়াইপোর মতে মেধাসম্পদ দুটি শ্রেণীতে বিন্যস্ত। এর একটি হলো শিল্প সংক্রান্ত এবং অন্যটি হলো কপিরাইট। আমি এর আগে লেখা একটি নিবন্ধে মেধাসম্পদ কতো প্রকার এবং কি কি সেইসব বিষয় উল্লেখ করেছি। সেই কারণেই বিস্তারিত না গিয়ে ওয়াইপো যেভাবে মেধাসম্পদকে দেখছে সেটি উল্লেখ করছি।

Intellectual property is divided into two categories: Industrial property, which includes inventions (patents), trademarks, industrial designs, and geographic indications of source; and Copyright, which includes literary and artistic works such as novels, poems and plays, films, musical works, artistic works such as drawings,

paintings, photographs and sculptures, and architectural designs. Rights related to copyright include those of performing artists in their performances, producers of phonograms in their recordings, and those of broadcasters in their radio and television programs.

এবার আমাদের আলোচ্য বিষয় হতে পারে যে ডিজিটাল বাংলাদেশ কর্মসূচী ঘোষণার পর সেই মেধাসম্পদকে আমরা কিভাবে দেখবো। ডিজিটাল বাংলাদেশ কর্মসূচিতে এই মেধাসম্পদ কিভাবে রয়েছে সেটি আমরা দেখতে পারি। আমার লেখা ডিজিটাল বাংলাদেশ কর্মসূচির শুরুতেই বলা হয়েছে, "জ. ডিজিটাল যুগের অন্যতম লক্ষ্য হলো অধিকতর মেধাসম্পদ তৈরী, সংরক্ষণ ও বিকাশ করা।"

সেই কর্মসূচির অগ্রাধিকার হিসেবে বলা হয়েছে, "ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার অন্যতম অগ্রাধিকার হতে হবে জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতি ও উৎপাদন ব্যবস্থা গড়ে তোলা। এজন্য আর্থিক প্রশাসন, রাজস্ব আয় ও ব্যয় ব্যবস্থাপনা, বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন এবং ডিজিটাল কমার্স-এর জন্য ডিজিটাল প্রযুক্তি প্রয়োগ করতে হবে। অর্থনীতি, ব্যবসা-বাণিজ্য-শিল্প সর্বত্র লেন-দেন থেকে যন্ত্রপাতিতে থাকতে হবে ডিজিটাল পদ্ধতি। মেধাভিত্তিক শিল্পের বিকাশ ঘটাতে হবে এবং জাতীয় মেধা সংরক্ষণ ও বিকাশ ঘটানোর পাশাপাশি বিজ্ঞান চর্চা, আবিষ্কার ও গবেষণায় প্রাধান্য দিতে হবে।"

এছাড়াও ডিজিটাল বাংলাদেশ কর্মসূচির মাঝে স্পষ্ট করে বলা আছে, "৩.১১ ॥ বাংলাদেশের শিল্পসমূহ কৃষিভিত্তিক, ভোক্তা বা লাইফ স্টাইলভিত্তিক এবং জ্ঞানভিত্তিক হিসেবে বিবেচিত হবে। কৃষিভিত্তিক শিল্পের প্রধানতম উদ্দেশ্য হবে দেশের কৃষিসম্পদের উন্নয়ন, কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াকরণ, দেশবাসীর খাদ্যের যোগান দেয়া এবং উদ্বৃত্ত কৃষিপণ্য রপ্তানী করা। ভোক্তা বা লাইফস্টাইল ভিত্তিক শিল্প মানুষের দৈনন্দিন প্রয়োজন, জীবন যাপনের মানবৃদ্ধি এবং সমৃদ্ধি ও সহায়তার জন্য গড়ে উঠবে। শিল্প কারখানাকে রাজধানী বা মেট্রোসিটির বদলে জেলা, উপজেলা এবং গ্রামে স্থাপন করতে হবে। কৃষি ও জ্ঞানভিত্তিক শিল্প স্থাপনে গ্রামই হবে আদর্শ স্থান। দৈনন্দিন ভোক্তা পণ্য গ্রামেই উৎপাদিত হবে। প্রতি দশ হাজার মানুষের জন্য একটি করে ক্ষুদ্র শিল্প প্লট থাকতে হবে। উপজেলা ও জেলায় একটি শিল্প এলাকা থাকতে হবে। সরকার শিল্পখাতে ব্যাপক সহায়তা প্রদান করবে। সরকার শিল্পের বিকাশের অনুকূল শিল্পনীতি থাকা ছাড়াও শিল্প স্থাপনে জমি, সরঞ্জামাদি এবং অর্থের যোগান দেবে। দেশে উপযুক্ত স্থানে হাইটেক পার্ক, শিল্প পার্ক, সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক, গার্মেন্টস পল্লী, চামড়া পল্লী ইত্যাদি স্থাপন করা হবে। ভেনচার ক্যাপিটাল ও ইক্যুইটি এন্টারপ্রনেরশিপ ফান্ডের ব্যবস্থা করতে হবে। একই সাথে রপ্তানী সহায়তা ও ক্ষুদ্র-মাঝারি উদ্যোক্তা তহবিল গড়ে তুলে সরাসরি উদ্যোক্তাদের সহায়তা করতে হবে।

জ্ঞানভিত্তিক শিল্প ও সেবার ভিত্তি হবে মেধাভিত্তিক। পূর্বোক্ত খাতসমূহে প্রযুক্তি সরবরাহ, উচ্চতর প্রযুক্তির জন্য গবেষণা, তথ্যপ্রযুক্তি ভিত্তিক ব্যবস্থাপনা ও দুর্নীতিরোধ ছাড়াও রপ্তানি আয় এই খাতের অন্যতম লক্ষ্য হবে। মেধা সৃষ্টি ও সুরক্ষার জন্য ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে"

এতে লক্ষ্য হিসেবে মেধার সৃষ্টি এবং সুরক্ষার কথা বলা হয়েছে। মেধার সৃষ্টি ও বিকাশকে অগ্রাধিকার দেবার কথা বলা হয়েছে। অন্যদিকে শিল্প কল-কারখানাকে মেধাভিত্তিক করার কথা বলা হয়েছে।

ডিজিটাল বাংলাদেশ কর্মসূচিতে মেধাকে এতোটা গুরুত্ব দেবার প্রধান কারণ হচ্ছে ডিজিটাল যুগে জাতীয় আয়ের বৃহৎ অংশ বা এক সময়ে প্রায় পুরোটাই আসবে মেধা থেকে। এখনই বহু জাতির জাতীয় আয়ের বেশ বড় অংশ মেধাসম্পদ থেকে আসে। উন্নত দেশগুলো এখন এই পর্যায়ে পৌছেছে। এখনই কোন কোন বেসরকারি কোম্পানীর সকল বা আংশিক আয় মেধাসম্পদ থেকে হয়ে থাকে। অতি সামান্য কয়েক বছরের মাঝে আমরা এই আয়কে আকাশ ছুতে দেখবো।

শিল্প যুগ থেকে এর বিকাশ এতো দ্রুত হতে থাকে এবং ডিজিটাল যুগে এর সম্প্রসারণ এতা বেশি হবে যে কোন জাতি মেধাসম্পদকে গুরুত্ব না দিয়ে টিকে থাকতে পারবেনা। এমনকি কোন জাতি যদি তার নিজের মেধাকে কাজে লাগিয়ে যথাযথভাবে পণ্য বা সেবা উৎপাদন করতে না পারে তবে তাকে ধার করা মেধার জন্য এমন চরম মূল্য দিতে হবে যা তার অস্তিত্বকে হুমকির মুখে ফেলে দেবে।

মেধাসম্পদ সৃষ্টি না করলে শুধুমাত্র একটি খাতে আমরা কি ভয়ংকর বিপর্যয়ের মুখে পড়তে পারি এখানে সেটি উল্লেখ করতে পারি। ২০১৬ সালের পর আমাদের ঔষধ কোম্পানীগুলো যদি বিদেশি কোম্পানীগুলোর কাছ থেকে প্যাটেন্ট অধিকারের লাইসেন্স নিয়ে ঔষধ বানায় তবে আমাদের ঔষধের দাম বহুগুণ বেড়ে যাবে। এছাড়াও প্যাটেন্ট আইনটি আপডেটেড না হবার ফলে সফটওয়্যার খাত এই আইনের সহায়তা নিতে পারছেনা।

অন্যান্য শিল্পখাতেও আমরা কোন ধরনের আবিষ্কার করছি না। আবিষ্কারের জন্য যে গবেষণার প্রয়োজন তার জন্য আমাদের বরাদ্দ নেই। আমরা বিজ্ঞান চর্চা করিনা-একে উৎসাহিত করিনা। ডিজিটাল বাংলাদেশ বানাতে হলে এই অবস্থার আমূল পরিবর্তন দরকার।
অন্যদিকে আমরা প্রায় প্রতি বছর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কালো তালিকার সুপারিশে যাচ্ছি এবং হাত পা ধরে মুক্ত হচ্ছি। আমরা তাদেরকে দেখানোর জন্য তথাকথিত কপিরাইট টাস্কফোর্স তৈরী করেছি এবং কোনমতে ফাঁকি দিয়ে চলার চেষ্টা করছি। কপিরাইট ভঙ্গ করার বিরুদ্ধে কোন ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছেনা। এটি অনেকটাই আত্মপ্রবঞ্চনার মতো। টাস্কফোর্স কেবল সভার পর সভা করছে-কিন্তু আইন ভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে কিছুই করছেনা। পুলিশের চোখের সামনে, র‌্যাবের নাকের ডগায় এমনকি টাস্কফোর্সের সদস্যদের সম্পদ পাইরেসি হচ্ছে কিন্তু তার বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছেনা। এর ফলে বিদেশীদের দশা যাই হোক দেশীয় সফটওয়্যার শিল্প মুখ থুবড়ে পড়েছে। এক সময়ে এদেশে ছোটখাটো মাল্টিমিডিয়া সফটওয়্যার তৈরী হতো। এখন সেইসব আর তৈরী হয়না। এর প্রধান কারণ পাইরেসি। মুভি ও গানের শিল্প খাতটি মৃত্যুপথযাত্রী। যদি বর্তমান অবস্থা চলতে থাকে তবে দুয়েক বছরের মাঝেই আমরা এসব খাতে দেওলিয়া হয়ে যাবো। প্রকাশনা শিল্পেও পাইরেসি ঝাকিয়ে বসেছে। এটিও যে কোন দিন মারা যাবে।
পরিশেষে আমরা এই কথাটি খুব ভালোভাবেই বলতে পারি যে, পাইরেসি ডিজিটাল বাংলাদেশের সাথে যেতে পারে না। এমনকি অন্যের মেধার ওপর নির্ভর করাও ডিজিটাল বাংলাদেশের কাম্য নয়। বরং ডিজিটাল বাংলাদেশের স্বপ্ন পূরণ করতে হলে মেধাসম্পদ সৃষ্টি করতে হবে, জাতীয় আয়ে মেধাসম্পদ থেকে উৎপাদিত পণ্যের ভাগ বাড়াতে হবে এবং সকল মেধাসম্পদ সুরক্ষা করতে হবে।
১২ জুন ২০০৯

চতুর্থ অধ্যায়
ডিজিটাল বাংলাদেশ কেমন করে

নানা সময়ে ডিজিটাল বাংলাদেশ কর্মসূচি, ডিজিটাল বাংলাদেশ কেন এবং এর রাজনৈতিক প্রেক্ষিতটি কি সেইসব নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এখন সময় হয়েছে ডিজিটাল বাংলাদেশ নির্মাণ করার জন্য কি কাজ করা উচিত এবং এর রোড ম্যাপ বা কর্মপরিকল্পনা কি তা নিয়ে কথা বলা। আমাদের মনে রাখা দরকার ডিজিটাল বাংলাদেশ ধারণাটি জনপ্রিয় হবার প্রেক্ষিতে শুধু যে এর ধারণা, নেপথ্য কাহিনী বা কর্মসূচী সম্পর্কে আগ্রহের পাশাপাশি এই ধারনাটি বাস্তবায়ন করার জন্য কি করা উচিৎ বা এর মহাপরিকল্পনা প্রস্তুত করা, রোডম্যাপ ঘোষণা করা এবং কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করার প্রতি মানুষের আগ্রহ রয়েছে।

এই আগ্রহগুলোর মাঝে প্রথমেই যে বিষয়টি আলোচিত হচ্ছে সেটি হলো আওয়ামী লীগ তার নিজের ভাবনায় ডিজিটাল বাংলাদেশকে কিভাবে স্পষ্ট করেছে। আওয়ামী লীগের ইশতেহার প্রণেতারাও বারবার উল্লেখ করেছেন যে, তাদের ইশতেহারে ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার বিষয়টি বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হয়নি। একটি কথা শুরুতেই বলে রাখা ভালো; আমরা আওয়ামী লীগের ইশতেহারে যেভাবে আকস্মিকতার মাঝে ডিজিটাল বাংলাদেশ শব্দটিকে আসতে দেখেছি তাতে অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে ডিজিটাল বাংলাদেশ বিষয়ে তেমন কিছু নেই যা অন্য সকল ক্ষেত্রে রয়েছে-এটি সত্য। আমি এই ইশতেহারের প্রণেতাদের সাথে কথা বলে দেখেছি যে তারা এই বিষয়টি নিয়ে তেমনভাবে ভাবেননি বা তেমন গভীরে যাবার সময় পাননি। ইশতেহারের অংশবিশেষ, তথ্যপ্রযুক্তি প্রনয়ণ করার সাথে জড়িত থাকার সুবাদে আমি নিজেও এই কথাটি বলতে পারি যে সেই ভাবনার লিপিবদ্ধকরণ তখন সম্ভব ছিলোনা। কিন্তু তার পরেও বিচ্ছিন্নভাবে হলেও ইশতেহারের নানা অংশে ডিজিটাল বাংলাদেশের অনুসঙ্গ তথ্যপ্রযুক্তি বিষয় হিসেবে প্রকাশিত হয়েছে। যেহেতু একটি সরকার তার নিজের নির্বাচনী ইশতেহার বাস্তবায়নের জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ থাকে সেহেতু আমি শুরুতেই প্রকাশিত নির্বাচনী ইশতেহারে ডিজিটাল বাংলাদেশের ভাবনার কতোটা প্রতিফলন হয়েছে সেটি আগে উল্লেখ করতে চাই।

এটি বাস্তবতা যে নির্বাচনী ইশতেহারে ডিজিটাল বাংলাদেশ নামক কোন অনুচ্ছেদ নেই। আওয়ামী লীগ বা সরকারের নেতৃবৃন্দ নিজেরাও এ বিষয়ে স্পষ্ট কথা বলেন না। কিন্তু যদি আমরা একটু গভীরভাবে নির্বাচনী ইশতেহারটি পাঠ করি তবে এতে ডিজিটাল বাংলাদেশের অনেক অনুসঙ্গ পাবো।

রূপকল্প ২০২১: প্রথমেই রূপকল্পের কথা বলা যায়। আওয়ামী লীগের ইশতেহারে বর্ণিত রূপকল্প ২০২১ এ যেসব বিষয় রয়েছে তা হলো ক) ২০২১ সালে প্রাথমিক স্তরে শতকরা একশো ভাগ ভর্তি এবং সকলের জন্য সুপেয় পানির ব্যবস্থা করা খ) ২০১৩ সালের মাঝে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন, প্রতি বাড়ীতে স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশন ব্যবস্থা প্রদান, বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার শতকরা ৮ শতাংশ করা এবং বিদ্যুতের সরবরাহ সাত হাজার মেগাওয়াটে উন্নীত করা গ) ২০১৫ সালে বিদ্যুতের সরবরাহ ৮ হাজার মেগাওয়াট করা ঘ) ২০১৭ সালে বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার শতকরা ১০ ভাগ করা।

রূপকল্পের ২০১১, ১৩, ১৫ ও ১৭ সালের সময়সীমার পর ২০২১ সালই হচ্ছে সবচেয়ে বড় মাইলফলক। এতে বলা হয়েছে যে ২০২১ সালের মধ্যে ১) জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার শতকরা ১৫ ভাগ থেকে শতকরা ১ ভাগে নামিয়ে আনা ২) জাতীয় আয়ের হিস্যা কৃষিতে ২২ থেকে ১৫, শিল্পে ১৮ থেকে ৪০ ও সেবাতে ৫০-এর বদলে ৪৫ শতাংশ করা ৩) বেকারত্বের বর্তমান হার শতকরা ৪০ থেকে ১৫ ভাগে নামিয়ে আনা ৪) কৃষিতে শ্রমশক্তি ৪৮ ভাগ থেকে ৩০ শতাংশে নামিয়ে আনা ৫) শিল্পে শ্রমশক্তি ১৬ থেকে ২৫ ভাগে উন্নীত করা ও সেবাখাতে বর্তমান ৩৬ শতাংশ থেকে ৪৫ শতাংশে উন্নীত করা ৬) দারিদ্রের হার ৪৫ শতাংশ থেকে ১৫ শতাংশে নামিয়ে আনা ৭) ৮৫ শতাংশ নাগরিকের জন্য পুষ্টি চাহিদা পূরণ ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য ন্যূনতম ২১২২ কিলো ক্যালোরি খাদ্যের যোগান দেয়া ৮) সকল প্রকার সংক্রামক ব্যাধি নির্মূল করা ৯) গড় আয়ুষ্কাল ৭০-এ উন্নীত করা। ১০) শিশু মৃত্যুর হার শতকরা ৫৪ থেকে কমিয়ে শতকরা ১৫ নামিয়ে আনা ১১) মাতৃমৃত্যুর হার শতকরা ৩.৮ থেকে শতকরা ১.৫ এ নামিয়ে আনা এবং প্রজনন নিয়ন্ত্রন শতকরা ৮০ ভাগে উন্নীত করা।

লক্ষ্য করা যায় যে, একই রূপকল্পটি জীবনমান উন্নয়নের অঙ্গীকার। বেকারত্ব দূর করা, দারিদ্র্য দূর করা, খাদ্য উৎপাদন ও যোগান দেয়া, স্বাস্থ্য সেবা প্রদান এবং জাতীয় আয় বৃদ্ধিই হচ্ছে রূপতল্পের মূলকথা। বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের জন্য প্রয়োজনটি এখানেই। তাদের স্বপ্নটাও এখানেই। এর সাথে ন্যূনতম প্রাথমিক শিক্ষার অঙ্গীকার রয়েছে। ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার বিষয়টিকে আমরা এসব অঙ্গীকারের বাইরে নিতে পারিনা। যদি রূপকল্পে ন্যূনতম আবাসনের কথা থাকতো, যদি ন্যূনতম বস্ত্রের চাহিদা পূরণের কথা থাকতো তবে আমরা বলতে

পারতাম, এটি মানুষের ন্যূনতম মৌলিক চাহিদা পূরণের অঙ্গীকার। যদি রূপকল্পে বৈষম্য দূরীকরণ বিষয়ে স্পষ্ট করে অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হতো তবে ডিজিটাল বাংলাদেশ স্বপ্নের আরও অনেক কিছু এর ভেতরে যেতে পারতো।

রূপকল্পে বিদ্যুতের চাহিদার কথা বলা হয়েছে। আমরা সবাই জানি বিদ্যুৎ জাতীয় সমস্যা। সূতরাং এর কথা বলতেই হবে। তবে সংজ্ঞাহীনভাবেই ডিজিটাল বাংলাদেশের কথা বলা হয়েছে।

যাহোক, এটি বিস্ময়কর মনে হতে পারে, যে রূপকল্পে বাংলাদেশকে ডিজিটাল বাংলাদেশ হিসেবে পরিচিত করার কথা বলা হয়েছে, একেবারে সরাসরি ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়নি। সরকার ব্যবস্থা, গণতন্ত্র, সুশাসন, রাজনৈতিক সংস্কৃতি, দুর্নীতি, নারীর ক্ষমতায়ন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শিল্প, জ্বালানি নিরাপত্তা, ভৌত অবকাঠামো, আবাসন, পরিবেশ, পানিসম্পদ, পররাষ্ট্র, সংস্কৃতি ইত্যাদির কথা রূপকল্প ২০২১-এর আওতায় রয়েছে। শুধু বুলেট আকার কিছু বিষয়ের মাঝে "ডিজিটাল বাংলাদেশ" নামের একটি বাক্য রয়েছে। এই প্রসঙ্গে আমি ইশতেহারের অন্যতম প্রণেতা বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের তত্য ও গবেষণা সম্পাদক জনাব নূহ উল আলম লেনিনের সাথে কথা বরেছি এবং তিনি এটি বলেছেন যে সরাসরি ডিজিটাল বাংলাদেশ শব্দটিকে ডিজিটাল বাংলাদেশ হিসেবে পরিচতি করার পরিবর্তনটি তিনি করেন। তার ধারণা ছিলো যে এর ফলে বাক্যটিকে একটু নরম করা হলো। তবে এখন বোধহয় পরিচিত করার বিষয়টি আর নেই। সবাই ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করতে চায়।

ইশতেহারের অঙ্গীকার এবং কর্মসূচীতে ৫টি অগ্রাধিকারের কথা বলা হয়েছে। এসব অঙ্গীকার জনগণের জন্য নূনতম চাহিদা পূরণ করার পাশাপাশি মৌলিক ইস্যু নিয়ে। তম্মধ্যে অনুচ্ছেদ ২.৮ এবং ৫.২৫-এ কম্পিউটার বা ই-গভর্নেন্সের কথা বলা হয়েছে। এ ছাড়া ৯.৪ অনুচ্ছেদটি তথ্যপ্রযুক্তির উন্নয়নের জন্য উল্লেখিত রয়েছে। ই-গভর্নেন্স ডিজিটাল বাংলাদেশের একটি বিরাট স্তম্ভ। যদিও ই-গভর্নেন্স নামে অতীতে বেগম খালেদা জিয়ার সরকার কেবলমাত্র লুটপাটই করেছে এবং আমরা এখন ডিজিটাল সরকারের কথা বলছি তথাপি এই বাক্যে প্রচ্ছন্নভাবে ডিজিটাল সরকার প্রতিষ্ঠার বিষয়টিকেই মুখ্য হিসেবে ধরা হয়েছে। আমি ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার জন্য যে তিনটি খাতকে সবচেয়ে বেশি গরুত্ব প্রদান করি ডিজিটাল সরকার বা ই-গভর্নমেন্ট তার মাঝে সবার ওপরে রয়েছে। একই সাথে ঢালাওভাবে বলা হলেও এটি স্বীকার করতে হবে যে, তথ্যপ্রযুক্তি খাতের উন্নয়ন ব্যতীত ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করা যাবেনা। তবে আওয়ামী রীগের ইশতেহারে ডিজিটাল বাংলাদেমের রূপরেখা বিষয়ে প্ররোক্ষাভাবে দুটি অধ্যায় রয়েছে। বলা যেতে পারে, এই রূপরেখার বিষয়টির জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ হচ্ছে ১০.১২ ও ১০.১৫ অনুচ্ছেদ দু'টি। এছাড়াও আছে ভুমি সংক্রান্ত অনুচ্ছেদ ৭.৯।

এই দু'টি অনুচ্ছেদ বস্তুত তথ্যপ্রযুক্তির ক্ষেত্রে করনীয় এমনসব বিষয়ের কথা বলা হয়েছে যাকে ডিজিটাল বাংলাদেশ-এর রূপরেখা হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। আমরা যদি এই দুটি অনুচ্ছেদ ব্যাখ্যা করি তবে ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার মূল অঙ্গীকারটি বা সেই অঙ্গীকারের রূপরেখাটি এই দুটি অনুচ্ছেদেই পাবো।

আমি ধারণা করি এবং নিশ্চিতভাবেই মনে করি, অনেকেই আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ঘোষণাপত্র না পড়েই এমন মন্তব্য করেন যে, ডিজিটাল বাংলাদেশ ধারণাটি ইশতেহারে মোটেই নেই। এজন্য প্রথমেই তথ্যপ্রযুক্তি বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে এমন দুটি অনুচ্ছেদ আমি এখানে তুলে ধরছি। দুটি অনুচ্ছেদকে একসাথে মিলিয়ে দেখা হলে ডিজিটাল বাংলাদেশ কর্মসূচিতে আমি যেসব অগ্রাধিকারের কথা বলেছি তার প্রতিফলন অত্যন্ত স্পষ্টভাবে লক্ষ্য করা যাবে। বরং কোন কোন ক্ষেত্রে ডিজিটাল বাংলাদেশের কোন কোন বিষয়ে আমার প্রণীত কর্মসূচির চাইতেও স্পষ্ট করে দিন তারিখ সময় উল্লেখ করা হয়েছে। একটি দৃষ্টান্ত দিতে পারি; আমি কম্পিউটার শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করার কথা বলেছি, কিন্তু আওয়ামী লীগের ইশতেহারে সময় উল্লেখ করে কোন পর্যায়ে কম্পিউটার শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হবে তা বলা হয়েছে। ২০২১ সালের মাঝে শিক্ষার সকল স্তরে কম্পিউটারকে শিক্ষা উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করার স্পষ্ট অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়েছে। নিচের অনুচ্ছেদটি পাঠ করা যেতে পারে।

অনুচ্ছেদ ১০.১২: বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শিক্ষাকে বিশেষভাবে উৎসাহিত করা হবে। বিশেষ করে তথ্য-প্রযুক্তিতে দক্ষ জনগোষ্ঠী গড়ে তোলার লক্ষ্যে স্কুল পর্যায় থেকে উচ্চতর স্তর পর্যন্ত কম্পিউটার ও কারিগরি শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা হবে। তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষা প্রতিটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ২০১৩ সালের মধ্যে বাধ্যতামূলক করা হবে। মাধ্যমিক স্তরে বিজ্ঞান শিক্ষা প্রসারের জন্য নবায়িত কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। ২০২১ সালের মধ্যে প্রাথমিক স্তরেও প্রযুক্তি শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পূর্ণ বাধ্যতামূলক করা হবে। ২০২১ সালের মধ্যে কম্পিউটারকে শিক্ষা উপকরণ হিসেবে শিক্ষার সকল স্তরে ব্যবহার করা হবে। সরকারের প্রশাসনিক কার্যক্রমের বর্তমান ফাইলভিত্তিক ব্যবস্থাকে ই-গভর্নমেন্ট বা ডিজিটাল সরকার ব্যবস্থায় রূপান্তর করা হবে ও জনগণকে ডিজিটাল পদ্ধতিতে সেবাদান নিশ্চিত করা হবে। কম্পিউটার সফটওয়্যার ও সেবা খাতের রফতানিসহ কম্পিউটারে দক্ষ মানবসম্পদ সৃষ্টিকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার

প্রদান করা হবে। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলসহ পুরো দেশে ইন্টারনেটের প্রসার ঘটানো হবে ও ইন্টারনেট সেবার মূল্য জনগণের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে আনা হবে।

আমি ডিজিটাল বাংলাদেশ নামক যে ভাবনাটির পেছনে লেগে আছি তারই অনেকটা প্রতিফলন হয়েছে ওপরের অনুচ্ছেদে। আমার নিজের চয়ন করা শব্দ বলে নয়, এখানে স্পষ্ট করে ডিজিটাল বাংলাদেশের মানব সম্পদ তৈরী করার কথা বলা হয়েছে। বলা হয়েছে কম্পিউটার শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করার কথা। ২০১৩ সালে মাধ্যমিক ও ২০২১ সালে প্রাথমকি সআতরে কম্পিউটার শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করার পাশাপাশি কম্পিউটারকে শিক্ষা উপকরণ হিসেবে ব্যবহারের কথা এই অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে। শুধু তাই নয় এই অনুচ্ছেদে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে ডিজিটাল সরকার ব্যবস্থা প্রচলনের কথা বলা হয়েছে। এতে ফাইল ব্যবস্থার উচ্ছেদের পাশাপাশি ইন্টারনেটের প্রসার এবং একে জনগণের ক্রয়ক্ষমতার মাঝে আনার কথাও বলা হয়েছে।

আমরা যদি এই অনুচ্ছেদের সাথে আরেকটি অনুচ্ছেঁদ পাঠ করি তবে ডিজিটাল বাংলাদেশের কেবল দুটি অগ্রাধিকার; ডিজিটাল সরকার ও ডিজিটাল শিক্ষার কথাই পাবোনা, আরও স্পষ্ট করে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির বিকাশে সরকারের করনীয় বিষয়ে জানতে পারবো। এই অনুচ্ছেদে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বাধীন টাস্কফোর্স সক্রিয় করার কথা বলা হয়েছে, তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষা, ব্যবহার ও উৎপাদনকে দেয়া হয়েছে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার। এখানে আবারও পাঠ্যবইকে সফটওয়্যারে রূপান্তরিত করার কথা বলা হয়েছে। ই-গভর্নমেন্ট, হাইটেক পার্ক, দ্বিতীয় সাবমেরিন ক্যাবল, তথ্যপ্রযুক্তি নীতিমালা এবং রাষ্ট্রভাষার কথা বলা হয়েছে।

অনুচ্ছেদ ১০.১৫: আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে গঠিত এবং জোট সরকারের আমলে নিষ্ক্রিয় করা প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বাধীন তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ক টাস্কফোর্স সক্রিয় ও কার্যকর করা হবে। এছাড়া নিম্নলিখিত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করা হবে।

ক. তথ্য-প্রযুক্তি শিক্ষা, ব্যবহার এবং বাণিজ্যিক উৎপাদনকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। নিম্ন মাধ্যমিক থেকে কম্পিউটার শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হবে এবং বিনামূল্যে শিক্ষা উপকরণ হিসেবে তা সরবরাহ করা হবে। এছাড়া পাঠ্যপুস্তকে শিক্ষামূলক মাল্টিমিডিয়া সফটওয়্যারে রূপান্তর করা হবে এবং সকল স্তরে শিক্ষা পদ্ধতিকে ডিজিটাল করা হবে।

খ. দেশের অভ্যন্তরে তথ্য-প্রযুক্তির ব্যবহার সর্বক্ষেত্রে (প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডে, ব্যাংকিং, গণযোগাযোগ, চিকিৎসা ব্যবস্থায়, ব্যবসা-বাণিজ্যে ও গণমাধ্যম ইত্যাদি) পরিব্যপ্ত করে এবং সফটওয়্যারের রফতানি শিল্পের বিকাশের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির জন্য সর্বাত্মক উদ্যোগ নেওয়া হবে। এ জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক তথ্য-প্রযুক্তিবিদ ও দক্ষ প্রোগ্রামার তৈরির লক্ষ্যে সাধারণ কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশাপাশি বিজ্ঞান প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে কম্পিউটার বিজ্ঞান শিক্ষার ওপর সবিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হবে।

গ. কালিয়াকৈরে হাইটেক পার্ক প্রতিষ্ঠা ছাড়াও দেশের বিভিন্ন স্থানে হাইটেক পার্ক, সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক, আইসিটি ইনকুবেটর এবং কম্পিউটার ভিলেজ স্থাপন করা হবে।

ঘ. দেশের জন্য আরো একটি আন্তর্জাতিক সাবমেরিন ক্যাবল স্থাপন করে সারাদেশে এর সুযোগ-সুবিধা পৌঁছানো হবে।

ঙ. দেশে ইলেক্ট্রনিক, ইলেক্ট্রিক্যাল এবং কম্পিউটার ও তার যন্ত্রাংশ তৈরি/সংযোজনকে উৎসাহিত করা হবে।

চ. তথ্য-প্রযুক্তি গবেষণায় সরকারিভাবে বরাদ্দ প্রদান করে তা যথাযথভাবে ব্যবহার নিশ্চিত করা হবে।

ছ. জাতীয় তথ্য-প্রযুক্তি নীতিমালা পুনর্বিন্যাস করা হবে এবং সফটওয়্যার ও তথ্য-প্রযুক্তি সেবার অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাজার সৃষ্টি ও সম্প্রসারণের জন্য কার্যকর পদক্ষেপ নেয়া হবে। সফটওয়্যার ও তথ্যপ্রযুক্তি সেবা খাতকে রফতানি সহায়তা প্রদান করা হবে। তথ্য-প্রযুক্তি শিল্পের বিকাশ এবং আগামী দেড় দশকের মধ্যে অন্যতম প্রধান বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী খাতে পরিণত করার জন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে শিল্প মন্ত্রণালয়ের সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

জ. তথ্য-প্রযুক্তিসহ সকল মেধাসম্পদ সংরক্ষণের কার্যকর পদক্ষেপ নেয়া হবে। কপিরাইট আইনের সঠিক প্রয়োগ করা হবে এবং পেটেন্ট-ডিজাইন এবং ট্রেড মার্কস আইন যুগোপযোগী করে তা প্রয়োগ করা হবে। ই-কমার্স চালু করার জন্য প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন করা হবে।

ঝ. টেলিকমিউনিকেশন প্রযুক্তির আরো সম্প্রসারণ ও সহজলভ্য করা হবে এবং সারাদেশে ইন্টারনেট সংযোগ সহজলভ্য করা হবে।

ঞ. তথ্য-প্রযুক্তিতে রাষ্ট্রভাষা বাংলার সর্বোচ্চ মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করা হবে।

এই অনুচ্ছেদটি বস্তুত ডিজিটাল বাংলাদেশ ঘোষণারই প্রতিফলণ ঘটিয়েছে। আলোচনা করার সুবিধার্থে আমরা ২.৮ ও ৫.২৫ অনুচ্ছেদ এখানে তুলে ধরছি।

অনুচ্ছেদ ২.৮: দুর্নীতি দমনের সর্বোত্তম পদক্ষেপ হলো সরকারি দফতরের কর্মকান্ড কম্পিউটারায়ন এবং সেই রেকর্ড সর্বসাধারণ্যে উন্মুক্তকরণ। পুলিশ থানার কার্যাবলী, আদালতের কার্যাবলী, ভূমি রেকর্ড ও ভূমি হস্তান্তরের বিবরণ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তথ্য ও বাজেট, স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানের তথ্য ও বাজেট এবং সর্বোপরি সম্পূর্ণ টেন্ডার প্রক্রিয়াকে পুরোপুরি কম্পিউটারভুক্ত করে সেই তথ্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হবে।

অনুচ্ছেদ ৫.২৫: একটি আধুনিক, প্রযুক্তিনির্ভর, দক্ষ, দুর্নীতিমুক্ত দেশপ্রেমিক গণমুখী প্রশাসনিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা হবে। প্রশাসনের সর্বস্তরে ই-গভর্নেন্স চালু করা হবে।..........

এইসব অনুচ্ছেদের বাইরেও বিজ্ঞান শিক্ষা ও গবেষণার কথা বলা হয়েছে। আবার যখনই প্রয়োজন হয়েছে তখনই প্রযুক্তি এবং তথ্যপ্রযুক্তির কথা বলা হয়েছে ইশতেহারে। কৃষি সংক্রান্ত ১.৩.৬ অনুচ্ছেদে প্রযুক্তি ব্যবহারের কথা বলা হয়েছে। অনুচ্ছেদ ৭.৯-এ জাতীয় ভূমিনীতি প্রনয়নসহ ডিজিটাল ম্যাপিং-এর কথা বলা হয়েছে। অনুচ্ছেদ ৭.১১-এ গ্রামে ইন্টারনেট চালু করার কথা বলা হয়েছে। ৯.৩ অনুচ্ছেদে শিল্প উন্নয়নে তথ্যপ্রযুক্তির বিকাশের কথা বলা হয়েছে। একই সঙ্গে তথ্য প্রযুক্তিভিত্তিক শিল্প ও সেবাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারের কথা বলা হয়েছে। শিল্প খাতে তথ্যপ্রযুক্তির প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে অনুচ্ছেদ ৯.৪-এ। এতে আছে;

অনুচ্ছেদ ৯.৪: নানাভাবে অবহেলিত এবং নানা বাধা-নিষেধের শিকার বিপুল সম্ভাবনাময় রফতানিমুখী তথ্য-প্রযুক্তিনির্ভর শিল্প ও বাণিজ্যকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে। ফাইবার অপটিকস সংযোগকে সহজলভ্য ও যথাযথভাবে কাজে লাগিয়ে দেশের প্রতিভাবান তরুণ ও আগ্রহী উদ্যোক্তাদের সর্বতোভাবে সহযোগিতা দিয়ে আইসিটি শিল্পের উন্নয়ন নিশ্চিত করা হবে। সফটওয়্যার রফতানি বিশেষভাবে উৎসাহিত করা হবে। প্রত্নতত্ত্ব বা জাদুঘর প্রতিষ্ঠানে বিশেষজ্ঞদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

এসব আলোচনা থেকে একটি বিষয় সম্পূর্ন নিশ্চিতভাবেই বলা যায় যে, একেবারে পরিকল্পনাহীন ভাবে আওয়ামী লীগ ডিজিটাল বাংলাদেশের কথা বলেনি। বরং এই কথাটি আমি বলতে পারি যে, ডিজিটাল বাংলাদেশের মুল বিষয়গুলো বা অগ্রাধিকারগুলো যাতে ইশতেহারে থাকে সেই ব্যবস্থা করা হয়েছে। তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ক অনুচ্ছেদগুলো লেখার সময় আমি এটুকু মনে রেখেছিলাম।

খুব সঙ্গতভাবেই আমি ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের জন্য আওয়ামী লীগের ইশতেহারের মাঝেই সীমিত থাকতে পারি। কিছু কিছু বিষয়ে ইশতেহারের বিস্তারিতভাবে বলা নেই এমন বিষয় ডিজিটাল বাংলাদেশের আওতায় আসতে পারে।

যাহোক ডিজিটাল বাংলাদেশের জন্য সরকারকে প্রথমেই ভাবতে হবে একটি কর্মসূচি, একটি কর্মপরিকল্পনা ও রোডম্যাপের কথা। বাস্তবতা হলো আগের সরকারসমূহ এই পথে বেশ কিছুটা পথ পাড়ি দিয়েছিলো। বিশ্বব্যাঙ্ক তাদের অনুদান কর্মসুচির আওতায় একটি রোড ম্যাপ, একটি ই-গভর্নমেন্ট কৌশল ও একটি সিলেবাস প্রস্তুত করে। তবে এসব প্রতিবেদন দিয়ে বাংলাদেশের জন্য একটি ডিজিটাল রূপান্তর সম্ভব নয় বলে বিগত সরকার একটি আইসিটি নীতিমালা প্রস্তুত করার কার্যক্রম হাতে নেয়। আগের সরকারের আমলেই যেহেতু আমরা ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তোলার কথা বলি সেহেতু সেই সরকারের কাছে তথ্যপ্রযুক্তি নীতিমালা আপডেট করার বিষয়টি খুবই গরুত্বপূর্ন হয়ে ওঠে। ২০০৭ সালে এই সরকার এসব দিকে নজর দিতে না পারলেও ২০০৮ সালে আইসিটি সেই সরকারের অন্যতম আলোচ্য বিষয়ে পরিণত হয়। এই পলিসি প্রণয়ন, পর্যালোচনা ও এর সর্বশেষ অবস্থাটি জানলে আমাদের পক্ষে সহজ হবে ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নে সরকারের করনীয় কি হতে পারে সেটি উপলব্ধি করা।

তথ্যপ্রযুক্তি নীতিমালা: এখন হয়তো অনেকেই স্মরণ করতে পারবেন না যে, বাংলাদেশের তথ্যপ্রযুক্তি নীতিমালা প্রণয়নের জন্য প্রথম উদ্যোগ গ্রহণ ও সিদ্ধান্ত নেয় শেখ হাসিনার ৯৬-২০০১ সময়কালের সরকার। ১৯৯৭ সালে গঠিত সফটওয়্যার রপ্তানী সংক্রান্ত টাস্কফোর্সের সুপারিশ অনুসারে সরকার তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৯৯৯ সালের মে মাসের ১০ তারিখ জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা প্রণয়ন কমিটি গঠন করে (প্রজ্ঞাপন নং-বিপ্রম/শা-৯/এনসিএসটি-১/৯৯/৯০ তারিখঃ ১০-০৫-১৯৯৯)। সেই প্রজ্ঞাপন অনুসারে কাজটি গুছিয়ে নেবার দায়িত্ব গ্রহণ করে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল। সেই সময়ে এই বিষয়ে মন্ত্রী ছিলেন নুরুদ্দিন খান। কম্পিউটার কাউন্সিলের নির্বাহী পরিচালক ছিলেন প্রফেসর সোবহান সাহেব।

সোবহান সাহেবের নেতৃত্বাধীন বিসিসি নিজের মতো করে এই নীতিমালা তৈরী করতে থাকে। বিশেষ করে এই নীতিমালায় সোবহান সাহেবের কাছের মানুষদের, বিশেষত শিক্ষাবিদদের মতামতের প্রতিফলন ঘটতে থাকে

ব্যাপকভাবে। এ বিষয়ে তিনি তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পের মানুষদেরকে সংশ্লিষ্ট করে বেশ কয়েকটি কর্মশালাও করেন। তাতে তথ্যপ্রযুক্তি শিল্প খাতের জনগণ অংশ গ্রহণ করেন। তারা মতামতও প্রদান করেন। কিন্তু কম্পিউটার কাউন্সিল বা মন্ত্রণালয় সেইসব মতামত গ্রাহ্য করেনি। বলা যায়, কম্পিউটার কাউন্সিল তার আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে এই নীতিমালা প্রণয়ন করতে গিয়ে পুরো আওয়ামী লীগের মেয়াদকালটিই পার করে দেয়। ফলে শেখ হাসিনার সরকার তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির জন্য অনেক কিছু করেও আইসিটি নীতিমালা প্রনয়ন ও অনুমোদন করে যেতে পারেনি। বরং তথ্যপ্রযুক্তি নীতিমালাটি প্রণীত হয় বেগম খালেদা জিয়ার শাসনকালে ২০০২ সালে। এর কৃতিত্ব গ্রহণ করেন জনাব আব্দুল মইন খান।

পরস্পরবিরোধী, অগ্রাধিকার ও কর্মপরিকল্পনাহীন সেই নীতিমালাটি একেবারে প্রথম দিন থেকেই তথ্যপ্রযুক্তি খাতের কাছে মোটেই গ্রহণযোগ্য হয়নি। ফলে বেসরকারী আইসিটি খাতের শরীকরা এফবিসিসিআই-এর নেতৃত্বে আলাদা আইসিটি নীতিমালা তৈরী করতে বাধ্য হয়। তৎকালীন মন্ত্রী ডঃ আব্দুল মইন খান এফবিসিসিআই-এর সেই নীতিমালা মুখে গ্রহণ করলেও তা আমলে নেননি। আসল বিষয় হলো, এফবিসিসিআই তাদের নীতিমালায় যেসব বিষয় উল্লেখ করে তার কোন ধারণাই মইন খানের নীতিমালায় প্রতিফলিত হয়নি। যেমন এফবিসিসিআই-এর নীতিমালায় কর্মপরিকল্পনা ছিলো। কিন্তু সরকারের নীতিমালায় কর্মপরিকল্পনা নামক কিছু ছিলোনা। এফবিসিসিআই-এর কর্মপরিকল্পনায় ২০০৬ সালকে সময়সীমা নির্ধারণ করে সেইসব কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের সুপারিশ করা হয়েছিলো। মইন খান সেগুলোর পাতাও উল্টিয়ে দেখেননি। আরও দুঃখের বিষয় হলো যে, সরকার নীতিমালাটি বাস্তবায়নের জন্য কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। বরং দুর্ভাগ্যজনকভাবে লক্ষ্য করা যায় যে, মইন খানের পুরো আমলে কেউ সেই নীতিমালাটি পরিবর্তনের দাবীও করেননি। এমনকি বেসিস-বিসিএস এ বিষয়ে কোন দাবী উত্থাপন করেনি।

যাহোক, ২০০৯ সালে মন্ত্রীসভায় অনুমোদিত নীতিমালাটির জন্ম সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ফখরুদ্দিনের আমলে। ২০০৭ সালে যখন ফখরুদ্দিনের সরকার ছবিসহ ভোটার তালিকার প্রস্তাব গ্রহণ করে তখন আমি ঐ কমিটির সদস্য হিসেবে তার সাথে দেখা হলে তৎকালীন উপদেষ্টা জনাব তপন চৌধুরীকে তথ্যপ্রযুক্তি নীতিমালাটি হাল নাগাদ করার জন্য অনুরোধ করি। এমনকি ডঃ জামিলুর রেজা চৌধুরীর নেতৃত্বের কথাও আমি তাকে বলি। কিন্তু তিনি আমার সেই প্রস্তাব কানে তুলেননি। বলা যেতে পারে, এসব বিষয়ে তার কোন আগ্রহই ছিলোনা। এক সময়ে তিনি ক্ষমতাচ্যুত হন। পরে ২০০৮ সালে বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতির সভাপতি হিসেবে বেটার বিজনেস ফোরামে আমি একই প্রস্তাব তুলি। সেই ফোরামে বেসিস (রাউলি সভাপতি) ও আইএসপিএবি (সালাম সভাপতি) আমাকে সমর্থন প্রদান করে। বেটার বিজনেস ফোরামের অনুরোধে বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় ২০০৮ সালের মে মাসে আইসিটি নীতিমালা নবায়ন করার সিদ্ধান্ত নেয়। সেই সিদ্ধান্ত অনুসারে তত্ত্বাবধায়ক সরকার তার মেয়াদ শেষ করার আগেই একটি আইসিটি নীতিমালা চূড়ান্ত করতে চেয়েছিলো। সেজন্য ২০০২ সালের নীতিমালা পর্যালোচনা করার জন্য ডঃ জামিলুর রেজার নেতৃত্বে একটি কমিটিও গঠন করেছিলো। ২০০৯ সালে মন্ত্রী পরিষদ যে আইসিটি নীতিমালাটি অনুমোদন করে সেটি সেই কমিটির পেশ করা নীতিমালা।

নীতিমালার প্রতিবেদনে ২০০২ সালের নীতিমালাটির বাস্তবায়ন পরিস্থিতি মূল্যায়ন করা হয়েছে। যদিও এটি নীতিমালায় নেই তথাপি প্রণীত রিপোর্ট থেকে সেই নীতিমালাটি বাস্তবায়ন না করার কিছু কারণ উল্লেখ করা হয়েছে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের গঠন করা কমিটির মূল্যায়ন অনুসারে ২০০২ সালের নীতিমালায় মোট ১০৩টি কর্মপ্রণালীর মাঝে ৮টি পুরোপুরি বাস্তবায়িত হয়েছে। এর অর্থ হলো ২০০২ থেকে ২০০৮ পর্যন্ত নীতিমালার শতকরা মাত্র ৭.৭৫ ভাগ বাস্তবায়িত হয়। অথচ ২০০৬ সালের মাঝে শতকরা ১০০ ভাগ বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে সেটি প্রণীত হয়েছিলো। সেই সময়ে বেগম জিয়ার সরকারতো এ ব্যাপারে নীরব ছিলোই-তত্ত্বাবধায়ক সরকারও দুই বছরে তেমন কোন কার্যকর পদক্ষেপ নেয়নি। ২০০৭ সালে ফখরুদ্দিন সাহেব হাসিনা-খালেদা ও অন্য রাজনীতিবিদদের নিয়ে এতো বেশি ব্যস্ত ছিলেন যে, আইসিটি তার এজেন্ডায় ছিলোনা।

২০০৮ সালে গঠিত আইসিটি নীতিমালা কমিটির মতে, কিছু কাজ হয়েছে ৬১টির এবং ৩৪টি সুপারিশের কোন কাজই হয়নি। কমিটির মতে সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় এই নীতিমালা বিষয়ে অবহিত ছিলোনা, নীতিমালা বাস্তবায়নে সরকারের কোন আগ্রহ ছিলোনা বা সরকারের মাঝে সমন্বয় ছিলোনা বলে সেই নীতিমালা কার্যকরভাবে বাস্তবায়িত করা হয়নি। তবে আমরা কিছু নেপথ্যের কথা বলতে পারি। এই মূল্যায়নটি কম্পিউটার কাউন্সিলের পক্ষ থেকে করা। ফলে এটি ফখরুদ্দিন ও খালেদা জিয়ার সরকারের চরম ব্যর্থতাকে ঢাকার একটি চেষ্টা ছিলো মাত্র। উদাহরণ দেয়া যেতে পারে। বলা হয়েছে যে, দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে, স্কুল-কলেজে কম্পিউটার বিষয়টি পাঠ্য

করা হয়েছে। বাস্তব অবস্থা হচ্ছে যে, স্কুল-কলেজে ৯৬/৯৮ সালে কম্পিউটার বিষয়টি পাঠ্য করা হয়েছে। ৯২ সালে এর পাঠক্রম ও ৯৩-৯৪ সালে এর পাঠ্যপুস্তক লেখা হয়। ২০০১ সালের মাঝেই বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে কম্পিউটার শিক্ষার গতি আসে। নীতিমালায় সেই অবস্থার উন্নতির কথা বলা হয়েছিলো। কিন্তু ২০০২ সালের পর স্কুল কলেজেতো দূরের কথা বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়েও কম্পিউটার শিক্ষার প্রসারের জন্য সঠিক কোন পদক্ষেপ নেয়া হয়নি। কার্যত এটি ২০০৭ সাল পর্যন্ত থ্রাস্টবিহীন একটি থ্রাস্ট সেক্টর হিসেবে কাজ করেছে। আমার নিজের মূল্যায়ণ হচ্ছে আইসিটি নীতিমালা নামক একটি বস্তুর বাস্তবায়নের জন্য সরকারের কোন নির্দিষ্ট উদ্যোগ ছিলোনা। যেটুকু অগ্রগতির কথা বলা হচ্ছে সে সম্পর্কে এটি বলতে হবে যে, এই কাজগুলো আপনাআপনি হয়েছে।

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আইসিটি নীতিমালা প্রণয়নের জন্য গঠিত জেআরসির নেতৃত্বাধীন সেই কমিটি গত ৬ সেপ্টেম্বর ২০০৮ তাদের শেষ সভা করে এবং ১০ সেপ্টেম্বর ২০০৮ সর্বশেষ সম্পাদনা করে আনুষ্ঠানিকভাবে এই দলিলটি তৎকালীন সরকারের কাছে হস্তান্তর করে বলে আমরা কমিটির সদস্যরাও পরে জেনেছি। এজন্য কোন আনুষ্ঠানিকতা করা হয়নি। সম্ভবত ডঃ জামিলুর রেজা চৌধুরী একা বা তার পছন্দের কাউকে সঙ্গে নিয়ে দেখা করে মানিক লাল সমদ্দারের কাছে তিনি নীতিমালাটি হস্তান্তর করেছিলেন। ডঃ চৌধুরী বা মানিকলাল কেউ এটি ভাবেননি যে, এটি প্রণয়নের সাথে যারা জড়িত তাদেরকে সঙ্গে নিয়ে যদি এটি হস্তান্তর করা হতো তাতে অন্তত প্রনয়নকারীদের কষ্টের প্রতি একটু সম্মান দেখানো হতো। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য স্বেচ্ছাসেবামূলক এই কাজের পাশাপাশি সরকার বিপুল অর্থ ব্যয় করে একটি আইসিটি রোডম্যাপ ও ই-গভ কৌশল তৈরী করার প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে। গত ১৮ সেপ্টেম্বর ২০০৮ সেই রোডম্যাপ বিষয়ক একটি কর্মশালাও অনুষ্ঠিত হয়। এরপর সেই প্রতিবেদনের চূড়ান্ত রূপ সরকারের কাছে পেশও করা হয়েছে। নিয়মমাফিক সেই প্রতিবেদন অনুসারে এখন সরকারের কাজ করার কথা। কিন্তু প্রতিবেদন নিয়ে যেমন সরকারের কোন আগ্রহ নেই, তেমন এই খাতের মানুষদেরও কোন আগ্রহ নেই। বরং নানা অনিয়ম, দুর্নীতি ও বিভ্রান্তিতে ভরা সেইসব রিপোর্ট এখন কোন দেশীয় প্রতিষ্ঠান স্বীকারও করতে চায়না। তবে ছোট খাটো ত্রুটি থাকার পরেও ২০০৮ সালে পেশ করা ও ২০০৯ সালে প্রনয়ন করা নীতিমালাটি সকল মহলই গুরুত্ব দিয়ে দেখছে।

৩১ মার্চ ২০০৯ অনুষ্ঠিত মন্ত্রী পরিষদের বৈঠকে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা ২০০৯-এর প্রাথমিক অনুমোদন দেয়া হয়। তখনও সরকারের একশো দিন পার হয়নি। সম্পূর্ণ ইংরেজী ভাষায় প্রণীত আইসিটি পলিসি ২০০৯ সম্পর্কে ঐদিনের মন্ত্রীসভার ৭ নং আলোচীসূচী অনুসারে সিদ্ধান্ত হচ্ছে "জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা ২০০৯-এর খসড়া মন্ত্রীসভার আলোচনার আলোকে সংশোধন, সংযোজন এবং হালনাগাদকরণ সাপেক্ষে নীতিগতভাবে অনুমোদন করা হইল।" জানা গেছে যে, মন্ত্রীসভায় বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে আলোচিত হয়েছে এবং বৈঠকের কার্য বিবরণীতে সেই আলোচনা এইভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

"৭.১। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি দ্রুত পরিবর্তনশীল বৈশিষ্ট্যের কারণে বিদ্যমান জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা প্রাসঙ্গিক ও হালনাগাদ করিবার লক্ষ্যে জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা, ২০০৯ প্রণয়নের প্রস্তাব সময়োপযোগী ও প্রশংসনীয়। তবে প্রস্তাবিত নীতিমালার প্রস্তাবসহ কতিপয় বিষয় পুনর্গঠনের প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে।

৭.২। খসড়া নীতিমালার প্রস্তাবনা অংশে জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা প্রণয়নের উদ্যোগ ও প্রেক্ষাপট এবং তৎকালীন সরকার কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম সম্পর্কে কোন উল্লেখ নাই। এই সকল বিষয় উল্লেখসহ ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনে বর্তমান সরকারের অঙ্গীকারের বিষয়টিও প্রস্তাবনায় উল্লেখ থাকা আবশ্যক। নীতিমালার রূপকল্পের প্রস্তাবিত মেয়াদ পর্যালোচনাক্রমে ২০২১ সালের মধ্যে দেশকে উন্নত দেশের সারিতে উন্নীতকরণের জাতীয় লক্ষ্য নির্ধারণের বিষয় বিবেচনা করা যাইতে পারে। নীতিমালার বাস্তবায়ন কৌশল আরও পর্যালোচনাক্রমে পুনর্গঠন করা সমীচীন হইবে। ইহা ছাড়া দেশের সফটওয়্যার শিল্প প্রসারের লক্ষ্য বাস্তবায়নের বিষয়ও আলোকপাত করা যাইতে পারে।

৭.৩। নীতিমালার স্বত্ত্বাধিকার, তদারকি ও রিভিউ সংক্রান্ত 'খ' অনুচ্ছেদে সকল সরকারি সংস্থা স্ব স্ব ক্ষেত্রে আইসিটি নীতিমালা বাস্তবায়নে জাতীয় আইসিটি টাস্কফোর্সের নিকট দায়বদ্ধ থাকিবে মর্মে উল্লেখ রহিয়াছে। সরকারের সকল সংস্থা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের নিকট দায়বদ্ধ বিধায় ইহা নীতিমালায় উল্লেখ করা যথাযথ হইবে না।

৭.৪। প্রস্তাবিত নীতিমালার উদ্দেশ্য বর্ণমালার ক্রমিক অনুসারে বিন্যস্ত করা যাইতে পারে। নীতিমালার উদ্দেশ্য অংশে ই-কমার্স অন্তর্ভুক্ত করা যাইতে পারে। নীতিমালায় বর্ণিত কতিপয় লক্ষ্য অর্জনের সময়সীমা পুনর্বিবেচনার আবশ্যকতা রহিয়াছে। ই-গভর্নেন্স স্বল্প (১৮ মাস) ও মধ্য মেয়াদে (৫ বৎসর) বাস্তবায়নের ইঙ্গিত থাকিতে পারে।

৭.৫। নীতিমালা বাস্তবায়নে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল, বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন এবং ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের সহিত সমন্বয় এবং এতদসংশ্লিষ্ট বিদ্যমান আইনের বিধানসমূহ নীতিমালার সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণকরনের বিষয় নীতিমালায় অন্তর্ভুক্ত করা যাইতে পারে। দেশে বর্তমানে ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষরের ব্যবহার স্বীকৃত হয়। ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর প্রবর্তনের লক্ষ্যে ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর যাচাইয়ের জন্য কর্তৃপক্ষ গঠনের আবশ্যকতা রহিয়াছে। নীতিমালায় কর্তৃপক্ষ গঠনের উল্লেখ করা যাইতে পারে।
৭.৬। উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের কৌশলগত বিষয়বস্তু ৩.৪ এর ৯৬ ক্রমিকে আইসিটি ক্যাডার প্রবর্তনের উল্লেখ রহিয়াছে। সরকারি চাকুরী কাঠামোতে আইসিটি ক্যাডার প্রতিষ্ঠা করা হইলে আইসিটি খাতের মেধাবী ও যোগ্য ব্যক্তিদের আকর্ষণ করা অসুবিধাজনক হইবে। আইসিটি খাতে সাফল্য অর্জনকারী প্রতিবেশী দেশসমূহে অনুসৃত ব্যবস্থা পর্যালোচনাক্রমে এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সমীচীন হইবে।
৭.৭। নীতিমালায় স্বাস্থ্য সেবার পাশাপাশি প্রজনন স্বাস্থ্যের বিষয়টি উল্লেখ থাকা প্রয়োজন। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে টেলি-মেডিসিন প্রকল্পসহ বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করিয়াছে এবং আরও কার্যক্রম গ্রহণের বিষয় উক্ত মন্ত্রণালয়ে বিবেচনাধীন রহিয়াছে। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মতামত গ্রহণক্রমে নীতিমালার স্বাস্থ্য পরিচর্যা সংক্রান্ত বিষয় পুনর্গঠন করা সমীচীন হইবে।
৭.৮। শিক্ষা ও গবেষণা সংক্রান্ত ক্রমিক ৪ এ প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রকে অন্তর্ভুক্ত করা আবশ্যক। অখন্ডতা সংক্রান্ত উদ্দেশ্য ক্রমিক ৩ এর অধীনে অনলাইনে আয়কর রিটার্ণ জমা প্রদানের উল্লেখ রহিয়াছে। অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের সহিত আলোচনাক্রমে অনলাইনের মাধ্যমে সম্পূর্ণ অর্থ বৎসরের আয়কর একত্রে পরিশোধের পরিবর্তে পর্যায়ক্রমে (Staggered) পরিশোধের ব্যবস্থা প্রবর্তনের বিষয় পরীক্ষা করিয়া দেখা যাইতে পারে।
৭.৯। জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা, ২০০৯ এর খসড়া উপযুক্ত আলোচনার আলোকে সংশোধন, সংযোজন এবং হালনাগাদকরণ সাপেক্ষে নীতিগতভাবে অনুমোদন করা যাইতে পারে।"

শেখ হাসিনা সরকারের মন্ত্রীসভার অনুমোদনের পর তাদের সিদ্ধান্তের আলোকে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল সেই নীতিমালাটির বঙ্গানুবাদ করেছে এবং তাদের ভাষায় প্রয়োজনীয় সংশোধনী করে বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ে পেশ করেছে।

মন্ত্রীসভারই পর্যবেক্ষণগুলোকে বিবেচনায় নিলে এটি স্পষ্টই বোঝা যায় যে, নীতিমালাটির বিভিন্ন ক্ষেত্রে বেশ বড় ধরনের পরিমার্জনা ও সংশোধন করা প্রয়োজন। একটি বড় ধরনের পর্যবেক্ষণ হচ্ছে ডিজিটাল বাংলাদেশকে নিয়ে। খুব সঙ্গতকারণেই ফখরুদ্দিনের সরকার ও তার উপদেষ্টা মানিক লাল সমদ্দারসহ ডঃ জামিলুর রেজা চৌধুরীর কমিটি ডিজিটাল বাংলাদেশ ধারণাটিকেই আমরে নেয়নি। সরকারী ক্যাডার সার্ভিস এবং এই নীতিমালায় অভিভাবকত্ব নিয়ে খসড়া নীতিমালার সাথে একটি স্পষ্ট দ্বিমত রয়েছে মন্ত্রীসভার সিদ্ধান্তে। আমি ধারনা করি, এজন্য সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলোর মতামত নেয়া প্রয়োজন বিধায় আন্তঃ মন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠানও জরুরী হয়ে পড়েছে। আমি এটি উপলব্ধি করছি যে মন্ত্রীসভা অগ্রাধিকারের বিষয়টি নিয়ে কোন সিদ্ধান্ত নেয়নি। এ্যাকশন প্ল্যান নিয়ে কোন আলোচনা করা হয়নি এখানে। বিশেষত ডিজিটাল বাংলাদেশ বলতে আমরা ডিজিটাল সরকার, ডিজিটাল শিক্ষা ও ডিজিটাল কমার্সকে যে অগ্রাধিকার দিতে চাই সেইসব বিষয় সম্পর্কেও কিছুই বলা হয়নি।

মন্ত্রীসভা যেসব মতামত দিয়েছে এবং বিসিসির ওয়েবসাইটে নীতিমালার যে খসড়াটি এখনও বিদ্যমান সেটি দেখে আমি এটি বুঝতে সক্ষম হয়েছি যে বর্তমান সরকারের মন্ত্রীসভা ২০০৮ সালের খসড়া আইসিটি নীতিমালাটিই চোখে দেখেছে। সেই নীতিমালায় কোন ধরনের সংশোধন, সংযোজন, পরিবর্তন, পরিবর্ধন করা হয়নি। সম্ভবত সেই নীতিমালাটির বাংলা অনুবাদ না করে এবং কোন ধরনের পরিবর্তন না করেই সেটি মন্ত্রীসভায় পেশ করা হয়। এর একটি অর্থ দাড়াতে পারে যে, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ২০০৮ সালের সরকারের সাথে নিজেদেরকে স্বতন্ত্র করার জন্য ডিজিটাল বাংলাদেশ বলার পরও নীতিগতভাবে কোন পার্থক্য তৈরী করতে পারেনি। এমনও হতে পারে যে সেই চেষ্টাও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের ছিলোনা। এটি ঠিক অনুধাবন করা সম্ভব নয় যে, সরকারের মন্ত্রীসভা যা বলেছে সেটি মন্ত্রণালয় কেন অনুভব করতে পারেনি।

এটি খুবই সঙ্গত বিষয় যে সরকার ডিজিটাল বাংলাদেশের কথা বলায় তার নীতিমালাকেও ডিজিটাল বাংলাদেশের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ করবে। সেটি না করে একটি মধ্য আয়ের দেশে পরিণত করার জন্য জেআরসি সাহেব যে নীতিমালা তৈরী করেন তাকেই হুবহু কেন মন্ত্রীসভায় পেশ করা হলো? আমি এর কান কারণ খোজে পাইনি।

প্রশ্ন হতে পারে, যে আওয়ামী লীগ ডিজিটাল বাংলাদেশ কর্মসূচী গ্রহণ করতে পারে, সেই আওয়ামী লীগ কি একটি আইসিটি নীতিমালা মূল্যায়ন করার মানুষ খোজে পায়নি? নাকি ক্ষমতায় যাবার আগে আওয়ামী লীগের যে ক্ষমতা বা দূরদৃষ্টি ছিলো সরকারে যাবার তিনমাসের আগেই সেই মেধা ভোতা হয়ে গেলো?

আমি স্মরণ করতে পারি যে, বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতির পক্ষ থেকে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে এই নীতিমালাকে ডিজিটাল বাংলাদেশের আলোকে নতুন করে মূল্যায়ন করার কথা বলা হয়েছিলো। কেবলমাত্র জেআরসি ও তার অনুগতরা এই নীতিমালাটির কোন পরিবর্তন চাননি। আমাদের মন্ত্রণালয় জেআরসিদের কথাতেই চলেছে, নিজেদের মতো করে ভাবেনি।

মন্ত্রীসভার সিদ্ধান্তে, ৭.২ অনুচ্ছেদে নীতিমালার প্রণয়নের প্রেক্ষিত ও পূর্বকথা উল্লেখ না করার কথা বলা হয়েছে। মন্ত্রীসভার এইসব পর্যবেক্ষণের আলোকে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত অনুসারে বাংলাদেশ কম্পিউটার কউিন্সিল নীতিমালাটির বঙ্গানুবাদ করে এবং তাদের ভাষায় যেসব সংশোধন করা দরকার তা সম্পন্ন করে। সম্প্রতি কম্পিউটার কাউন্সিলের পক্ষ থেকে ই-মেইলে আমার কাছে সেই নীতিমালাটি প্রেরণ করা হয়।

২০০৯ সালের মার্চ মাসে অনুদিত ও সংশোধিত নীতিমালাটি এরকম: জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা-২০০৯

ক. প্রস্তাবনা: তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বর্তমান বিশ্বে উন্নয়নের অন্যতম উপাদান হিসেবে পরিগণিত। এর সুফল সর্বস্তরে পৌঁছে দিতে করণীয় নির্ধারণকল্পে বর্তমান সরকার তার পূর্ববর্তী শাসনামলে একটি তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করে। যার প্রতিফলন ছিল কম্পিউটারের উপর থেকে সম্পূর্ণভাবে শুল্ক প্রত্যাহার করে নেওয়া। সাবমেরিন ক্যাবলের মাধ্যমে সুপার হাইওয়ের সাথে বাংলাদেশের যোগাযোগ স্থাপনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা। আইটি ব্যবসাকে উৎসাহ যোগাতে ৪০ কোটি টাকার থোক বরাদ্দ রাখা। দেশে ডিজিটাল টেলিফোনের যাত্রাও সেই সময়ই শুরু হয়। প্রযুক্তি ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে মনোপলি ভেঙ্গে মোবাইল ফোন ব্যবস্থাকে উন্মুক্ত করা হয় যাতে করে সাধারণ জনগণের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে মোবাইল প্রাপ্তি সম্ভব হয়। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার ১০ মে ১৯৯৯ তারিখ জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা প্রণয়ন কমিটি গঠন করে (প্রজ্ঞাপন নং-বিপ্রম/শা-৯/এনসিএসটি-১/৯৯/৯০ তারিখঃ ১০-০৫-১৯৯৯)। পরবর্তী সরকারের সময় ২০০২ সনে নীতিমালা প্রনীত হলেও শৈথিল্যের কারণে ২০০৬ সালের মধ্যে দেশে জ্ঞান-ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা সুদূর পরাহতই রয়ে যায়। বলা বাহুল্য যে, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সেই স্তরে পৌঁছাতে আমাদের এখনো অনেক পথ পাড়ি দিতে হবে। সে আলোকে আইসিটি সংশ্লিষ্ট সকলেই জাতীয় লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও সামর্থ্যের নিরিখে বিদ্যমান আইসিটি নীতিমালা সংশোধন ও পরিমার্জন করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। তদনুযায়ী বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় এর স্মারক নং- বিতযোপ্রম/শাখা-১৩/আইটি-৭/১৯৯৯/অংশ-২/১০৮, তারিখ: ৪-৫-২০০৮ এবং পরবর্তীতে বাংলাদেশ গেজেট, ভলিউম ২৯ : জুলাই ১৭, ২০০৮ এ প্রকাশিত প্রজ্ঞাপন দ্বারা 'জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা রিভিউ কমিটি' গঠিত হয়। 'জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা ২০০৯ (প্রস্তাবিত)' এ কমিটি প্রণীত দলিল।

জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা ২০০৯ এর রূপকল্প ও উদ্দেশ্যসমূহের সফল বাস্তবায়নের মাধ্যমে আগামী ২০২১ সালের মধ্যে সরকার প্রতিশ্রুত ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তোলা সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়।

ক.১ জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালার যৌক্তিক ভিত্তি: গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ এর সংবিধানে সামাজিক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার উপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে, এই দেশের সীমিত প্রাকৃতিক সম্পদ এবং বহুল মানব সম্পদের কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করে এই মূল্যবোধ সঞ্চারের ব্যাপারে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সবচেয়ে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে।

বাংলাদেশের সংবিধানের ১৯ নং অনুচ্ছেদে পরিষ্কার নির্দেশনা রয়েছে ঃ

(১) সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা নিশ্চিত করিতে রাষ্ট্র সচেষ্ট হইবেন। (২) মানুষে মানুষে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অসাম্য বিলোপ করিবার জন্য, নাগরিকদের মধ্যে সম্পদের সুষম বন্টন নিশ্চিত করিবার জন্য এবং প্রজাতন্ত্রের সর্বত্র অর্থনৈতিক উন্নয়নের সমাজ স্তর অর্জণের উদ্দেশ্যে সুষম সুযোগ-সুবিধাদান নিশ্চিত করিবার জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।"

এ নীতিমালা রাষ্ট্রের সকল পরিকল্পনাবিদ এবং নির্বাহী কর্মকর্তাদের জন্য একটি পালনীয় নির্দেশিকা। একই সঙ্গে এটি ব্যক্তি খাতের প্রতিষ্ঠানের জন্য বিনিয়োগ, এনজিও এবং সুশীল সমাজের জন্য সামাজিক উদ্যোগ এবং ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে জনসেবা প্রদানের জন্য একটি সার্বিক নির্দেশনা।

ক.২ বর্তমান প্রেক্ষাপট ও প্রবণতাঃ বিশ্বের অন্যান্য দেশ আইসিটি'র শক্তি কাজে লাগিয়ে অর্থনৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতি অর্জন করতে পেরেছে, বাংলাদেশ তা করতে পারেনি। সময়ের সাথে সাথে আইসিটি'র গুরুত্ব ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এখন পৃথিবীতে আইসিটি বিহীন ভবিষ্যত কল্পনা করা সম্ভব নয়। অন্যান্য আধুনিক প্রযুক্তির তুলনায় আইসিটির ক্ষেত্রে সম্পদের প্রয়োজনীয়তা অনেক কম এবং মানব সমাজের ভবিষ্যত নিবিড়ভাবে আইসিটির

সাথে সম্পর্কযুক্ত, তাই দেশের কর্মসূচীতে এ প্রযুক্তিকে সম্পৃক্ত করতে হবে এবং বর্তমান পশ্চাদপদতা কাটিয়ে আইসিটিতে অগ্রগামী দেশ হিসেবে দ্রুত উত্তরণ ঘটাতে একটি আগ্রহীঅগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে।

মাথাপিছু মাত্র ৬০০ মার্কিন ডলার জিএনপি হবার ফলে বাংলাদেশ এখনো স্বল্পোন্নত দেশ হিসেবে পরিচিত। সিটি-স্টেট দেশগুলো বিবেচনা না করা হলে প্রতি বর্গকিলোমিটারে ১০০০ জনের অধিক জনবসতির বসবাস হিসেবে বাংলাদেশ বিশ্বের সবচেয়ে ঘনবসতি দেশ। এ দেশের প্রাকৃতিক সম্পদও অত্যন্ত সীমিত। কিছু জ্বালানী সম্পদ রয়েছে, কিন্তু তা দেশের বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ জ্বালানী চাহিদা মেটানোর জন্য মোটেও যথেষ্ট নয়। দেশে একমাত্র যে সম্পদের প্রাচুর্য রয়েছে তা হলো যুব সমাজ।

দেশের জাতীয় লক্ষ্য হলো অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটিয়ে ১০ বৎসরের মধ্যে দেশকে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত করা, যা করতে হলে বর্তমান মাথাপিছু জিএনপি দ্বিগুণ করতে হবে। সামাজিক সাম্যতা এবং ন্যায়নীতির মাধ্যমে এ অর্থনৈতিক লক্ষ্য অর্জন করতে হবে।

সম্পদের যথাযথ ব্যবহার, স্বীকৃত দক্ষতা উন্নয়ন, কার্যকর যোগাযোগ ব্যবস্থা, মান সম্পন্ন শিক্ষা নিশ্চিত করে এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যাপক ব্যবহারের মাধ্যমে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার ৭.৫% এর উপরে উন্নীত করে নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে উপরোক্ত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জন করা সম্ভব। প্রবৃদ্ধির এই হার বজায় রেখে দেশের জিএনপি এঘচ বর্তমানের তুলনায় বিশগুণ বৃদ্ধি করা যায় এবং ত্রিশ বৎসরের মধ্যে দেশকে একটি উচ্চ আয়ের দেশে পরিণত করা সম্ভব।

ক.৩ কাঠামো ও অনুসৃত রীতি (Policy Structure & Conventions): একটি মাত্র রূপকল্প, ১০টি উদ্দেশ্য, ৫৬টি কৌশলগত বিষয়বস্তু এবং ৩০৬টি করণীয় বিষয়কে এ নীতিমালায় পিরামিড আকারে ক্রমবিভক্ত করে সাজানো হয়েছে। রূপকল্প ও উদ্দেশ্যকে জাতীয় লক্ষ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করা হয়েছে। বৃহত্তর উদ্দেশ্যের সাথে মিল রেখে কৌশলগত বিষয়বস্তু নির্ধারণ করা হয়েছে, যার সুফল আইসিটি ব্যবহারের মাধ্যমে পাওয়া যাবে। করণীয় বিষয়গুলো বাস্তবায়নের জন্য নিম্নরূপ মেয়াদ চিন্তা করা হয়েছে ঃ

স্বল্প মেয়াদী (১৮ মাস বা কম), মধ্য মেয়াদী (৫ বছর বা কম), এবং দীর্ঘ মেয়াদী (১০ বছর বা কম)।

তবে যেসকল করণীয় বিষয়াদি বাস্তবায়নে অপেক্ষাকৃত বেশী সময় লাগতে পারে, সেগুলো একাধিক মেয়াদব্যাপী বাস্তবায়নের সুপারিশ করা হয়েছে।

রূপকল্প, উদ্দেশ্য, কৌশলগত বিষয় ইত্যাদির প্রচলিত ধারণা ব্যক্তি এবং ক্ষেত্রের উপর নির্ভর করে ব্যাপকভাবে ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। এই নীতিমালার ক্ষেত্রে সংজ্ঞা সুনির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে ঃ

রূপকল্প (Vision) ঃ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ক্ষেত্রে জাতীয় প্রত্যাশা। উদ্দেশ্য (Objective) ঃ রূপকল্প অর্জনের জন্য পরস্পর সম্পর্কযুক্ত কতগুলো লক্ষ্যমাত্রা। কৌশলগত বিষয় (Strategic theme) ঃ নির্দিষ্ট কতগুলো করণীয় বিষয়ের উন্নয়ন ও বাস্তবায়নের জন্য ব্যাপকভিত্তিক সুপারিশ। কর্ম-পরিকল্পনা (Action item) ঃ কৌশলগত বিষয়ের আওতাভূক্ত একটি কাজ যার ফলাফল, সময়সীমা এবং বাস্তবায়নকারী সুনির্দিষ্ট।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (ICT) ঃ যে কোন প্রকারের তথ্যের উৎপত্তি, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ, সঞ্চালন এবং বিচ্ছুরনে ব্যবহৃত সকল ইলেকট্রনিক প্রযুক্তি।

খ. নীতিমালার স্বত্ত্বাধিকার, তদারকি এবং রিভিউ (Policy Ownership, Monitoring & Review)ঃ

জাতীয় জীবনে এই নীতিমালা বাস্তবায়নের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল স্টেক হোল্ডারকে এই নীতিমালার স্বত্ত্বাধিকার হতে হবে। সরকারের সর্বোচ্চ পর্যায়ে ও আলোচ্য নীতিমালার স্বত্ত্বাধিকার নিশ্চিত হতে হবে। সে অনুযায়ী এই নীতিমালার নিম্নরূপ স্বত্ত্ব বিবেচনা করা হয়েছে ঃ

আইসিটি'র দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী এই নীতিমালার তদারকী ও সমন্বয় সাধন করবেন। অন্যদিকে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল সংশ্লিষ্ট কর্ম-পরিকল্পনা বাস্তবায়ন এবং/অথবা বাস্তবায়নে সহযোগিতা করবে। সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং সরকারী প্রতিষ্ঠান স্ব স্ব ক্ষেত্রে আইসিটি নীতিমালা বাস্তবায়নে করবে। কোন ব্যত্যয় হলে সে ক্ষেত্রে জাতীয় আইসিটি টাস্কফোর্সের নির্দেশনা গ্রহণ করা হবে।

নীতিমালায় বর্ণিত কর্ম-পরিকল্পনার বাস্তবায়ন অবস্থা যাচাই, করণীয় বিষয়সমূহের পরিবর্তন এবং অগ্রাধিকার নিরূপনের জন্য প্রতিবছর করণীয় বিষয়সমূহ (Action Items) পর্যালোচনা করা হবে। নিত্য নতুন পরিবর্তন আঙ্গিকে বিশেষ লক্ষ্যসমূহকে পূনঃনির্ধারণের জন্য নীতিমালার কৌশলগত বিষয়গুলো প্রতি তিন বছর অন্তর পর্যালোচনা করা হবে। এছাড়া নীতিমালা বাস্তবায়নের সফলতা ও ব্যর্থতার ভিত্তিতে দীর্ঘমেয়াদী করণীয় বিষয়াদির সমন্বয় সাধনের নিমিত্তে প্রতি ছয় বছর পর পূর্ণ নীতিমালাটি পর্যালোচনা করা হবে।

জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা ২০০৯ এর রূপকল্প ও উদ্দেশ্যসমূহের সফল বাস্তবায়ন করা হলে আগামী প্রজন্মে বাংলাদেশ একটি জ্ঞানভিত্তিক সমাজে পরিণত হবে বলে আশা করা যায়।

গ. রূপকল্প (Vision) ঃ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সম্প্রসারণ এবং বহুমুখী ব্যবহারের মাধ্যমে একটা স্বচ্ছ, দায়বদ্ধ ও জবাবদিহিতামূলক সরকার প্রতিষ্ঠা করা; দক্ষ মানব সম্পদ উন্নয়ন নিশ্চিত করা; সামাজিক ন্যায়পরায়ণতা বৃদ্ধি করা; সরকারী-বেসরকারী খাতের অংশিদারিত্বে সুলভে জনসেবা প্রদান নিশ্চিত করা; এবং ২০২১ সালের মধ্যে দেশকে মধ্যম আয়ের দেশ এবং ত্রিশ বৎসরের মধ্যে উন্নত দেশের সারিতে উন্নীতকরণের জাতীয় লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করা।

ঘ. উদ্দেশ্য (Objective)ঃ ঘ.১ সামাজিক ন্যায়পরায়ণতা/সাম্যতা ঃ প্রতিবন্ধী অথবা বিশেষ সহায়তা লাগতে পারে এমন ব্যক্তিসহ সকলকে নিয়ে তথ্য ও যোগাযোগ পদ্ধতির মাধ্যমে সামাজিক ন্যায়পরায়ণতা, লিঙ্গ সমতা, সম সুযোগ এবং সম অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ করা। ঘ.২ উৎপাদনশীলতা ঃ কৃষি এবং ক্ষুদ্র, মাঝারি ও ছোট আকারের শিল্প খাতসহ অর্থনীতির সকল খাতে আইসিটি ব্যবহারের ম্যধ্যমে উচ্চতর উৎপাদনশীলতা অর্জন করা। ঘ.৩ সম্পূর্ণতা/অখন্ডতা ঃ জনসেবা প্রদানে স্বচ্ছতা, দায়বদ্ধতা, জবাবদিহিতা এবং অধিকতর দক্ষতা অর্জন। ঘ.৪ শিক্ষা ও গবেষণা ঃ আইসিটি ব্যবহারের মাধ্যমে শিক্ষার পরিধি এবং মান দেশব্যাপী সম্প্রসারণ করা; শিক্ষার সর্বস্তরে এবং সরকারী পর্যায়ে কম্পিউটার সাক্ষরতা নিশ্চিত করা; যথোপযুক্ত গবেষণা ও উন্নয়নের মাধ্যমে সৃষ্টিশীলতা উৎসাহিত করা; মেধাসম্পদ সৃষ্টি করা এবং জীবনের সকল ক্ষেত্রে আইসিটি আত্মীকরণ। ঘ.৫ কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ঃ স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারের কর্মসংস্থানের সুযোগ গ্রহণে বিশ্বমানের আইসিটি পেশাজীবী তৈরী। ঘ.৬ রপ্তানী উন্নয়ন ঃ অভ্যন্তরীণ ও বিশ্ববাজারের চাহিদা মেটাতে, বৈদেশিক বাণিজ্য হতে আয় বাড়াতে, বৈদেশিক বিনিয়োগ আকৃষ্ট করতে এবং আমদানী নির্ভরশীলতা কমাতে একটি সমৃদ্ধ সফ্‌টওয়্যার শিল্প, তথ্য প্রযুক্তিভিত্তিক সেবা প্রদান, ই-কমার্স/ই-বিজনেস এবং তথ্য প্রযুক্তি নির্মাণ শিল্পে উন্নয়ন নিশ্চিত করা। ঘ.৭ স্বাস্থ্য পরিচর্যা ঃ আইসিটির উদ্ভাবনী প্রয়োগের মাধ্যমে সকল নাগরিকের জন্য মান সম্পন্ন স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা। ঘ.৮ সর্বজনীন প্রবেশাধিকার (Universal Access) ঃ জনসেবার বাধ্যবাধকতা হিসেবে সবার জন্য ইন্টারনেট/টেলিকম সংযোগ নিশ্চিত করা। ঘ.৯ পরিবেশ, জলবায়ু ও দুযোর্গ ব্যবস্থাপনা ঃ একদিকে শিল্প এবং ভোক্তা নির্গত বর্জ্য এবং শিল্পোন্নত দেশ কর্তৃক অত্যধিক কার্বন ডাই অক্সাইড নির্গমনের ফলে বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধিওর কারণে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বাংলাদেশ দ্বৈত সংকটের মুখোমুখি। সেই সংকট নিরাময়ের জন্য আইসিটি ব্যবহারের মাধ্যমে পরিবেশ-বান্ধব সবুজ প্রযুক্তির উদ্ভাবন এবং আত্মীকরণ, দূষিত বর্জ্যের নিরাপদ ব্যবস্থাপনা, দুর্যোগের ক্ষেত্রে প্রস্তুতিমূলক সময় (response time) হ্রাস এবং জলবায়ু পরিবর্তন ব্যবস্থাপনায় কার্যকর পদক্ষেপ নিশ্চিত করা। ঘ.১০ আইসিটিতে সহায়তা প্রদান ঃ দেশব্যাপী আইসিটির কার্যকর ব্যবহার ও আত্মীকরণ নিশ্চিত করতে বিদ্যুৎ এবং আইনী কাঠামোসহ উপযুক্ত অবকাঠামো উন্নয়ন করা।

ঙ. কৌশলগত বিষয়বস্তু ঃ ১) সামাজিক সমতা ঃ অর্থনৈতিক বৈষম্য এবং ডিজিটাল ডিভাইড দূর করে (ক) নিম্ন আয়ের সম্প্রদায়, (খ) সংখ্যালঘু সম্প্রদায়, (গ) নারী এবং (ঘ) প্রতিবন্ধী ও বিশেষ সহায়তা প্রয়োজন পড়ে এমন ব্যক্তিদের মাঝে সেতুবন্ধন রচনা করে অনগ্রসর গোষ্ঠীদের মূলধারার সামাজিক সুযোগ-সুবিধা প্রদানের বিষয়টি অগ্রাধিকার হিসেবে বিবেচনা করা। ২) গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় বিষয় হিসেবে স্থানীয় ও কেন্দ্রীয় সরকারে এবং নীতি নির্ধারণে জনগণের অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করা। ৩) বেসরকারী খাত এবং এনজিও/সিএসও/সিবিও-কে স্থানীয় পর্যায়ের উপযুক্ত এবং আঞ্চলিক ভাষায় তৈরী ডিজিটাল বিষয়বস্তু উন্নয়ন ও অনলাইন সেবাসমূহ উন্নয়ন এবং প্রদানের জন্য উৎসাহ প্রদান। ৪) সংস্কৃতি, ঐতিহ্য এবং ধর্মের উৎকর্ষ সাধনে সাংস্কৃতিক বিষয়বস্তু উন্নয়ন ও সংরক্ষণ করা। ৫) ক্ষতিকর ডিজিটাল বিষয়বস্তু থেকে শিশুদের রক্ষাসহ শিশু সম্পর্কিত অন্যান্য বিষয় সর্বসমক্ষে তুলে ধরা।

২) উৎপাদনশীলতা ঃ ১) দেশব্যাপী ক্ষুদ্র, মাঝারী ও ছোট আকারের শিল্প এবং কৃষিখাতে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য আইসিটির সর্বোচ্চ ব্যবহার এবং উদ্ভাবনী ও প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব উৎসাহিত করা। ২) আইসিটি প্রয়োগের মাধ্যমে সর্বাধুনিক কৌশল এবং বাজার-সংবাদ সঞ্চালন এবং ব্যবহার নিশ্চিত করে কৃষি ক্ষেত্রে উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং সরবরাহ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা। ৩) ইআরপি এ্যাপ্লিকেশনের ব্যবহার উৎসাহিত করে বৃহৎ শিল্পের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং উন্নত তদারকী, দক্ষতার ঘাটতি চিহ্নিতকরণ, উপযুক্ত প্রশিক্ষণ এবং আধুনিক শিল্প পরিচালন নিশ্চিত করা। ৪) পরিচালনা পদ্ধতি এবং ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেমের অধিকতর অটোমেশনের মাধ্যমে সেবাখাতে টেকসই উৎপাদনশীলতা নিশ্চিত করা। ৫) অতিসত্ত্বর অর্থনীতিতে

উৎপাদনশীলতার ক্ষেত্রে নতুন ধারা প্রবর্তন করার জন্য যত দ্রুত সম্ভব ই-কমার্স, ই-পেমেন্ট এবং ই-লেনদেন উৎসাহিত করা।

৩) অখন্ডতা ঃ ১) তথ্য প্রযুক্তির সকল ক্ষেত্রে বাংলার ব্যবহার নিশ্চিত করা। ২) সিটিজেন চার্টার তদারকী এবং সেবা প্রদানের ফলাফল সর্বসমক্ষে প্রকাশের মাধ্যমে সরকারী সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে জনগণের হয়রানি হ্রাস করা, সময় ও ব্যয় সাশ্রয় করা এবং স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করা। ৩) তথ্যের সফল আদান-প্রদানের জন্য সরকারী অফিসসমূহের মধ্যে আন্তঃসংযোগ স্থাপন করা। ৪০ ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে সেবা প্রদানের জন্য গণকর্মচারীদের কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি ও নেতৃত্ব নিশ্চিত করা। ৫) ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে সকল সরকারী তথ্যের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা এবং আইসিটি নির্ভর জনসেবা প্রদান ব্যবস্থার স্থায়িত্ব নিশ্চিত করা। ৬) উন্নয়ন প্রকল্পের পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন ও কার্যকারিতা তদারকীর জন্য আইসিটি নির্ভর ব্যবস্থা প্রবর্তন করা। ৭) আইসিটি নির্ভর জনসেবা প্রদান ব্যবস্থার স্থায়িত্ব নিশ্চিতকরণ।

৪) শিক্ষা ও গবেষণা ঃ ১) আইসিটি শিল্পে দক্ষ পেশাজীবীর সাময়িক ঘাটতি পূরণের জন্য আইসিটি পেশাজীবীদের দক্ষতা পরিমাপ করে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ঘাটতি পূরণের লক্ষ্যে নিরবিচ্ছিন্ন শিক্ষার ব্যবস্থা করা এবং পেশাগত দক্ষতা যাচাই ও উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করা। ২) পাঠ্যসূচীকে বাজার চাহিদার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং শিল্প প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ঘনিষ্ট সহযোগিতা উৎসাহিত করা। ৩) আইসিটির উচ্চতর পর্যায়ে শিক্ষা ও গবেষণা পরিচালনার জন্য দীর্ঘমেয়াদী অর্থায়নের মাধ্যমে একটি আইসিটি সেন্টার অফ এক্সেলেন্স প্রতিষ্ঠা করা। ৪) প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষায় এবং কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণে আইসিটি কোর্স অন্তর্ভূক্ত করে দেশব্যাপী আইসিটি সাক্ষরতা সম্প্রসারণ করা। ৫) গণিত, বিজ্ঞান এবং ইংরেজী শিক্ষার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে সকল স্তরে শিক্ষার মান এবং পরিসর বৃদ্ধি করা। ৬) সরকারী পর্যায়ে সকলের আইসিটি সাক্ষরতা নিশ্চিত করা। ৭) ইডিসিপি, গণ সাক্ষরতা এবং আজীবন শিক্ষাসহ শিক্ষার সকল স্তরে আইসিটির ব্যবহার বৃদ্ধি করা। ৮) আইসিটি ব্যবহারের মাধ্যমে প্রতিবন্ধী এবং বিশেষ সহায়তা প্রয়োজন এমন ব্যক্তিদের শিক্ষা এবং গবেষণায় সম্পৃক্ত করা। ৯) সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশ্বমানের আইসিটি শিক্ষা নিশ্চিত করা এবং গবেষণা ও উদ্ভাবনে উৎসাহিত করার জন্য আইসিটি শিক্ষা স্নাতকোত্তর শিক্ষা প্রবর্তন করা।

৫) কর্মসংস্থান সৃষ্টি ঃ ১) স্থানীয় আইসিটি শিল্পে বিনিয়োগের জন্য উৎসাহ প্রদান করা। ২) দেশীয় ও বিশ্ববাজারে চাহিদার সাথে সামঞ্জস্য রেখে অধিক সংখ্যক আইসিটি পেশাজীবী তৈরীর জন্য প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতা উন্নয়ন করা। ৩) স্থানীয় আইসিটি শিল্পের জন্য দক্ষতা প্রমিতকরণ। ৪) বিশ্ববাজারে দক্ষ জনবলের কর্মসংস্থান সহজতর করা। ৫) আইসিটি পেশাজীবীদের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য আর্থিক সহায়তা করা।

৬. রপ্তানী উন্নয়ন ঃ ১) বাংলাদেশী আইসিটি পণ্য ও সেবা বিশ্ববাজারে বাজারজাতকরণের জন্য শক্তিশালী বিপণন ও ব্র্যান্ডিং করা। ২) সম্ভাবনাময় সফট্ওয়্যার ও আইটি ভিত্তিক সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের জন্য অর্থায়ন নিশ্চিত করা। ৩) নির্ভরযোগ্য আইসিটি অবকাঠামো উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ করা। ৪) রপ্তানী বৃদ্ধির জন্য বিশেষ সুবিধা প্রদান করা এবং শিল্প-বান্ধব নীতি ও উপযুক্ত পরিবেশ তৈরী করা। ৫) তথ্য প্রযুক্তির মান, প্রক্রিয়া, প্রযুক্তি, কর্মক্ষেত্র, ভ্যালু চেইন এবং হরপযব মার্কেট উন্নয়নের জন্য গবেষণা ও উন্নয়নের মাধ্যমে সৃজনশীলতা লালন করা।

৭) স্বাস্থ্য পরিচর্যা ঃ ১) টেলিমেডিসিন ও আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের ব্যবস্থাপনা উন্নত করা। ২) দূর্গম অঞ্চলসহ সকল পর্যায়ে সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি করা এবং শিশু, মাতৃ ও প্রজনন স্বাস্থ্যের উপর গুরুত্ব সহকারে পরিচর্যার সুবিধাসমূহ প্রাপ্তির ব্যবস্থা করা। ৩) স্বাস্থ্য সেবার মান নিশ্চিত করা। ৪) জাতীয় স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের ক্ষমতা বৃদ্ধি করা।

৮. তথ্য জগতে সার্বজনীন প্রবেশাধিকার ঃ ১) জনসেবার বাধ্যবাধকতা হিসেবে ৫ বৎসরের মধ্যে সকল নাগরিককে তথ্য জগতে প্রবেশের সুযোগ প্রদান করা। ২) সকল জেলা সদরে ইন্টারনেট ব্যাকবোন সম্প্রসারণ করে রাজধানীর সমপরিমান খরচে ইন্টারনেট সংযোগ প্রদান করা। ৩) জাতীয় টেলিকম নীতিমালা অনুযায়ী সুযোগ সুবিধা প্রদান করে ৫ বৎসরের মধ্যে দেশের সর্বত্র ইন্টারনেট এবং আইপি টেলিফোন সেবা সম্প্রসারণ করা। ৪) এনজিএন এবং লাইসেন্স বিহীন ব্যবস্থা সাগ্রহে অনুসরণ করে আইপি ভিত্তিক টেলিযোগাযোগ সর্বত্র সম্প্রসারণ করা এবং সবার জন্য সাশ্রয়ী করে তোলা।

৯) পরিবেশ, জলবায়ু এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ঃ ১) পরিবেশ-বান্ধব সবুজ প্রযুক্তি ব্যবহার করে পরিবেশ সংরক্ষণ উৎসাহিত করা। ২) আইসিটি ব্যবহারের মাধ্যমে পরিবেশ রক্ষায় উৎসাহিত করা। ৩) আইসিটি ভিত্তিক দুর্যোগ সতর্কীকরণ এবং ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তি ব্যবহার করে নাগরিকদের প্রাকৃতিক দূর্যোগ থেকে রক্ষা করা। ৪) আইসিটি

ব্যবহারের ফলে উদ্ভুত বিষাক্ত বর্জ্যের নিরাপদ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা। ৫) ত্রাণ ব্যবস্থাপনা এবং দূর্যোগ পরবর্তী কার্যক্রমের তদারকী নিশ্চিত করা।

১০) আইসিটিতে সহায়তা প্রদান ঃ ১) নির্ভরযোগ্য এবং সাশ্রয়ী বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করা।

তথ্যপ্রযুক্তি নীতিমালা ২০০৯ এ ওপরের নীতিমালাটির সাথে একটি কর্মপরিকল্পনা যুক্ত করা হয়েছে। এই কর্মপরিকল্পনাটি সম্পর্কে নিম্নরূপ বর্ননা রয়েছে।

চ. কর্ম-পরিকল্পনা ঃ অন্তর্গত করণীয় কর্ম-পরিকল্পগুলো আইসিটি নীতিমালার বাস্তব রূপ যা পরিশেষে নীতিমালার সাফল্য ও ব্যর্থতা পরিমাপ করবে। সন্নিবেশিত ৩০৬টি করণীয় বিষয়গুলো সমন্বিত হলেও সম্পূর্ণ নয়। কিছু করণীয় বিষয় তারকা চিহ্নিত করে একই উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বর্ণিত অন্যান্য কর্ম-পরিকল্পনার চেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

উপরে বর্ণিত উদ্দেশ্য এবং কৌশলগত বিষয়গুলোই কর্ম-পরিকল্পনাগুলোকে চালিত করবে। মূল উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে কর্ম-পরিকল্পনাগুলোকে প্রথমে সাধারনত একত্রিত করা হয়েছে এবং তারপর সেগুলোকে কৌশলগত বিষয়বস্তু অনুযায়ী ভাগ করা হয়েছে। সব উদ্দেশ্য ও সারণীর করণীয় বিষয়েরসমূহের ক্রমিক ধারাবাহিক ভাবে দেয়া হয়েছে। ০ইপ্রতিটি করণীয় বিষয়-এর জন্য স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদী বাস্তবায়নকাল দেখানো হয়েছে। সেখানে স্বল্প মেয়াদ বলতে ১৮ মাস ও তার কম সময়, মধ্য মেয়াদ বলতে ১৮ মাসের অধিক কিন্তু ৫ বৎসরের কম এবং দীর্ঘ মেয়াদ বলতে ৫ বৎসর থেকে অনধিক ১০ বৎসর সময় বুঝানো হয়েছে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি দ্রুত পরিবর্তনশীল এমন একটি খাত যেখানে আগামী ২ (দুই) বছরেই কি পরিবর্তন হতে পারে তা অনুমান করা সম্ভব নয়। স্বল্প মেয়াদী করণীয় বিষয়গুলোকে বর্তমান সময়ের চাহিদা হিসেবে নিরূপণ করা হয়েছে। অন্যদিকে, মধ্য মেয়াদী এবং দীর্ঘ মেয়াদী করণীয় বিষয়গুলো বাস্তবতা এবং আইসিটি খাতের উন্নয়নের প্রেক্ষিতে প্রতিবছর নতুন করে বিবেচনা করার প্রয়োজন রয়েছে।

করণীয় বিষয়গুলো বাস্তবায়নের নিমিত্তে জাতীয় বাজেটে আলাদা বরাদ্দ রাখা প্রয়োজন হবে। তথ্য প্রযুক্তি সংক্রান্ত নিয়মিত কর্মকান্ড পরিচালনার ও ই-গভর্নেন্সের জন্য প্রত্যেক মন্ত্রণালয়, দফতর ও সংস্থাসমূহের আর্থিক বরাদ্দ প্রদান করতে হবে। এছাড়াও সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে প্রতিযোগিতামূলক ভাবে আইসিটি উন্নয়ন-এর নিমিত্তে তহবিল যোগানের জন্য বার্ষিক বাজেট পরিকল্পনায় অনুদানের মাধ্যমে একটি আইসিটি উন্নয়ন তহবিল গঠন করা যেতে পারে।

কৌশলগত বিষয়বস্তু ১.১: অর্থনৈতিক বৈষম্য এবং ডিজিটাল ডিভাইড দূর করে (ক) নিম্ন আয়ের সম্প্রদায়, (খ) সংখ্যালঘু সম্প্রদায়, (গ) নারী এবং (ঘ) প্রতিবন্ধী ও বিশেষ সহায়তা প্রয়োজন পড়ে এমন ব্যক্তিদের মাঝে সেতুবন্ধন রচনা করে অনগ্রসর গোষ্ঠীদের মূলধারার সামাজিক সুযোগ-সুবিধা প্রদানের বিষয়টি অগ্রাধিকার হিসেবে বিবেচনা করা। ১) কম্পিউটার, ইন্টারনেট এবং ই-সিটিজেন সেবাসমূহে প্রবেশাধিকারের বন্দোবস্ত করতে বেসরকারী উদ্যোগে কমিউনিটি ই-সেন্টার (টেলিসেন্টার) স্থাপন ও পরিচালনার ব্যবস্থাকরণ। স্বল্পোন্নত এলাকা এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য সাশ্রয়ী ব্যান্ডউইড্থ এর মাধ্যমে প্রাসঙ্গিক বিষয়াদি, মূল্য বিষয়ক তথ্যাদি প্রদানের ব্যবস্থাকরণ। সরকারী এবং স্থানীয় সরকারের সেবাসমূহ স্বল্প মূল্যে প্রদানের ব্যবস্থাকরণ। ২) সিটি কর্পোরেশন, উপজেলা পরিষদ, পৌরসভা এবং ইউনিয়ন পরিষদে কমিউনিটি ই-সেন্টার স্থাপন। ৩) সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলোতে জনগণের জন্য হেল্পডেস্ক স্থাপন। সংশ্লিষ্ট সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানেই হোস্ট স্থাপিত হবে তা নয়। এসব কল সেন্টারের জন্য টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলো স্বল্প মূল্যে অথবা টোল-ফ্রি নম্বর সুবিধা দিবে। ৪) শারিরীকভাবে অক্ষম এবং বিশেষ সহায়তা লাগতে পারে এমন ব্যক্তিদের বিষয় বিবেচনায় রেখে সাশ্রয়ী বাংলা টেক্সট প্রসেসিং টুল্‌স এবং মুদ্রিত বিষয় হতে অডিও তৈরীর সফট্ওয়্যার উন্নয়নে সুবিধা প্রদান করা হবে। ৫) আইএসপি লাইসেন্স ব্যবস্থা সংশোধনপূর্বক সরকার থেকে ইন্টারনেট সেবা প্রদানকারীদের বিশেষ ব্যবস্থা যেমন টঋঙ তহবিল, আর্থিক এবং কর সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে পল্লী অঞ্চলে ইন্টারনেট সংযোগের নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ নিশ্চিতকরণ। ৬) ভোটার আইডিকে জাতীয় পরিচয় পত্রে সম্প্রসারিত করার মাধ্যমে সর্বতোপ্রকার নাগরিক সেবায় যেমন জন্ম-নিবন্ধন, পাসপোর্ট, ব্যাংক একাউন্ট, স্কুলে ভর্তি, স্বাস্থ্য সেবা, টিকা, ভিজিএফ/ভিজিডি এবং অন্যান্য সামাজিক নিরাপত্তার ক্ষেত্রে ব্যবহার। ৭) ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে সরকারী অনুদানের জন্য আবেদন করা এবং গ্রহণের জন্য সকল নাগরিককে উপযুক্ত করে গড়ে তোলা। ৮) দেশের যে কোন স্থান হতে জীবিকা এবং মানবসম্পদ উন্নয়ন সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ নাগরিক সেবাসমূহ অনলাইনে পাবার ব্যবস্থাকরণ। ৯) সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জন্য বিশেষায়িত আইসিটি শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ। ১০) দেশীয় কারিগরদের (Indigenous artisans) জন্য ওয়েব ও মোবাইল ভিত্তিক ই-কমার্স ব্যবস্থা প্রবর্তন। ১১) নারী নেতৃত্বে

পরিচালিত ক্ষুদ্র শিল্পের বাজার সম্প্রসারণের জন্য মহিলাদের ই-কমার্স সেন্টার স্থাপন। ১২) বাংলাদেশ টেলিভিশনের স্বল্প ব্যবহৃত terrestrial চ্যানেলকে ব্যবহার করে একটি উন্নয়নমূলক টিভি চ্যানেল চালুকরণ।

কৌশলগত বিষয়বস্তু ১.২: গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় বিষয় হিসেবে স্থানীয় ও কেন্দ্রীয় সরকারে এবং নীতি নির্ধারণে জনগণের অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করা। ১৩) ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে জনগণের সমস্যা সম্পর্কে জানানোর ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ। সরকার এবং স্থানীয় সরকার কর্তৃক এ জাতীয় সমস্যা সম্পর্কে তাঁদের অবস্থান জানানোর ব্যবস্থা উন্নয়ন করা। ১৪) জনগণের মতামত গ্রহণের উদ্দেশ্যে সকল নতুন প্রণীতব্য নীতিমালা সরকারের ওয়েব সাইটে প্রকাশের ব্যবস্থাকরণ।

কৌশলগত বিষয়বস্তু ১.৩: বেসরকারী খাত এবং এনজিও/সিএসও/সিবিও-কে স্থানীয় পর্যায়ের উপযুক্ত এবং আঞ্চলিক ভাষায় তৈরী ডিজিটাল বিষয়বস্তু উন্নয়ন ও অনলাইন সেবাসমূহ উন্নয়ন এবং প্রদানের জন্য উৎসাহ প্রদান। ১৫) আঞ্চলিক ভাষায় স্থানীয় পর্যায়ের উপযুক্ত বিষয়াদি তৈরীর জন্য অনুদান প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ। এর মধ্যে অন্তর্ভূক্ত হতে পারে শিক্ষার উদ্দেশ্যে নির্মিত, ক্ষমতা উন্নয়নে সহায়ক ডিজিটাল বিষয়বস্তু, বিতরণের জন্য জীবন ও জীবিকা সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদি, ইত্যাদি।

কৌশলগত বিষয়বস্তু ১.৪: সংস্কৃতি, ঐতিহ্য এবং ধর্মের উৎকর্ষ সাধনে সাংস্কৃতিক বিষয়বস্তু উন্নয়ন ও সংরক্ষণ করা। ১৬) স্বকীয় সংস্কৃতি, ঐতিহ্য এবং ধর্ম বিষয়ক মাল্টিমিডিয়া বিষয়বস্তু সংরক্ষণ এবং বিতরণ উৎসাহিত করা।

কৌশলগত বিষয়বস্তু ১.৫: ক্ষতিকর ডিজিটাল বিষয়বস্তু থেকে শিশুদের রক্ষাসহ শিশু সম্পর্কিত অন্যান্য বিষয় সর্বসমক্ষে তুলে ধরা। ১৭) শিশুতোষ ডিজিটাল বিষয়বস্তু উন্নয়নে অনুদান প্রদান। এতে অন্তর্ভূক্ত হতে পারে শিশু শিক্ষা বিষয়ক এবং সচেতনতা উন্নয়নমূলক ডিজিটাল বিষয়বস্তু। ১৮) ওয়েবসাইট এবং টিভি প্রোগ্রামের মাধ্যমে শিশুদের জন্য ক্ষতিকারক বিষয়াদি ফিল্টার করা সম্পর্কে অভিভাবকদের প্রশিক্ষিত করা। ১৯) শিশুদের জন্য ক্ষতিকারক ওয়েবসাইটসমূহে প্রবেশ নিয়ন্ত্রণে আইএসপিদের প্রশিক্ষিত করা। ২০) শিশুদের জন্য ক্ষতিকারক বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির জন্য প্রোগ্রাম তৈরী।

উদ্দেশ্য # ২: উৎপাদনশীলতা: কৌশলগত বিষয়বস্তু ২.১: দেশব্যাপী ক্ষুদ্র, মাঝারী ও ছোট আকারের শিল্প এবং কৃষিখাতে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য আইসিটির সর্বোচ্চ ব্যবহার এবং উদ্ভাবনী ও প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব উৎসাহিত করা। ২১) ব্যবসার জন্য আইসিটির বর্তমান অবস্থা এবং সেবার প্রাপ্যতা সম্পর্কে সমীক্ষা পরিচালনা। ২২) ITES এর উপকার এবং এর সম্ভাবনা সম্পর্কে গণসচেতনতা তৈরী করতে মিডিয়াতে প্রচারণা চালানোর ব্যবস্থাকরণ। ২৩) স্থানীয় শিল্পোদ্যোগ সংক্রান্ত মেলা, প্রদর্শনী, ওয়ার্কশপ, রোড শো এবং অন্যান্য রহঃবৎধপঃরাব প্রোগ্রাম আয়োজন। ২৪) শিল্পের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য দক্ষ জনবল উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকারি ও বেসরকারি খাতের যৌথ উদ্যোগে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের সম্ভাবনা যাচাই। ২৫) ঢাকা এবং অন্যান্য বিভাগীয় সদরে আইসিটি-নির্ভর মডেল SMME (প্রত্যেক প্রকারের একটি করে) প্রতিষ্ঠা করা। ২৬) দেশের সকল গ্রামাঞ্চল পর্যন্ত ইন্টারনেট সংযোগের ব্যবস্থাকরণ। ২৭) কৃষি, খাদ্য এবং ঝগগউ সম্পর্কিত বাংলা বিষয়বস্তু উন্নয়ন। ২৮) SMME-র জন্য ই-কমার্স ব্যবস্থা চালুকরণ। ২৯) কমিউনিটিগুলোর মধ্যে নেটওয়ার্ক তৈরীর মাধ্যমে কীটপতঙ্গ নিয়ন্ত্রণ, শস্য সংরক্ষণ ইত্যাদি সম্পর্কিত স্বকীয় জ্ঞান এবং উদ্ভাবনসমূহ আদান-প্রদান করা।

কৌশলগত বিষয়বস্তু ২.২: আইসিটি প্রয়োগের মাধ্যমে সর্বাধুনিক কৌশল এবং বাজার-সংবাদ সঞ্চালন এবং ব্যবহার নিশ্চিত করে কৃষি ক্ষেত্রে উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং সরবরাহ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা।

৩০) বিভিন্ন অঞ্চলের স্থানীয় সরবরাহ ব্যবস্থাপনাসহ কৃষিখাতের প্রয়োজনকে প্রাধান্য দিয়ে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের (SME) জন্য রিসোর্স সেন্টার প্রতিষ্ঠা করা। ৩১) সামাজিক, কমিউনিটি ভিত্তিক প্রতিষ্ঠান ও সরকারের সব নির্বাহী স্তরে ই-গভনের্ন্স চালু করা। ৩২) বাণিজ্য মেলা, প্রদর্শনী, সেমিনার, ওয়ার্কশপ এর আয়োজন করা। ৩৩) বিবিধ ইলেক্ট্রনিক চ্যানেলের মাধ্যমে ব্যবহার করা যাবে এমন বিজনেস পোর্টালের মাধ্যমে কৃষি খাতের সরবারহ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন। ৩৪) কৃষি খাতের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি ও জ্ঞান আহরনের উদ্দেশ্যে প্রবাসী বাংলাদেশী এবং আন্তর্জাতিক গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে ওয়ার্কশপ আয়োজন। ৩৫) আইসিটি ব্যবহার করে কৃষক ও শ্রমিকদের আধুনিক প্রযুক্তি, ঋণ ব্যবস্থা, ইত্যাদি সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ প্রদান করা। ৩৬)উৎপাদন এবং কৃষি প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের জন্য কৃষকের প্রয়োজনের আলোকে উন্নয়নকৃত দূরশিক্ষণের মাধ্যমে কৃষকদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা। ৩৭)কৃষি পণ্যের চাহিদা-সরবরাহ এবং বাজার সম্পর্কিত হালনাগাদ তথ্য সরবরাহ। ৩৮) অঞ্চলভিত্তিক শস্য উৎপাদনের উপযোগিতা, ল্যান্ড জোনিং, মাটির উর্বরতা শক্তি এবং সার প্রয়োগের মাত্রা সম্পর্কিত তথ্যাদি বিশে�ষনের জন্য জি-আই-এস ভিত্তিক মৃত্তিকা ম্যাপিং পদ্ধতি ব্যবহার করা। ৩৯) পশুসম্পদ, মুরগী এবং

মৎস্য সম্পদের দ্রুত রোগনির্ণয় এবং চিকিৎসার জন্য পরামর্শ নিশ্চিতকরণ। ৪০) কৃষক এবং কৃষিপণ্যের ব্যবসার জন্য মোবাইল ব্যাংকিং এর ব্যবস্থা করা। ৪১) কৃষিপণ্যের সরবরাহ ব্যবস্থা সম্প্রসারনের জন্য ইন্টারনেট এবং মোবাইল নির্ভর বাণিজ্যিক ব্যবস্থা উন্নয়ন করা।

কৌশলগত বিষয়বস্তু ২.৩: ইআরপি এ্যাপ্লিকেশনের ব্যবহার উৎসাহিত করে বৃহৎ শিল্পের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং উন্নত তদারকী, দক্ষতার ঘাটতি চিহ্নিতকরণ, উপযুক্ত প্রশিক্ষণ এবং আধুনিক শিল্প পরিচালন নিশ্চিত করা। ৪২) উপজেলা পর্যন্ত যৌথ পরিবীক্ষণ ও পর্যালোচনা বিষয়ক টাস্কফোর্স গঠন। ৪৩) খাত-ভিত্তিক ঊজচ সিস্টেম্‌স প্রবর্তনের জন্য পরীক্ষামূলক প্রকল্প গ্রহণ। ৪৪) উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য স্ট্র্যাটেজিক ম্যানেজমেন্টে পরামর্শ প্রদান সম্পর্কিত ক্ষমতা উন্নয়ন করা। ৪৫) জ্বালানীর দক্ষ ব্যবহার, আন্তর্জাতিক মান যেমন ওঝঙ বিষয়ে যোগ্যতা, লিন সিগু সিগমা, আধুনিক উৎপাদন পদ্ধতি, ইত্যাদি সংক্রান্ত ইলেকট্রনিক শিক্ষা উপকরণ তৈরী এবং বিতরণের ব্যবস্থা।

কৌশলগত বিষয়বস্তু ২.৪: পরিচালনা পদ্ধতি এবং ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেমের অধিকতর অটোমেশনের মাধ্যমে সেবাখাতে টেকসই উৎপাদনশীলতা নিশ্চিত করা।

৪৬) বিভাগীয় পর্যায়ে আইসিটি নির্ভর অটোমেশন এবং এমআইএস (MIS) মডেল স্থাপন। ৪৭) খাত-ভিত্তিক এমআইএস (MIS) প্রবর্তনের জন্য পরীক্ষামূলক প্রকল্প গ্রহণ।

কৌশলগত বিষয়বস্তু ২.৫: অতিসত্ত্বর অর্থনীতিতে উৎপাদনশীলতার ক্ষেত্রে নতুন ধারা প্রবর্তন করার জন্য যত দ্রুত সম্ভব ই-কমার্স, ই-পেমেন্ট এবং ই-লেনদেন উৎসাহিত করা।

৪৯) সার্টিফাইং অথরিটি প্রতিষ্ঠা করা। ৫০) বিচার বিভাগ এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোর ক্ষমতা উন্নয়নের জন্য কর্মসূচি গ্রহণ করা।

উদ্দেশ্য #৩: সম্পূর্ণতা/অখন্ডতা: কৌশলগত বিষয়বস্তু ৩.১: তথ্য প্রযুক্তির সকল ক্ষেত্রে বাংলার ব্যবহার নিশ্চিত করা। ৫১) প্রমিত বাংলা কী-বোর্ড এর ব্যবহার সম্প্রসারণ করা এবং সংশ্লিষ্ট সমস্যাগুলোর (যদি থাকে) সমাধান করা। ৫২) ইউনিকোড এবং ওঝঙ -এর সাথে সামজস্যপূর্ণ রাখার জন্য বাংলা এনকোডিং পদ্ধতির হালনাগাদ করণ। ৫৩) প্রমিত এনকোডিং ব্যবহার করে ডকুমেন্টসমূহের সুবহনীয়তা (Portability) নিশ্চিত করে সকল সরকারি প্রকাশনার বাংলা ডিজিটাল প্রকাশনা করা। ৫৪) ইউনিকোড কনসোর্টিয়ামের সদস্যপদ গ্রহণ করা।

কৌশলগত বিষয়বস্তু ৩.২: সিটিজেন চার্টার তদারকী এবং সেবা প্রদানের ফলাফল সর্বসমক্ষে প্রকাশের মাধ্যমে সরকারী সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে জনগণের হয়রানি হ্রাস করা, সময় ও ব্যয় সাশ্রয় করা এবং স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করা। ৫৫) ই-সিটিজেন সেবা প্রদানের জন্য 'ওয়ানস্টপ শপ' হিসাবে জাতীয় ওয়েব পোর্টাল উন্নয়ন করা। ৫৬) মোবাইল ফোন, এটিএম এবং অন্যান্য সেবা দান কেন্দ্রের মাধ্যমে দিবসের যে কোন সময় যে কোন স্থান থেকে বিল পরিশোধের ব্যবস্থা করা। ৫৭) কোর্টে চলমান মামলার বর্তমান অবস্থা অনলাইনে জানার ব্যবস্থা করা। ৫৮) থানায় সাধারন ডায়েরী (GD) এবং FIR ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে করার ব্যবস্থা করা। ৫৯) ইন্টারনেট এবং মোবাইল ফোনের মাধ্যমে পরিবহন সময়সূচী ও ভাড়ার তথ্য এবং টিকেট ক্রয়ের ব্যবস্থা করা। ৬০) বিদেশী বিনিয়োগকারীদের জন্য অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন এবং ওয়ার্ক পারমিটের ব্যবস্থা করা। ৬১) অনলাইনে ভ্যাট রেজিস্ট্রেশনের ব্যবস্থা করা। ৬২) অনলাইনে আয়কর রিটার্ন জমা দেয়ার ব্যবস্থা করা। অনলাইনের মাধ্যমে সম্পূর্ন অর্থবৎসরের আয়কর একত্রে অথবা পর্যায়ক্রমে পরিশোধের ব্যবস্থা প্রবর্তন করা। ৬৩) অনলাইনে পাসর্পোট প্রদান/নবায়নের ব্যবস্থা করা। ৬৪) ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে মোটর গাড়ীর রেজিস্ট্রেশন এবং মালিকানা হস্তান্তরের ব্যবস্থা করা। ৬৫) অনলাইনে ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রদান/নবায়নের ব্যবস্থা করা। ৬৬) অনলাইনে ট্রেড লাইসেন্স প্রদান/নবায়নের ব্যবস্থা করা। ৬৭) জনসাধারণ কর্তৃক ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে দুর্নীতি সম্পর্কিত রির্পোট প্রদানের ব্যবস্থা করা। ৬৮) হজ্বে গমনেচ্ছুদের জন্য অনলাইনে আবাসনের ব্যবস্থা এবং টিকেট ক্রয়ের ব্যবস্থা করা। ৬৯) অনলাইনে সম্পত্তি রেজিস্ট্রেশনের ব্যবস্থা করা। ৭১) কার্গো থেকে দ্রুত কাস্টমস ক্লিয়ারেন্স এর ব্যবস্থা করা। ৭২) ইলেকট্রনিক পদ্ধতির সাহায্যে কনসুলার দ্বারা সত্যায়নের ব্যবস্থা করা। ৭৩) দুগ্ধ এবং দুগ্ধজাত দ্রব্যের সংগ্রহ কেন্দ্রে তথ্য কেন্দ্র স্থাপন করা। ৭৪) ব্রিজের টোল সংগ্রহ পদ্ধতির আধুনিকায়ন। ৭৫) অনলাইন জব ব্যাংক চালুকরণ। ৭৬) মুক্তিযোদ্ধাদের ডাটাবেজ উন্নয়ন করা। ৭৭) ইক্ষু উৎপাদনকারীদের জন্য এসএমএস/ আইভিআর ভিত্তিক পদ্ধতি চালুকরণ। ৭৮) ভূমি ব্যবস্থাপনা এবং রেজিস্ট্রেশন পদ্ধতির কম্পিউটারায়ন। ৭৯) সিটিজেন চার্টার অনলাইনে প্রকাশ এবং তা অনুসরনের ব্যবস্থা করা। ৮০) জনগণ এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য প্রয়োজনীয় আন্তঃব্যাংক লেন-দেনের জন্য ইলেকট্রনিক পেমেন্ট গেটওয়ে স্থাপন করা। ৮১) সব উন্মুক্ত দরপত্র অনলাইনে

প্রকাশের ব্যবস্থা করা। ৮২) বাংলাদেশী ওঞউঋ সেবাদানকারীদের দ্বারা পরিচালিত টেন্ডার পোর্টালগুলোর অন্তত একটিতে সরকারি পর্যায়ের দরপত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ব্যবস্থা করা।

কৌশলগত বিষয়বস্তু ৩.৩: তথ্যের সফল আদান-প্রদানের জন্য সরকারী অফিসসমূহের মধ্যে আন্তসংযোগ স্থাপন করা। ৮৩) সরকারি পর্যায়ের সব প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ফাইল এবং তথ্য আদান-প্রদানের জন্য আইসিটি ব্যবহার করা। অনুপ্রানিত করার জন্য সংশি্লষ্ট সরকারি কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা। ৮৪) জাতীয় পর্যায়ে নেটওয়ার্ক তৈরী করে সব সরকারি প্রতিষ্ঠানকে সংযুক্তকরণ। ৮৫) আইপি টেলিফোন এবং ভিডিও কনফারেন্সিং এর জন্য প্রয়োজনীয় নীতিমালা তৈরী এবং গুরুত্বপূর্ণ সরকারি দপ্তরে তা চালু করার ব্যবস্থাকরণ। ৮৬) পাবলিক নেটওয়ার্ক নিয়ন্ত্রণ এবং ব্যবস্থাপনার জন্য ন্যাশনাল ডাটা রিসোর্স সেন্টার স্থাপন যা জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংরক্ষণ ও সরবরাহের জন্য জাতীয় ডাটাবেজ হিসেবে কাজ করবে। ৮৭) ওয়েব-ভিত্তিক ব্যবস্থা এবং ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে সরকারি পর্যায়ের কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

কৌশলগত বিষয়বস্তু ৩.৪: ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে সেবা প্রদানের জন্য গণকর্মচারীদের কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি ও নেতৃত্ব নিশ্চিত করা। ৮৮) সরকারি পর্যায়ে সকল প্রথম শ্রেণী ও দ্বিতীয় শ্রেণীর নিয়োগের ব্যবহারিক পরীক্ষায় (মৌখিক পরীক্ষার পূর্বে) কম্পিউটার ও ইন্টারনেটের মৌলিক বিষয় অন্তর্ভূক্ত করণ। ৮৯) ক্যাডার সার্ভিসের সিনিয়র স্কেলে পদোন্নতির ক্ষেত্রে কম্পিউটার ও ইন্টারনেটের প্রায়োগিক বিষয়ে ৫০ নম্বরের (বর্তমানের ৩০০ নম্বর এর সাথে) একটি পরীক্ষা প্রবর্তন করা। ৯০) কম্পিউটার ও ইন্টারনেটের মৌলিক বিষয়ে প্রায়োগিক জ্ঞান জাতীয় বেতন স্কেলের ১ ও ২ নং গ্রেডে পদোন্নতির ক্ষেত্রে অপরিহার্য করা। ৯১) বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদন (ACR) এ কম্পিউটার এবং ইন্টারনেটের মৌলিক জ্ঞান সংক্রান্ত নতুন একটি নির্ণায়ক সংযোজন। ৯২) সরকারি পর্যায়ে স্টেনোটাইপিস্ট পদে নিয়োগ বন্ধ করা। স্টেনো টাইপিস্ট পদে বর্তমানে কর্মরত সকলকে যথোপযুক্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ডাটা এন্ট্রি অপারেটর পদে রূপান্তর করা। ৯৩) সরকারি পর্যায়ের প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের আইসিটি এবং ই-গভর্নেন্স কারিকুলামে change management এবং process re-engineering বিষয়াদি প্রাধান্য দিয়ে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনতে হবে। ৯৪) সেবা প্রদান এবং প্রশাসনিক কাজে আইসিটির যথাযথ ব্যবহার সম্পর্কে সকল শীর্ষ কর্মকর্তাদের অবহিতকরণ। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অনুমোদনক্রমে সংস্থাপন মন্ত্রণালয় কর্তৃক এ কার্যক্রম পরিচালিত হতে হবে। ৯৫) ই-গভর্নেন্স ফোকাল পয়েন্টের কর্ম পরিধি এবং বাজেট যথাযথভাবে পুনর্বিন্যাস করে প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রম গ্রহণ, উৎসাহিত করার জন্য আনুতোষিক এবং আইসিটি ব্যবহারের মাধ্যমে সেবা প্রদানের জন্য নেতৃত্ব উন্নয়ন করা। ৯৬) সরকারি পর্যায়ের সকল প্রতিষ্ঠানে আইসিটি পেশাজীবী দ্বারা সজ্জিত আইসিটি সেল স্থাপন। এ সেলের জন্য আইসিটি সংশ্লিষ্ট পদ সৃজন করা। সরকারি পর্যায়ের সকল আইসিটি সংশ্লিষ্ট পদকে কারিগরি পদ হিসেবে চিহ্নিতকরণ। ৯৭) বেসরকারী পর্যায়ের সমতুল্য বিশেষ বেতন ও সুযোগ সুবিধা সহাকরে সরকারি পর্যায়ে সকল প্রতিষ্ঠানে পদ সৃজনের ক্ষেত্রে পদোন্নতিযোগ্য কম্পিউটার জনকাঠামো তৈরীকরণ (ক্ষেত্র বিশেষে পদসহ পদোন্নতির সুবিধা প্রদান)। ৯৮) আইসিটি জনবলকে কারিগরি ভাতা প্রদান করে সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহে কারিগরি কাজ (সিস্টেম্স এনালাইসিস, process re-engineering, সাপোর্ট, রক্ষণাবেক্ষণ, আপগ্রেড, প্রজেক্ট ব্যবস্থাপনা) সম্পাদন।

কৌশলগত বিষয়বস্তু ৩.৫: ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে সকল সরকারী তথ্যের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা এবং আইসিটি নির্ভর জনসেবা প্রদান ব্যবস্থার স্থায়িত্ব নিশ্চিত করা। ৯৯) যথাযথ ইলেকট্রনিক পদ্ধতি যেমন এস.এম.এস এবং অন্যান্য মাধ্যম ব্যবহার করে সরকারি পর্যায়ের যাবতীয় তথ্য জনগনের কাছে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করা। ১০০) সকল প্রতিষ্ঠানের ই-গভর্নেন্স উদ্যোগের জন্য উন্নয়ন বাজেটে অর্থের সংস্থান করা এবং এ সকল উদ্যোগের পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য রাজস্ব বাজেটে অর্থের বরাদ্দ প্রদান। ১০১) বেসরকারী উদ্যোগে আইসিটির মাধ্যমে সেবা প্রদানের জন্য সরকারি-বেসরকারী যৌথ উদ্যোগ উৎসাহিত করণ।

কৌশলগত বিষয়বস্তু ৩.৬: উন্নয়ন প্রকল্পের পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন ও কার্যকারিতা তদারকীর জন্য আইসিটি নির্ভর ব্যবস্থা প্রবর্তন করা ১০২) বৈদেশিক সাহায্য প্রাপ্তি ও বরাদ্দ ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে পরিবীক্ষণের ব্যবস্থাকরণ। ১০৩) আইসিটি ব্যবহারের মাধ্যমে উন্নয়ন প্রকল্পের কার্যকারিতা মূল্যায়নের জন্য জনগণের সাথে মত বিনিময়। ১০৪) প্রকল্প পরিকল্পনা এবং প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দে কম্পিউটার ভিত্তিক ব্যবস্থার প্রচলন।

উদ্দেশ্য #৪: শিক্ষা ও গবেষণা: কৌশলগত বিষয়বস্তু ৪.১: আইসিটি শিল্পে দক্ষ পেশাজীবীর সাময়িক ঘাটতি পূরণের জন্য আইসিটি পেশাজীবীদের দক্ষতা পরিমাপ করে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ঘাটতি পূরণের লক্ষ্যে নিরবিচ্ছিন্ন শিক্ষার ব্যবস্থা করা এবং পেশাগত দক্ষতা যাচাই ও উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করা। ১০৫) আইসিটি পেশাগত দক্ষতা যাচাই ও উন্নীতকরণ কর্মসূচি (IPSAEP) চালুকরণ ।

কৌশলগত বিষয়বস্তু ৪.২: পাঠ্যসূচীকে বাজার চাহিদার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং শিল্প প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ঘনিষ্ট সহযোগিতা উৎসাহিত করা। ১০৬) শিক্ষা পরিকল্পনার স্বার্থে দেশে ও বিদেশে শ্রম চাহিদা নিরূপনের জন্য Labour Marked Information System (LMIS) উন্নয়ন। ১০৭) আইসিটি'র ছাত্র/গ্র্যাজুয়েটদের আইসিটি শিল্পের সাথে সেতুবন্ধন স্থাপনে উৎসাহ প্রদানের জন্য কার্যক্রম গ্রহণ। আইসিটি শিল্প তাদের জনবলের অন্তত ৫ শতাংশ ইন্টার্ণশিপ-এর জন্য উন্মুক্ত করবে। ১০৮) আইসিটি শিল্প, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং সরকারের সম্মিলিত উদ্যোগে দেশের চাহিদা মাফিক গবেষণা প্রকল্প গ্রহণ। ১০৯) সফট্ওয়্যার ডিজাইন, উন্নয়ন, গুণগতমান নিশ্চিতকরণ এবং প্রকল্প ব্যবস্থাপনার জন্য আইসিটি শিল্পের Certification -এর মাধ্যমে পেশাগত মানের ক্রমাগত উন্নয়নের (continuous professional development) ব্যবস্থাকরণ। ১১০) হার্ডওয়্যার, নেটওর্য়াক ট্রাবলশুটিং ও রক্ষণাবেক্ষণ, সিস্টেম ইনটিগ্রেশন এবং নেটওয়ার্ক ডিজাইন এর জন্য আইসিটি শিল্পের Certification -এর মাধ্যমে পেশাগত মানের ক্রমাগত উন্নয়নের (continuous professional development) ব্যবস্থাকরণ। ১১১) সাফল্যের মাপকাঠি চিহ্নিত করে প্রবাসী বাংলাদেশীদের (NRBs) সহায়তা টেকনোলজী ট্রান্সফার কার্যক্রম গ্রহণ। ১১২) প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে বাংলাদেশের জন্য সুবিধাজনক আইসিটি এবং ওএঞউঝ বা সংশি্লষ্ট সেবাখাত (ওয়েব ও মোবাইল কনটেন্ট উন্নয়ন, এ্যানিমেশন, কম্পিউটার গেম্স, প্রকাশনা, আর্থিক লেন-দেন সংক্রান্ত কাজ ইত্যাদি) এর বাজার অনুসন্ধান। ১১৩) TVET প্রোগ্রামে আইসিটি নির্ভর সেবাখাতের (ITES) জন্য স্বল্প মেয়াদী কোর্স অন্তর্ভূক্ত করে অভ্যন্তরীন ও বিশ্ব বাজার উপযোগি দক্ষতা উন্নয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ।

কৌশলগত বিষয়বস্তু ৪.৩: আইসিটির উচ্চতর পর্যায়ে শিক্ষা ও গবেষণা পরিচালনার জন্য দীর্ঘমেয়াদী অর্থায়নের মাধ্যমে একটি আইসিটি সেন্টার অফ এক্সেলেন্স প্রতিষ্ঠা করা।

১১৪) দেশের কৃষিজাত দ্রব্যের জেনেটিক ম্যাপিং প্রোফাইল রেকর্ড করার জন্য বায়ো- ইনফরমেট্রিক্স গবেষণায় বিনিয়োগের ব্যবস্থা গ্রহণ। ১১৫) প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়ে আইসিটি'র বিষয় ভিত্তিক সেন্টার অফ এক্সেলেন্স গড়ে তোলার জন্য বিশেষ সহায়তা প্রদান। ১১৬) সরকারি অনুদানের মাধ্যমে আইসিটি শিল্প এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প গ্রহণ।

কৌশলগত বিষয়বস্তু ৪.৪: প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষায় এবং কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণে আইসিটি কোর্স অন্তর্ভূক্ত করে দেশব্যাপী আইসিটি সাক্ষরতা সম্প্রসারণ করা। ১১৭) ব্যয় সাশ্রয়ী জ্ঞান-ভিত্তিক একটা সমাজের প্রয়োজনের আলোকে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ের আইসিটি কারিকুলাম নিয়মিত হালনাগাদকরণ। ১১৮) যেহেতু আইসিটি দক্ষতা-কে একুশ শতকের মৌলিক দক্ষতা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে, সেহেতু প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের ছাত্র এবং শিক্ষকদের ব্যয়-সাশ্রয়ী উপায়ে আইসিটি-তে স্বাক্ষরতা নিশ্চিত করতে হবে। ১১৯) বাজার উপযোগি দক্ষতা উন্নয়নের জন্য TVET প্রোগ্রামের অংশ হিসেবে আইসিটি দক্ষতা নিশ্চিত করতে হবে। ১২০) প্রাথমিক ও মাধ্যমিক প্রতিষ্ঠান এবং TVET প্রোগ্রামের জন্য সাশ্রয়ী মূল্যে ইন্টারনেট সংযোগ প্রদান নিশ্চিত করতে হবে।

কৌশলগত বিষয়বস্তু ৪.৫: গণিত, বিজ্ঞান এবং ইংরেজী শিক্ষার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে সকল স্ড়্রে শিক্ষার মান এবং পরিসর বৃদ্ধি করা। ১২১) মাধ্যমিক পর্যায়ের সকল শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজে কম্পিউটার, ল্যান, নির্ভরযোগ্য উপযুক্ত গতি সম্পন্ন ইন্টারনেট সংযোগ স্থাপন এবং গণিত, বিজ্ঞান এবং ইংরেজীকে প্রাধান্য দিয়ে মাল্টিমিডিয়া ভিত্তিক শিক্ষক প্রশিক্ষণের উপযুক্ত বিষয়বস্তুর উন্নয়ন করতে হবে। ১২২) প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (PTTI) যেমন, চঞওওং, টজঙঈং এবং ঘঅচউ -এ কম্পিউটার, ল্যান, নির্ভরযোগ্য উপযুক্ত গতি সম্পন্ন ইন্টারনেট সংযোগ স্থাপন এবং গণিত, বিজ্ঞান এবং ইংরেজীকে প্রাধান্য দিয়ে মাল্টিমিডিয়া ভিত্তিক শিক্ষক প্রশিক্ষণের উপযুক্ত বিষয়বস্তুর উন্নয়ন করতে হবে। ১২৩) আইসিটি বিষয়ে জাতীয় (তৃণমূল পর্যায়সহ) আঞ্চলিক এবং আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা নিয়মিত আয়োজন করতে হবে এবং এরূপ আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় জাতীয় দলের অংশগ্রহণের পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান। ১২৪) আইসিটি যন্ত্রপাতি সংগ্রহের জন্য শিক্ষকদের বিশেষ সহায়তা/ঋণ অনুদান প্রদানের ব্যবস্থা করা। ১২৫) শিক্ষক প্রশিক্ষণ এবং ছাত্রদের জন্য ই-লার্নিং বিষয়বস্তুর কেন্দ্রীয় একটি সংগ্রহশালা স্থাপন। ই-লার্নিং বিষয়বস্তু তৈরীর জন্য বিশেষ সহায়তা প্রদান। ১২৬) মাধ্যমিক ও উচ্চ-মাধ্যমিক পর্যায়ে বিজ্ঞান অধ্যায়নের জন্য শিক্ষার্থীদের বিশেষ সহায়তা প্রদান। ১২৭) সকল প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ-মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার, ইন্টারনেট সংযোগ স্থাপন এবং উপযুক্ত মাল্টিমিডিয়া-ভিত্তিক শিক্ষার বিষয়বস্তু প্রদান। এ সকল স্থানে প্রয়োজনে সৌর বিদ্যুতের ব্যবস্থাকরণ। ১২৮) মাধ্যমিক ও উচ্চ-মাধ্যমিক পর্যায়ের জন্য মাল্টিমিডিয়া ভিত্তিক শিক্ষার বিষয়বস্তু উন্নয়ন এবং তা শিক্ষার্থীদের মাঝে বিতরণ। ১২৯) প্রত্যেকটি

ইউনিয়নের ইনফরমেশন এক্সে সেন্টার হিসেবে আইসিটি সুবিধা সহকারে একটা মডেল স্কুল উন্নয়ন করা হবে যাতে পার্শ্ববর্তী স্কুলসমূহের ছাত্ররা এ সুবিধা ব্যবহার করতে পারে। ১৩০) মাধ্যমিক পর্যায়ে বিজ্ঞানের ছাত্রদের জন্য উচ্চতর গণিত বাধ্যতামূলক করা হবে। ১৩১) TVET প্রতিষ্টানসমূহে কম্পিউটার, ল্যান, উপযুক্ত গতি সম্পন্ন ইন্টারনেট সংযোগ স্থাপন এবং মাল্টিমিডিয়া ভিত্তিক শিক্ষা বিষয়ক কনটেন্ট প্রদান। ১৩২) উচ্চ শিক্ষার সকল প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার, ল্যান, উচ্চ-গতির নির্ভরযোগ্য ইন্টারনেট সংযোগ স্থাপন করতে হবে। ১৩৩) মাধ্যমিক ও উচ্চ-মাধ্যমিক পর্যায়ে কমপক্ষে আইটি গ্র্যাজুয়েট এবং আইটি-তে ডিপে◻মাধারী আইসিটি শিক্ষক নিয়োগ নিশ্চিতকরণ।

কৌশলগত বিষয়বস্তু ৪.৬: সরকারী পর্যায়ে সকলের আইসিটি সাক্ষরতা নিশ্চিত করা। ১৩৪) পাবলিক সার্ভিসের প্রবেশিকা পরীক্ষার আইসিটি জ্ঞান মূল্যায়ণ অন্তর্ভূক্ত করতে হবে। ১৩৫) বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদন (ACR) -এর অংশ হিসেবে আইসিটি স্বাক্ষরতার মূল্যায়ন অন্তর্ভূক্ত করতে হবে।

কৌশলগত বিষয়বস্তু ৪.৭: ইডিসিপি, গণ সাক্ষরতা এবং আজীবন শিক্ষাসহ শিক্ষার সকল স্তরে আইসিটির ব্যবহার বৃদ্ধি করা। ১৩৬) মুঠোফোন এপ্লিকেশনের জন্য বাংলা ভাষার প্লাটফর্ম তৈরী করতে হবে। ১৩৭) আইসিটির মাধ্যমে সামাজিক অন্তর্ভূক্তির জন্য আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টার অংশীদার হতে হবে। ১৩৮) আইসিটির মাধ্যমে সরকারী পাঠাগার সেবায় প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করতে হবে। ১৩৯) শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান প্রচারে গণমাধ্যম যেমন- রেডিও এবং টেলিভিশন ব্যবহার করতে হবে। ১৪০) সকল দরিদ্র শিশুর জন্য মাল্টিমিডিয়া যন্ত্রাদি ব্যবহার করে অন্ততঃ ছয় মাসের জন্য নিয়মিত এবং কমিউনিটি স্কুলে ইসিডিপি (ECDP) চালু করতে হবে। ১৪১) দূরবর্তী এলাকার, সংখ্যালঘু শিশুদের জন্য মাল্টিমিডিয়া যন্ত্রাদি ব্যবহার করে ইসিডিপি (ECDP) চালু করতে হবে। ১৪২) যুব উন্নয়ন কর্মসূচীতে ই-লার্নিং যুক্ত করে দেশী ও আন্তর্জাতিক বাজারের জন্য বাজার উপযোগী দক্ষতা (যেমন ইংরেজি, গ্রাফিক্স কোর্স, ইত্যাদি)-এর উন্নয়ন করতে হবে।

কৌশলগত বিষয়বস্তু ৪.৮: আইসিটি ব্যবহারের মাধ্যমে প্রতিবন্ধী এবং বিশেষ সহায়তা প্রয়োজন এমন ব্যক্তিদের শিক্ষা এবং গবেষণায় সম্পৃক্ত করা। ১৪৩) দৃষ্টি প্রতিবন্ধী সম্প্রদায়ের জন্য বাংলা বাচন প্রক্রিয়াকরণ যন্ত্র, যেমন- টেক্সট টু স্পিচ (টিটিএস), অটোমেটিক স্পিচ রিকোগনিশন (এএসআর) তৈরী করতে হবে। ১৪৪) দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের জন্য বাংলা হস্তলিপি প্রক্রিয়াকরণ যন্ত্র, যেমন- অপটিক্যাল ক্যারেক্টার রিকোগনিশন (ওসিআর), ব্রেইল রিডার তৈরী করতে হবে। ১৪৫) কম্পিউটার এপ্লিকেশন-এর সাথে ভাষা প্রক্রিয়াকরণ যন্ত্র সংযুক্ত করতে হবে।

কৌশলগত বিষয়বস্তু ৪.৯: সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশ্বমানের আইসিটি শিক্ষা নিশ্চিত করা এবং গবেষণা ও উদ্ভাবনে উৎসাহিত করার জন্য আইসিটি শিক্ষায় স্নাতকোত্তর শিক্ষা প্রবর্তন করা। ১৪৬) বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন অনুমোদিত একটি উপযুক্ত সংগঠন (শিক্ষা ও আইসিটি শিল্প প্রতিষ্ঠান সহ) সরকারী ও বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের আইটি কর্মসূচী সমূহের নিয়মিত র‌্যাংকিং করবে। ১৪৭) আইসিটি ভিত্তিক শিক্ষাকে উৎসাহিত করতে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে মেধা বৃত্তি প্রাধিকার ভিত্তিতে বরাদ্দ করতে হবে। ১৪৮) বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদী গবেষণা কার্যক্রমে সহায়তা করার জন্য আইসিটি শিল্প প্রতিষ্ঠানকে উৎসাহিত করতে হবে। ১৪৯) আইসিটি শিল্প প্রতিষ্ঠানের আভ্যন্তরীন গবেষণা ও উন্নয়ন বিভাগ থাকতে হবে। এই গবেষণা ও উন্নয়ন বিভাগ বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের সাথে সহায়তা প্রদান করবে। ১৫০) নিয়মিতভাবে জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সম্মেলন আয়োজন করতে হবে। ১৫১) আইসিটির বিভিন্ন ক্ষেত্রে জাতীয় পর্যায়ে নিয়মিত ভাবে সাময়িকি প্রকাশ করা। ১৫২) অর্জিত জ্ঞান সহজলভ্য করার জন্য উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠনসমূহে ইলেকট্রনিক পাঠাগার তৈরী করতে হবে। এইরূপ প্রতিষ্ঠান সমূহের মধ্যে পারস্পরিক সংযোগ স্থাপন করতে হবে। ১৫৩) সকল ইলেক্ট্রনিক লাইব্রেরীকে বহিঃর্বিশ্বের গবেষণা নেটওয়ার্কের সাথে সংযুক্ত করতে হবে। ১৫৪) গবেষণা ও উন্নয়ন কর্মকান্ডের সমন্বয়ের জন্য বাংলাদেশে কম্পিউটার, কমিউনিকেশন ও ইলেক্ট্রনিক সোসাইটি তৈরী করতে হবে। ১৫৫) স্থানীয় শিল্প এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার জন্য আইসিটি নির্ভর সমাধান তৈরী করবে। ১৫৬) বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের কম্পিউটার বিজ্ঞান পাঠ্যসূচী প্রতি দুই বছর পরপর পর্যালোচনা করতে হবে। ১৫৭) সামাজিক ও বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য বিকল্প পদ্ধতিতে যেমন টেলিসেন্টারের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহে সাহায্য করা হবে।

উদ্দেশ্য #৫: কর্মসংস্থান সৃষ্টি: কৌশলগত বিষয়বস্তু ৫.১: স্থানীয় আইসিটি শিল্পে বিনিয়োগের জন্য উৎসাহ প্রদান করা। ১৫৮) আইসিটি শিল্পের উন্নয়নের জন্য একটি কর্তৃপক্ষ তৈরী করতে হবে। ১৫৯) আইসিটি শিল্প উন্নয়ন তহবিল (আইআইডিএফ) গঠন করা হবে। ১৬০) সরকারের সহায়তা প্রাপ্তির লক্ষ্যে আইসিটি কোম্পানীর যোগ্যতা মূল্যায়নের জন্য একটি পৃথক এক্রেডিটেশন বডি গঠন করা হবে। ১৬১) স্থানীয় ও রপ্তানীমুখী কাজের জন্য স্বল্প ব্যাংক সুদে বিশেষ ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল ফান্ড তৈরী করা হবে। ১৬২) আইসিটি পেশাজীবীদের প্রশিক্ষণ খরচ ৫০%

পরিশোধ করা হবে। ১৬৩) সরকারী মালিকানাধীন আইটি পার্ক, এসটিপি, ইনকিউবেটর, হাইটেক পার্ক ও অন্যান্য সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানে ভাড়া প্রদানের ক্ষেত্রে মূল্যছাড় দেয়া হবে। ১৬৪) ক্রয়ের ক্ষেত্রে স্থানীয় আইসিটি সামগ্রীর জন্য মূল্যসুবিধা নিশ্চিত করতে হবে (সকল সরকারী ক্রয়ের ক্ষেত্রে অন্ততঃ ২৫%) ১৬৫) তরুন আইসিটি গ্রাজুয়েটদের আইসিটি কোম্পানী প্রতিষ্ঠার জন্য ভেঞ্চার ক্যাপিটাল ফান্ড গঠন করা হবে। ১৬৬) বিশেষ আইসিটি এন্ট্রাপ্রেনারশীপ ডেভেলপমেন্ট ফান্ড গঠন করা হবে। ১৬৭) আইসিটি পেশায় নিয়োজিত আইসিটি পেশাজীবীদেরকে আনুপাতিকহারে বিশেষ সুযোগ সুবিধা দেয়া হবে।

কৌশলগত বিষয়বস্তু ৫.২: দেশীয় ও বিশ্ববাজারে চাহিদার সাথে সামঞ্জস্য রেখে অধিক সংখ্যক আইসিটি পেশাজীবী তৈরীর জন্য প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতা উন্নয়ন করা। ১৬৮) মাধ্যমিক/উচ্চ মাধ্যমিক/স্নাতক পর্যায়ের বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য বিশেষ বৃত্তি/শিক্ষা ঋণের ব্যবস্থা চালু করতে হবে। ১৬৯) সকল সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের CS/CSE/CE বিভাগের আসন সংখ্যা দ্বিগুন করতে হবে। ১৭০) শহরের আইটি শিক্ষকদের প্রত্যন্ত অঞ্চলের কলেজসমূহে যাওয়ার জন্য (স্বল্প মেয়াদী প্রেষণ) বিশেষ সুবিধাদি প্রদান করতে হবে। ১৭১) স্থানীয় আইসিটি পেশাজীবী/ শিক্ষকদের নিজ জেলায় থাকার জন্য বিশেষ সুবিধা প্রদান করতে হবে। ১৭২) জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতায় জেলা পর্যায়ের কলেজসমূহে আন্ডারগ্রাজুয়েট আইসিটি প্রোগ্রাম চালু করতে হবে। (প্রত্যেক জেলায় অন্তত একটি কলেজে) ১৭৩) বিশ্বে আইসিটি মানব সম্পদের চাহিদা নিরূপন করা, বিদ্যমান আইসিটি জনবলের ডাটাবেইজ তৈরী করা। ভবিষ্যতে আইসিটি মানব সম্পদের চাহিদার পূর্বাভাস দেওয়া এবং জাতীয় অগ্রাধিকার চিহ্নিত করা। ১৭৪) আইসিটি কোর্সে ছাত্রীদের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হবে। ১৭৫) আইসিটি কোম্পানীসমূহের নারী জনবল ক্রমাগতভাবে মোট মানব সম্পদের ৩০ শতাংশে উন্নীত করতে হবে।

কৌশলগত বিষয়বস্তু ৫.৩: স্থানীয় আইসিটি শিল্পের জন্য দক্ষতা প্রমিতকরণ। ১৭৬) ইউজিসির মাধ্যমে শিক্ষার মান (বিষয়বস্তু, পাঠদান, শিক্ষক) নিশ্চিতকরণ । ১৭৭) সকল আইসিটি গ্র্যাজুয়েটদের সুস্পষ্ট মানদন্ডের ভিত্তিতে এক বৎসর মেয়াদী অন-দা-জব প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে যেখানে ৮০% বেতন (মাসিক সর্বোচ্চ ১০,০০০ টাকা) সফটওয়্যার প্রতিষ্ঠানকে প্রদান করা হবে।

কৌশলগত বিষয়বস্তু ৫.৪: বিশ্ববাজারে দক্ষ জনবলের কর্মসংস্থান সহজতর করা। ১৭৮) বিশ্বে আইসিটি ক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের তথ্য সংগ্রহ করা হবে এবং সচেতনতা সৃষ্টি করা হবে। ১৭৯) বৈদেশিক কর্মসংস্থানের জন্য বিদেশী ভাষার (ইংরেজী ব্যতীত) এবং বিশেষায়িত প্রযুক্তির উপর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ। ১৮০) বিশ্ব বাজারের জনবল চাহিদা এবং সেই সাথে জাতীয় অগ্রাধিকার নিরূপণের জন্য নিজেদের সক্ষমতা সম্পর্কিত গবেষণা পরিচালনা করা। ১৮১) তথ্য প্রযুক্তির উচ্চতর পর্যায়ের কর্মসংস্থানের জন্য বিশেষ উৎসাহমূলক কার্যক্রম গ্রহণ (উচই, ইগউঞ, প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং বিদেশে বাংলাদেশ মিশনের লেবার উইং এর মাধ্যমে)। ১৮২) আইসিটি পেশাজীবীদের নিয়ে কাজ করে এমন রিক্রুটমেন্ট এজেন্টদের বিশেষ সুবিধা প্রদান করা হবে। ১৮৩) আইসিটি শিল্পের (অভ্যন্তরীণ ও বিদেশী) জন্য মানব সম্পদ উন্নয়নের কৌশলগত পন্থা নির্ধারণ করা হবে।

কৌশলগত বিষয়বস্তু ৫.৫: আইসিটি পেশাজীবীদের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য আর্থিক সহায়তা করা। ১৮৪) আইসিটি শিক্ষার জন্য দীর্ঘ-মেয়াদী ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা (সর্বোচ্চ ৪ বৎসরের গ্রেস পিরিয়ড এবং সর্বোচ্চ ৪% সুদে) নেয়া হবে। ১৮৫) মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক, উভয় পর্যায়ে জিপিএ ৫ প্রাপ্ত ছাত্রদের আইসিটিতে অধ্যায়নের জন্য শতকরা ১০০ ভাগ বৃত্তি প্রদান করা হবে। ১৮৬) আন্ডার গ্র্যাজুয়েট পর্যায়ে আইসিটি শিক্ষার জন্য উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের ফলাফলের ভিত্তিতে বিশেষ বৃত্তি প্রদান করা হবে (প্রত্যেক উপজেলা থেকে ১০ জন মেধাবী শিক্ষার্থীকে)।

উদ্দেশ্য #৬ : রপ্তানী উন্নয়ন: কৌশলগত বিষয়বস্তু ৬.১: বাংলাদেশী আইসিটি পণ্য ও সেবা বিশ্ববাজারে বাজারজাতকরণের জন্য শক্তিশালী বিপণন ও ব্র্যান্ডিং করা। ১৮৭) আইসিটি শিল্পের রপ্তানীর জন্য সামর্থ্য এবং কৌশলগত পন্থা নিরূপনের জন্য যথোপযুক্ত অর্থায়নের ব্যবস্থা করা হবে। ১৮৮) বিদেশে বাংলাদেশ দূতাবাসের আইসিটি জ্ঞানসম্পন্ন কর্মকর্তাদের নিয়ে বিশ্বের প্রধান প্রধান বাজার এলাকায় বাংলাদেশ আইসিটি ডেস্ক স্থাপন করা হবে। ১৮৯) অন্যতম সেরা আউটসোর্সিং এর স্থান হিসেবে বাংলাদেশের একটি ব্র্যান্ড (লোগো, ওয়েবসাইট, ব্রশিউর এবং বাংলাদেশের আইসিটিকে তুলে ধরার জন্য সাপোর্ট সার্ভিসের চেয়েও বড় কিছু) উন্নয়ন করতে হবে। ১৯০) যথেষ্ট বাজেট বরাদ্দ সহকারে উচ্চ পর্যায়ের নীতি-নির্ধারনী এবং শিল্পের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে বিশ্বের বড় বড় আইসিটি মেলা, কনফারেন্স এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের লিংকেজ প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করতে হবে। ১৯১) আন্তর্জাতিক মেলা ও কনফারেন্সের ব্যবস্থা করে এতে আন্তর্জাতিক আইসিটি কোম্পানী, সাংবাদিক আমন্ত্রণ জানাতে হবে যাতে বাংলাদেশের আইসিটি পণ্য ও সেবা বিক্রয় ও বাজারজাতকরণ এ সুযোগ পায়। আমন্ত্রিতদের ভ্রমণ ও অন্যান্য

ব্যয়ের ব্যবস্থা করে বাংলাদেশের প্রতি তাদের আগ্রহ জাগিয়ে তোলা হবে। ১৯২) বিক্রয় ও বাজারজাতকরণনের জন্য অঞ্চল, সেবা, এলাকা এবং প্রযুক্তি ভিত্তিক আইসিটি জোট তৈরী করতে হবে।

কৌশলগত বিষয়বস্তু ৬.২: সম্ভাবনাময় সফট্ওয়্যার ও আইটি ভিত্তিক সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের জন্য অর্থায়ন নিশ্চিত করা ১৯৩) আইসিটি শিল্পের চাহিদা অনুযায়ী ইইএফ নীতি প্রণয়ন করতে হবে। ১৯৪) সফ্টওয়্যার ও আইটিইএস খাতে ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল এর বিপরীতে জামানতবিহীন ঋণের বন্দোবস্ত করা। ১৯৫) আইসিটি খাতের অর্থায়ন এর জন্য নীতিমালা প্রণয়ন করা হবে এবং ভেঞ্চার ক্যাপিটাল ফান্ড গঠন করা হবে।

কৌশলগত বিষয়বস্তু ৬.৩: নির্ভরযোগ্য আইসিটি অবকাঠামো উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ করা। ১৯৬) সকলের জন্য আঞ্চলিক পর্যায়ে প্রতিযোগিতামূলক মূল্যে এবং নির্ভরযোগ্য ইন্টারনেট ব্যান্ডউইডথের ব্যবস্থা করা হবে। ১৯৭) ইন্টারনেট সংযোগ প্রসারে বিদ্যমান অবকাঠামো (যেমন বিটিসিএল ও অন্যান্য অপারেটরদের ফাইবার, কপার এবং অন্যান্য ক্যাবল স্থাপনা) লীজের সুবিধা প্রদান করা হবে । ১৯৮) জ্ঞান ভিত্তিক সমাজ উৎসাহিত সফটওয়্যার শিল্প, আইসিটি ইনকিউবেটর অথবা পার্ক, লাইব্রেরী, শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান, ইন্টারনেট কিয়স্ক, টেলিসেন্টার, ইত্যাদিতে হ্রাসকৃত মূল্যে ব্যান্ডউইথ সরবরাহ করতে হবে। ডিসকাউন্ট পদ্ধতি খুব সহজ হতে হবে। ১৯৯) সারাদেশে আরও সফ্টওয়্যার টেকনোলজী পার্ক, হাইটেক পার্ক ও আইসিটি ইনকিউবেটর স্থাপন করতে হবে। ২০০) ইন্টারনেটের রিডান্ডেসির জন্য বিকল্প/দ্বিতীয় সাবমেরিন ক্যাবল সংযোগ স্থাপন প্রক্রিয়া তরান্বিত করতে হবে। গ্রাম পর্যায় পর্যন্ত সংযোগ প্রদান নিশ্চিত করতে হবে। ২০১) সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ক্যাবল এবং ডাক্টস স্থাপনে অনুমোদন, ফি পরিশোধ ইত্যাদির জন্য ওয়ান স্টপ সার্ভিস চালু করতে হবে। নামমাত্র চার্জের ব্যবস্থা রাখতে হবে।

কৌশলগত বিষয়বস্তু ৬.৪: রপ্তানী বৃদ্ধির জন্য বিশেষ সুবিধা প্রদান করা এবং শিল্প-বান্ধব নীতি ও উপযুক্ত পরিবেশ তৈরী করা। ২০২) আইপিআর আইনের যথাযথ বাস্তবায়ন ও আধুনিকায়ন (প্যাটেন্ট ও নকশা, ট্রেডমার্ক, কপিরাইট)। আইপিআর অফিসসমূহ শক্তিশালী করা। ২০৩) ২০১৮ সাল পর্যন্ত সফ্টওয়্যার ও আইটিইএস খাতের আয়কর মওকূফ করতে হবে। ২০৪) সাধারণ মানুষের সংযোগ ব্যয় কমানোর লক্ষ্যে নেটওয়ার্ক যন্ত্রপাতির (ডাটা সংযোগ এর ক্ষেত্রে) উপর শুল্ক ও ভ্যাট প্রত্যাহার করতে হবে। ২০৫) আইসিটি খাতে বৈদেশিক বিনিয়োগ (ঋউও) আকৃষ্ট করতে যথাযথ সুযোগ সুবিধা প্রদান করতে হবে। ২০৬) ইন্টারনেট সেবা ও আইসিটি পরামর্শ সেবাসহ সকল আইসিটি বিষয়ক সেবা থেকে ভ্যাট প্রত্যাহার করতে হবে। ২০৭) রপ্তানী উৎসাহিত করতে স্থানীয়ভাবে তৈরী সফ্টওয়্যারের উপর কর প্রত্যাহার করতে হবে। ২০৮) স্থানীয়ভাবে কম্পিউটার হার্ডওয়্যার উৎপাদনের জন্য সুবিধা প্রদান করতে হবে।

কৌশলগত বিষয়বস্তু ৬.৫: তথ্য প্রযুক্তির মান, প্রক্রিয়া, প্রযুক্তি, কর্মক্ষেত্র, ভ্যালু চেইন এবং হরপযব মার্কেট উন্নয়নের জন্য গবেষণা ও উন্নয়নের মাধ্যমে সৃজনশীলতা লালন করা। ২০৯) মেধাসম্পদ তৈরীর জন্য শিল্প ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের অংশ গ্রহণে একটি সেন্টার অফ এক্সেলেন্স তৈরী করতে হবে। ২১০) ইন্টারন্যাশনাল ইন্সটিটিউট ফর বিজনেস এ্যানালাইসিস (ওওইঅ) প্রতিষ্ঠা করতে হবে। ২১১) প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইনস্টিটিউট (চগও) স্থাপন করতে হবে। ২১২) আইসিটি বিষয়ে গবেষণার জন্য অনুদান প্রদান করা হবে। ২১৩) ই-লার্নিং ও দূরশিক্ষণের জন্য সারাদেশে উচ্চ গতিসম্পন্ন শিক্ষা নেটওয়ার্ক স্থাপন করতে হবে। শিক্ষার জন্য একটি টেরিস্টেরিয়াল টিভি চ্যানেল চালু করতে হবে। ২১৪) উচ্চতর ব্যবস্থাপনা দক্ষতা উন্নয়নের জন্য দেশের ও বিদেশের নেতৃস্থানীয় বিজনেস স্কুলের সহায়তায় একটি ইন্সটিটিউট প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

উদ্দেশ্য #৭: স্বাস্থ্য পরিচর্যা: কৌশলগত বিষয়বস্তু ৭.১: টেলিমেডিসিন ও আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের ব্যবস্থাপনা উন্নত করা। ২১৫) গুরুত্বপূর্ন স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার তথ্য সহজলভ্য করার জন্য সরকারী পর্যায়ের সকল স্বাস্থ্য সেবা প্রতিষ্ঠান সমূহের সমন্বয়ে একটি জাতীয় স্বাস্থ্য নেটওয়ার্ক তৈরী করতে হবে। ২১৬) সরকারী হাসপাতালে ব্যবহৃত গুরুত্বপূর্ন যন্ত্রপাতি (যেমন ঃ এঙ-রে, আলট্রাসনোগ্রাম, ইত্যাদি) যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ এবং ক্রয়ের জন্য এগুলোর ব্যবহার, স্থায়ীত্ব ইত্যাদি সংক্রান্ত একটি তথ্যভান্ডার গড়ে তুলতে হবে। ২১৭) সরকারী সম্পদের সময়োচিত রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করার জন্য একটি অবকাঠামোগত তথ্যভান্ডার গড়ে তুলতে হবে। ২১৮) ডাক্তার, বিকল্প স্বাস্থ্য পরিচর্যা পেশাজীবী, সেবিকা প্যারামেডিক্স ও অন্যান্য স্বাস্থ্য কর্মীদের নিয়োগ, প্রশিক্ষণ, পদোন্নতি, ব্যবস্থাপনার জন্য তথ্যভান্ডার ব্যবহার এবং হালনাগাদ করতে হবে। ২১৯) প্রকাশমান রোগের প্রাদুর্ভাব এবং বিস্তারের পূর্বাভাস এবং স্বাস্থ্য খাতের পরিকল্পনা সহজতর করতে জিওগ্রাফিক্যাল ইনফরমেশন সিস্টেম্স (জিআইএস) এর ব্যবহার করতে হবে। ২২০) স্বাস্থ্য সেবা প্রদান পর্যবেক্ষণের সুবিধার্থে আইসিটির ব্যবহার

উৎসাহিত করতে হবে। ২২১) মাঠকর্মীদের পর্যবেক্ষণ, যোগাযোগ ও পারস্পরিক মতবিনিময় এর সুবিধার্থে আইসিটি (মোবাইল) -এর ব্যবহার করতে হবে।

কৌশলগত বিষয়বস্তু ৭.২: দূর্গম অঞ্চলসহ সকল পর্যায়ে সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি করা এবং শিশু, মাতৃ ও প্রজনন স্বাস্থ্যের উপর গুরুত্ব সহকারে পরিচর্যার সুবিধাসমূহ প্রাপ্তির ব্যবস্থা করা। ২২২) শিশু ও মাতৃসেবা, জন্ম নিয়ন্ত্রণ ও প্রজনন স্বাস্থ্য ইত্যাদি সহ স্বাস্থ্য বিষয়ক সকল ক্ষেত্রে সচেতনতা প্রসারের লক্ষ্যে সকল হাসপাতালে আইসিটি ও টেলিমেডিসিনের ব্যবহার এবং ওয়েব সাইট উন্নয়ন করতে হবে। ২২৩) দূরবর্তী পরামর্শ সেবা (হেল্পলাইন)-এর মাধ্যমে উপজেলা পর্যায় পর্যন্ত সাশ্রয়ী মূল্যে দ্রুত ও কার্যকরী সেবা প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে। ২২৪) টেলিমেডিসিন এর মাধ্যমে উপজেলা পর্যায় পর্যন্ত সাশ্রয়ী মূল্যে দ্রুত ও কার্যকরী সেবা প্রদানের ব্যবস্থা ২২৫) দূরবর্তী ও অবহেলিত এলাকায় রোগে আক্রান্ত হতে পারে এমন জনগোষ্ঠীর জন্য স্বাস্থ্য পরিচর্যা ও স্বাস্থ্য সম্পর্কিত তথ্যসেবা সম্প্রসারণ ও উন্নত করতে আইসিটি ব্যবহার করতে হবে। ২২৬) জরুরী প্রয়োজনে উন্নত চিকিৎসা সরঞ্জাম, বিশেষজ্ঞসহ ও উচ্চ প্রযুক্তির কমিউনিকেশন নেটওয়ার্ক-সহ একটি ভ্রাম্যমান স্বাস্থ্য ইউনিট পরিচালনা করতে হবে যেখানে ডাটা ও ইমেজ ইলেক্ট্রনিক্যালি আদান-প্রদান করা যাবে।

কৌশলগত বিষয়বস্তু ৭.৩: স্বাস্থ্যসেবার মান নিশ্চিত করা: ২২৭) শল্য চিকিৎসার মান উন্নয়নের জন্য গবেষণা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান সূমহের মধ্যে আইসিটি নেটওয়ার্ক স্থাপন করতে হবে। ২২৮) স্বাস্থ্যসেবায় নিয়োজিত প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে স্বাস্থ্য খাতে গুরুত্বপূর্ণ সেবা পর্যবেক্ষণের জন্য আইসিটি ভিত্তিক (ভিডিও কনফারেন্সিং সহ) ব্যবস্থা করতে হবে। ২২৯) দেশে ঔষধের আইসিটি ভিত্তিক মান নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা চালু করতে হবে। ২৩০) দেশে রোগ নির্ণয়ের ব্যবস্থা (প্যাথলজি ও অন্যান্য) পর্যবেক্ষণের জন্য আইসিটি ভিত্তিক ব্যবস্থা চালু করতে হবে।

কৌশলগত বিষয়বস্তু ৭.৪: জাতীয় স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের ক্ষমতা বৃদ্ধি করা। ২৩১) আইসিটির মাধ্যমে স্বাস্থ্যখাতের পেশাজীবীদেরকে বিশ্বের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত জ্ঞানভান্ডার ও গবেষণা ভান্ডারে প্রবেশের ব্যবস্থা করতে হবে। ২৩২) হাসপাতালে চিকিৎসা বিষয়ক পরামর্শ/সতীর্থদের সাথে পর্যালোচনা/ উপদেশ এর জন্য আইসিটি ভিত্তিক যোগাযোগ ব্যবস্থা ব্যবহার করতে হবে। ২৩৩) তথ্য আদান-প্রদান এর জন্য চিকিৎসা বিষয়ক প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে আইসিটি নেটওয়ার্ক তৈরী করতে হবে। ২৩৪) ব্যয়সাশ্রয়ী রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসার জন্য আইসিটির সৃজনশীল ব্যবহার উৎসাহিত করতে হবে।

উদ্দেশ্য #৮ : তথ্য জগতে সার্বজনীন প্রবেশাধিকার: কৌশলগত বিষয়বস্তু ৮.১: জনসেবার বাধ্যবাধকতা হিসেবে ৫ বৎসরের মধ্যে সকল নাগরিককে তথ্য জগতে প্রবেশের সুযোগ প্রদান করা।

২৩৫) টেলিডেনসিটি বাড়াতে হবে। ২৩৬) ব্রডব্যান্ড সংযোগের প্রসার ঘটাতে হবে। ২০১৫ সালের মধ্যে ৩০%, ২০১৮ সালের মধ্যে ৪০% -এ উন্নয়ন। ২৩৭) তথ্য জগতে সার্বজনীন প্রবেশের জন্য একটি নীতিমালা প্রণয়ন ও তহবিল গঠন করতে হবে।

কৌশলগত বিষয়বস্তু ৮.২: সকল জেলা সদরে ইন্টারনেট ব্যাকবোন সম্প্রসারণ করে রাজধানীর সমপরিমান খরচে ইন্টারনেট সংযোগ প্রদান করা। ২৩৮) দেশের কৃত্রিম উপগ্রহ উৎক্ষেপন করতে হবে। ২৩৯) নতুন সাবমেরিন কেবল (রিডান্ডেন্সি ও ধারণক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য) স্থাপন করতে হবে। ২৪০) ব্রডব্যান্ড ফিক্সড নেটওয়ার্ক স্থাপনে উঙ্গঈ এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আরোপিত মূল্য হ্রাস করতে হবে। ২৪১) সারাদেশে সকল ডিডিএন পয়েন্ট থেকে ইন্টারনেট ব্যবহার এর ব্যয় সমান হতে হবে।

কৌশলগত বিষয়বস্তু ৮.৩: জাতীয় টেলিকম নীতিমালা অনুযায়ী সুযোগ সুবিধা প্রদান করে ৫ বৎসরের মধ্যে দেশের সর্বত্র ইন্টারনেট এবং আইপি টেলিফোন সেবা সম্প্রসারণ করা।২৪২) উন্নত টেলিযোগাযোগ গ্রাহক সেবার জন্য সুবহনীয় নাম্বার চালু করতে হবে। ২৪৩) শুল্ক বা টোল-ফ্রি নাম্বার চালু করতে হবে। ২৪৪) আই.এস.পি'দের আইপি টেলিফোনি লাইসেন্স প্রদান করতে হবে। ২৪৫) যেহেতু গ্রাহক ইন্টারনেটে প্রবেশ করে আইপি টেলিফোন ব্যবহার করেন এবং সে জন্য ফি প্রদান করেন, সেহেতু আইপি কল চার্জ ফ্রি করতে হবে।

কৌশলগত বিষয়বস্তু ৮.৪: এনজিএন এবং লাইসেন্স বিহীন ব্যবস্থা সাগ্রহে অনুসরণ করে আইপি ভিত্তিক টেলিযোগাযোগ সর্বত্র সম্প্রসারণ করা এবং সবার জন্য সাশ্রয়ী করে তোলা। ২৪৬) উন্নত ও দ্রুততর ডাটা, মাল্টিমিডিয়া ও ভয়েস কমিউনিকেশন এর জন্য ৩এ সার্ভিস চালু করতে হবে। ২৪৭) টেলিকম লাইসেন্সিং প্রক্রিয়া সহজতর করতে হবে। ২৪৭) সারাদেশে তারবিহীন ব্রডব্যান্ড (ডরগধী ও অন্যান্য আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে) নেটওয়ার্ক চালু করতে হবে।

উদ্দেশ্য #৯ : পরিবেশ, জলবায়ু এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা: কৌশলগত বিষয়বস্তু ৯.১: পরিবেশ-বান্ধব সবুজ প্রযুক্তি ব্যবহার করে পরিবেশ সংরক্ষণ উৎসাহিত করা। ২৪৯) সরকারী ক্রয়ের ক্ষেত্রে পূর্ব নির্ধারিত এবং আন্তর্জাতিক ভাবে

গ্রহণযোগ্য মানের বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী আইসিটি যন্ত্রপাতি ক্রয় বাধ্যতামূলক করতে হবে। ২৫০) ইলেকট্রনিক বর্জ্য খালাস প্রতিরোধ করার জন্য অবাঞ্ছিত ও অকেজো আইসিটি যন্ত্রাদির প্রবেশ নিয়ন্ত্রণের জন্য মান নির্ধারণ ও প্রয়োগ করতে হবে। নিরাপদ খালাসের প্রক্রিয়া এবং পুনঃ ব্যবহারের পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে। ২৫১) দাপ্তরিক যোগাযোগ, নথি প্রক্রিয়াকরণ, তথ্য আদান-প্রদান এবং সংরক্ষণে ইলেক্ট্রনিক পদ্ধতির ব্যবহার বৃদ্ধি করে কাগজের ব্যবহার হ্রাস করতে হবে।

কৌশলগত বিষয়বস্তু ৯.২: আইসিটি ব্যবহারের মাধ্যমে পরিবেশ রক্ষায় উৎসাহিত করা। ২৫২) রিমোট সেনসিং প্রযুক্তি এবং টেলিকম নেটওয়ার্ক ব্যবহারের মাধ্যমে অধিকতর কার্যকর তদারকি, সম্পদ ব্যবস্থাপনা এবং পরিবেশের উপর ঝুঁকি হ্রাসে যেমন- অবৈধ লগিং, মৎস শিকার, বন রক্ষা, ভূমিক্ষয়, পানির গুনাগুণ ইত্যাদি রোধে জিআইএস এর ব্যবহার করতে হবে। ২৫৩) বিভিন্ন ক্ষেত্র যেমন -কৃষি, স্বাস্থ্যব্যবস্থা, পানি ব্যবস্থাপনা, খনি ইত্যাদি এর টেকসই উন্নয়ন কৌশল সহজলভ্য করতে হবে এবং সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে। ২৫৪) পরিবেশের অপব্যবহার/পরিবেশ রক্ষার বিধি বিধান-এর প্রয়োগের ক্ষেত্রে অধিকতর স্বচ্ছতা এবং তদারকি নিশ্চিত করতে হবে। ২৫৫) ঝুঁকি পরিমাপের জন্য মডেলিং টুল উদ্ভাবন করতে হবে এবং জলবায়ু পরিবর্তন পরিমাপ করার জন্য জাতীয় কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে। ২৫৬) সরকারী-বেসরকারী অংশীদারিত্বে আইসিটি নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে পরিবেশ দূষণ সম্পর্কে অবহিত করতে হবে। ২৫৭) ঈইঞং এবং/অথবা দূরশিক্ষণের মাধ্যমে বন্য প্রাণী সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা এবং এ সংক্রান্ত বিভিন্ন টুলস ব্যবহার করে বন কর্মকর্তাদের কারিগরি ও বুদ্ধিবৃত্তিক দক্ষতা বৃদ্ধি করতে হবে। ২৫৮) নগর পরিকল্পনা ও শহর উন্নয়নের অংশ হিসেবে কার্যকর এবং মানবিক পদ্ধতিতে রাস্তার পশুদের অবস্থা সুস্থিত রাখতে (নিশ্চিহ্ন না করে) সিটি কর্পোরেশনের কর্মকর্তাদের সচেতনতা বৃদ্ধি এবং প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

কৌশলগত বিষয়বস্তু ৯.৩: আইসিটি ভিত্তিক দুর্যোগ সতর্কীকরণ এবং ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তি ব্যবহার করে নাগরিকদের প্রাকৃতিক দূর্যোগ থেকে রক্ষা করা। ২৫৯) দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও প্রশমনের জন্য রিমোট সেন্সিং প্রযুক্তির ব্যবহার করতে হবে। ২৬০) ওয়েব ভিত্তিক পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রত্যায়ন পদ্ধতি চালু করতে হবে। ২৬১) দূর্যোগে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে এমন জনগোষ্ঠীর জন্য এসএমএস(ঝগঝ) ভিত্তিক দূর্যোগ সতর্কীকরণ পদ্ধতি চালু করতে হবে। ২৬২) বন্যা এবং সাইক্লোন আশ্রয়কেন্দ্র (দূর্যোগপূর্ণ এলাকাসমূহে সুষমবন্টন সহ তদারকির জন্য জিআইএস ভিত্তিক পদ্ধতি ব্যবহার করতে হবে।

কৌশলগত বিষয়বস্তু ৯.৪: আইসিটি ব্যবহারের ফলে উদ্ভুত বিষাক্ত বর্জ্যের নিরাপদ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা।

২৬৩) পুরাতন পিসি এবং এর যন্ত্রাংশ হতে মূল্যবান ধাতু নিস্কাশন করে পুনঃব্যবহারের জন্য প্লান্ট স্থাপন করতে হবে।

কৌশলগত বিষয়বস্তু ৯.৫: ত্রাণ ব্যবস্থাপনা এবং দূর্যোগ পরবর্তী কার্যক্রমের তদারকী নিশ্চিত করা। ২৬৪) ত্রাণ সামগ্রির সুষমবণ্টন নিশ্চিত করতে বিশেষত দূর্গম এলাকার প্রতি দৃষ্টি রেখে জিআইএস পদ্ধতি ব্যবহার করতে হবে।

উদ্দেশ্য #১০: আইসিটিতে সহায়তা প্রদান: কৌশলগত বিষয়বস্তু ১০.১: নির্ভরযোগ্য এবং সাশ্রয়ী বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করা। ২৬৫) বিদ্যুতের বর্তমান চাহিদা মাফিক সারাদেশে বিদ্যুত সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে এবং ভবিষ্যত চাহিদা মেটানোর ব্যবস্থা করতে হবে। ২৬৬) দশ বৎসরের মধ্যে সরকারের অর্থায়নে প্রচলিত লাইট পরিবর্তন করে বিদ্যুত-সাশ্রয়ী লাইটের ব্যবস্থা করতে হবে। ২৬৭) বিকল্প বিদ্যুৎ যেমন সৌর-বিদ্যুৎ, বায়ু-তাড়িত বিদ্যুৎ, জৈব-জ্বালানী, ইত্যাদি ব্যবহার-এর জন্য বিশেষ সুবিধা প্রদান করতে হবে। ২৬৮) আইসিটি ইনকিউবেটর/হাইটেক পার্ক/সফট্ওয়্যার টেকনোলজী পার্ক/আইটি পার্ক-এ নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে। ২৬৯) পাওয়ার জেনারেটর, সৌর প্যানেল, আইপিএস, ইউপিএস/অনলাইন ইউপিএস, আইপিএস ও ইউপিএস-এর ব্যাটারী-এর উপর অর্পিত কর হ্রাস করতে হবে। ২৭০) বিদ্যুৎ উৎপাদনে বেসরকারী বিনিয়োগ উৎসাহিত করতে হবে এবং সরকারী বিদ্যুৎ উৎপাদকের অনুরূপ সুবিধাদি প্রদান করতে হবে। ২৭১) বিদ্যুৎ খরচে দক্ষতার বিষয়ে গবেষণা উৎসাহিত করতে হবে। ২৭২) সিস্টেম লস্ কমিয়ে আনতে হবে। ২৭৩) প্রি-পেইড মিটার প্রচলন করতে হবে।

কৌশলগত বিষয়বস্তু ১০.২ মেধাস্বত্ত্ব সংরক্ষণ, অনলাইন ডকুমেন্ট আদান-প্রদান, লেন-দেন এবং পেমেন্ট এর সহায়ক আইনী অবকাঠামো তৈরী করা। ২৭৪) পেমেন্ট গেটওয়ে বাস্তবায়ন করতে হবে। ২৭৫) সাইবার পুলিশ প্রচলন করতে হবে। ২৭৬) আইসিটি আইন ২০০৬ বাস্তবায়ন করতে হবে (ইলেকট্রনিক স্বাক্ষর, সার্টিফিকেশন অথরিটি, ইত্যাদি)। ২৭৭) সাইবার ক্রাইম এবং মেধাস্বত্ত্ব লঙ্ঘনের অপরাধ নিয়ন্ত্রণের জন্য স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল চালু করতে হবে। ২৭৮) একাধিক ইন্টারনেট এক্সচেঞ্জ স্থাপন করতে হবে। ২৭৯) পেটেন্ট এবং ডিজাইন এ্যাক্ট

হালনাগাদ করতে হবে। ২৮০) সরকারি পর্যায়ের ক্রয় এবং নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি সংশ্লিষ্ট ওয়েব পোর্টালে প্রকাশের জন্য একটা আইন প্রণয়ন করতে হবে। দরপত্র এবং চাকুরীর দরখাস্ড় অনলাইনে জমা দেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। ২৮১) ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে তহবিল স্থানান্তরের জন্য একটা আইন, সাইবার ক্রাইম এ্যাক্ট এবং কমপিটিশন অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও প্রয়োগ করতে হবে। ২৮২) আইসিটি এ্যাক্ট ২০০৬ অথবা এর বিধি বিধান পর্যালোচনা এবং পরিবর্ধন করে সম্পূর্ণ বা আংশিক অবহেলিত বিষয়াদি প্রয়োজন মাফিক অন্তর্ভূক্ত করতে হবে।

কৌশলগত বিষয়বস্তু ১০.৩: সকল সরকারী আইসিটি প্রকল্প অনুসরণ করবে এমন ইন্টার অপারেবিলিটি কাঠামো প্রবর্তন করা। ২৮৩) সকল আইসিটি প্রকল্পের জন্য জিআইএফ উন্নয়ন করতে হবে। ২৮৪) জিআইএফ এর ব্যবহার সম্পর্কে আইসিটি পেশাজীবীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। ২৮৫) জিআইএফ সংক্রান্ত কাজের সহায়ক কাঠামো তৈরী করতে হবে।

কৌশলগত বিষয়বস্তু ১০.৪: সাশ্রয়ী, ওপেন সোর্স এবং ওপেন আর্কিটেকচার সলিউশন এর ব্যবহারে উৎসাহ প্রদান করা। ২৮৬) সকল সরকারী প্রতিষ্ঠানে, স্বীকৃত এসোসিয়েশন, স্কুল/কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয়ে মেধাস্বত্ত্ব এবং ওপেন সোর্স সফটওয়্যার এর বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে। ২৮৭) ব্যবসায়িক দৃষ্টিকোণ থেকে, বিশেষত: ঞড়ঃধষ ঈড়ংঃ ড়ভ ঙহিবৎংযরঢ় (ঞঈঙ)-এর আলোকে ওপেন সোর্স সফটওয়্যার এবং প্রোপ্রাইটারি সফ্টওয়্যার এর ব্যবহার সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে। কোন ব্যবসায়িক প্রস্তাবে ঞঈঙ দৃষ্টিকোণ থেকে ওপেন সোর্স সফটওয়্যার সুবিধাজনক বিবেচিত হলে তাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। ২৮৮) শিক্ষা এবং জ্ঞান উন্নয়নের জন্য সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ওপেন সোর্স সফটওয়্যার এর ব্যবহার চালু করতে হবে। ২৮৯) সরকারী পর্যায়ে ওপেন সোর্স অপারেটিং সিস্টেম, টুলস ও অফিস এ্যাপ্লিকেশনের ব্যবহার শুরু করতে হবে। ২৯০) আইসিটি শিল্প ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় ওপেন সোর্স গবেষণা ও উন্নয়ন কেন্দ্র স্থাপন করতে হবে। ২৯১) সরকারী আইসিটি প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়ন এর ক্ষেত্রে আউটসোর্সিংকে প্রাধান্য দিতে হবে।

কৌশলগত বিষয়বস্তু ১০.৫: শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আইসিটি অবকাঠামো উন্নয়ন করা। ২৯২) প্রতিটি স্কুল ও কলেজে কমপক্ষে ২০টি কম্পিউটার-সহ একটি কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন করতে হবে। ২৯৩) প্রতিটি স্কুল ও কলেজ ১ এমবিপিএস ইন্টারনেট সংযোগ বিনামূল্যে প্রদান করতে হবে। ২৯৪) পর্যাপ্ত ল্যাব সুবিধা ও শিক্ষক সহ সকল স্কুল ও কলেজের বিজ্ঞান বিভাগের ধারণক্ষমতা বাড়াতে হবে। ২৯৫) নতুন ও পুরাতন কম্পিউটার অনুদান প্রদানের জন্য দীর্ঘ মেয়াদী ব্যবসার সামাজিক দায়বদ্ধতা (ঈঝজ) কর্মসূচী চালূ করতে হবে।

কৌশলগত বিষয়বস্তু ১০.৬: আইসিটি'র উন্নয়ন রাজধানীর বাইরে বিকেন্দ্রীকরণ করা। ২৯৬) উচ্চ গতির ডাটা সংযোগ ও অটোমেশন(ই-গভর্নেন্স)-এর মাধ্যমে সরকারী কর্মকান্ডের বিকেন্দ্রীকরণ করতে হবে। ২৯৭) উপজেলা পর্যায় পর্যন্ত অপটিক্যাল ফাইবার নেটওয়ার্ক স্থাপন করতে হবে। ২৯৮) দেশের অন্যান্য শহরে বাজার সম্প্রসারণের জন্য আইএসপি, ডাটা সংযোগ প্রদানকারী, আবাসন এবং অবকাঠামো নির্মাণকারীদের সুবিধাদি প্রদান করতে হবে। ২৯৯) গণিত ও ইংরেজির জন্য বিশেষ শিক্ষক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চালু করতে হবে। ৩০০) প্রতিটি স্কুল ও কলেজে যথেষ্ট সংখ্যক তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ক বইপত্র-সহ লাইব্রেরী স্থাপনের কর্মসূচী চালু করতে হবে। ৩০১) সরকারী এবং আধা-সরকারী স্কুল ও কলেজের বিজ্ঞান শিক্ষকদের বেতন স্কেল অন্যান্যদের চেয়ে আরো গ্রহণযোগ্য মানে উন্নত করতে হবে।

কৌশলগত বিষয়বস্তু ১০.৮: ইন্টারনেট-এর প্রাপ্যতা এবং নির্ভরযোগ্যতা বাড়িয়ে তোলা। ৩০২) প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ নিশ্চিত করে বেসরকারী খাতকে ব্যবহারের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক সংযোগ উন্নততর করতে অন্তত আরও ২টি সাবমেরিন ক্যাবল সংযোগ স্থাপন করতে হবে। ৩০৩) ইন্টারনেটের খুচরামূল্য কমাতে (আইএসপি এবং এচজঝ/উউএউ/৩এ প্রযুক্তি ব্যবহার করে মোবাইল ইন্টারনেট) হবে। ৩০৪) ইন্টারনেট ব্যয় সাধারণ জনগণের সামর্থ্যের মধ্যে আনতে হবে। ৩০৫) ব্রডব্যান্ড নীতিমালা বাস্তবায়ন করতে হবে। ৩০৬) ডরগধী এর লাইসেন্স উন্মুক্ত করতে হবে।

আমরা পর্যালোচনা করে দেখেছি যে, ১০টি কৌশলে কর্মপরিকল্পনার বিন্যাস এরকম;

ক্রমিক নং	বিবরণ	সংখ্যা	অগ্রাধিকার
১	সামাজিক ন্যায়পরায়নতা/ সাম্যতা (১-২০)	২০	১২
২	উৎপাদনশীলতা (২১-৫০)	৩০	১৩
৩	সম্পূর্ণতা/ অখন্ডতা (৫১-১০৪)	৫৪	৪১
৪	শিক্ষা ও গবেষণা (১০৫-১৫৭)	৫৩	৩০
৫	কর্মসংস্থান সৃষ্টি (১৫৮-১৮৬)	২৯	১৬

৬	রপ্তানী উন্নয়ন (১৮৭-২১৪)	২৭	১৬
৭	স্বাস্থ্য পরিচর্চা (২১৫-২৩৪)	২০	৪
৮	তথ্য জগতে সার্বজনীন প্রবেশাধিকার (২৩৫-২৪৮)	১৪	৫
৯	পরিবেশ, জলবায়ু ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা (২৪৯-২৬৪)	১৬	৮
১০	আইসিটিতে সহায়তা প্রদান (২৬৫-৩০৬)	৪২	২২
		৩০৬	১৬৭

গত ২৪ মে ২০০৯ বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের কর্মপরিকল্পনা ও অগ্রাধিকার নির্ণয়ের জন্য একটি বহুপাক্ষিক সভা হয়। উক্ত সভায় ৩০৬টি কর্মপরিকল্পনার মাঝে ১৬৭টিকে অগ্রাধিকার হিসেবে বাছাই করা হয়। তবে পরবর্তীতে মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে প্রকল্প গ্রহণ ও বাজেট বরাদ্দ নির্ধারণ করা হয় একটু ভিন্ন ভাবে।

নীতিমালা অনুমোদন ও তারপর: ওপরের এই চূড়ান্ত নীতিমালাটি এই লেখাটি পর্যালোচনা করা পর্যন্ত (১০ জুলাই ২০০৯) বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনের পর এটি আবার মন্ত্রীসভার চূড়ান্ত অনুমোদন পেয়েছে। এই রচনাটি প্রস্তুত করা পর্যন্ত মন্ত্রীসভার চূড়ান্ত অনুমোদনটি সম্পর্কে বিস্তারিত জানা যায়নি। তবে সেটি ৬ জুলাই অনুষ্ঠিত মন্ত্রীসভার সভায় এই নীতিমালাটি অনুমোদিত হয়েছে বলে বিজ্ঞান এবং তত্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত সচিব জনাব আব্দুল আওয়াল জানান। গত ৯ জুলাই ঢাকার শেরাটন হোটেল আয়োজিত এক সভায় তিনি এই তথ্য প্রদান করেন। যদিও আমি ৬ জুলাই অনুমোদিত চূড়ান্ত দলিলটি দেখিনি এবং বিসিসি যেটি চূড়ান্ত করেছে সেটি দেখেছি তবুও আমি ধারণা করি যে এটিতে মন্ত্রীসভার সিদ্ধান্ত অনুসারে এর যেসব স্থানে যে ধরনের পরিবর্তন হবার কথা, পরিবর্তন তেমনভাবে হয়নি।

অনেক তথ্যও সঠিক বা আপডেটেড নয়। আমার নিজের ধারণা বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল বিষয়টি যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে উপলব্ধি করেন-এমনকি কারও পরামর্শ নিয়ে একে আপডেট করার কথাও ভাবেনি। দুয়েকটি দৃষ্টান্ত দেয়া যেতে পারে; নীতিমালায় আমাদের জাতীয় আয় ৬০০ ডলার বলা হয়েছে-সেটি ২০০৯ সালে আসলে ৬৯০ ডলার। নীতিমালায় দীর্ঘমেয়াদের মেয়াদ হিসেবে ১০ বছরের কথা বলা হয়েছে। সেটি ২০২১ সাল হওয়া উচিত ছিলো। কারণ ২০২১ সালে ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার কথা-১০ বছরে নয়। সামগ্রিকভাবে নীতিমালাটি নিয়ে কোন বিরোধ না থাকলেও এই বিষয়ে আমার নিজের মতামত রয়েছে। সেটি নীচে উল্লেখ করলাম;

নীতিমালার দশটি প্রতিপাদ্য বিষয়ের পরিবর্তে ছয়টি বিষয়কে কেন্দ্র করেই ডিজিটাল বাংলাদেশ ধারণাটিকে পরিস্ফূট করা যায় বলে আমি মনে করি।

নীতিমালায় আমার মতে, তথ্যপ্রযুক্তি নীতিমালার সংক্ষিপ্ত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হতে পারে এমন:

১) ২০২১ সালে একটি পেপারলেস ডিজিটাল সরকার প্রতিষ্ঠা করা হবে। এর ফলে সরকারের প্রচলিত কাজ করার পদ্ধতি সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হবে। সরকার একটি নেটওয়ার্কড একক ইউনিট হিসেবে ইন্টারএকটিভ পদ্ধতিতে কাজ করবে এবং সরকারের সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীসহ নীতিনির্ধারকগণ তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে সরকার পরিচালনা করবেন। সরকারের আন্ত ও বহির্যোগাযোগসহ জনগণের সাথে সম্পর্ক স্থাপন সম্পূর্ণভাবে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নির্ভর হবে। রাজনৈতিক দল, নির্বাচন কমিশন, প্রতিরক্ষাবাহিনী, স্থানীয় সরকার, সরকারের প্রশাসন, আইন শৃঙ্খলা, ভূমিব্যবস্থাপনা, বিচারবিভাগ ও সকল সরকারী, আধা সরকারী, স্বায়ত্ত্বশাসিত ও সহযোগী সংস্থা তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নিরঙ্কুশভাবে ব্যবহার নিশ্চিত করবে। এই নীতিমালা বাস্তবায়নের উদ্দেশ্য হবে জনগণের তথ্য জানার অধিকার নিশ্চিত করা এবং তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করে জনগণের সাথে সরকারের সকল প্রকারের যোগাযোগ নিশ্চিত করা। এই ব্যবস্থায় সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা ও গণতন্ত্র ও জাতীয় সংসদকে আরও কার্যকর করা হবে।

২) এই নীতিমালা বাস্তবায়নের মাধ্যমে ২০২১ সালে বাংলাদেশের প্রতিটি শিশুর হাতে কম্পিউটার পৌছাবে, প্রাথমিকসহ সকল স্তরে কম্পিউটার শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হবে এবং দেশের সকল শিক্ষার্থী তথ্যপ্রযুক্তি জ্ঞান সম্পন্ন হবে। দেশের শিক্ষার মান ব্যাপকভাবে উন্নীত করাসহ বিপুল পরিমাণ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিজ্ঞানসম্পন্ন মানবসম্পদ তৈরী করা হবে যা দেশের চাহিদা পূরণ করে বিশ্ববাজারে ব্যাপকভাবে প্রবেশ করতে পারবে। এই নীতিমালা বাস্তবায়নের উদ্দেশ্য হবে তথ্যপ্রযুক্তিকে শিক্ষার বাহন হিসেবে প্রচলন করা এবং কম্পিউটারকে শিক্ষা উপকরণ হিসেবে ব্যবহার নিশ্চিত করা। এই নীতিমালা বাস্তবায়নের ফলে দেশে বিজ্ঞান চর্চার ব্যাপক উন্নতি হবে এবং সকল পর্যায়ে গবেষণার জন্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করা হবে। এই নীতিমালার মাধ্যমে ব্যাপকভাবে কর্মসংস্থানের সুযোগ নিশ্চিত করাও অন্যতম উদ্দেশ্য হবে। উপরন্তু এই নীতিমালা বাস্তবায়নের ফলে শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি দেশের সকল মানুষ তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করার জ্ঞানসম্পন্ন হবে।

৩) ২০২১ সালে প্রতিটি ঘরে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট পৌছাবে এবং প্রতিটি মানুষ মোবাইল বা টেলিকম প্রযুক্তিসহ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সমভাবে সমপর্যায়ে ব্যবহারের জন্য সমান সুযোগ পাবে। এতে গ্রামগুলোকে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার ও তাদের কাছে এইসব প্রযুক্তি লভ্যতাকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে। এই নীতিমালা বাস্তবায়নের ফলে শহর ও গ্রাম এবং ধনী ও দরিদ্রের মাঝে ডিজিটাল ডিভাইড সম্পূর্ণ দূর করা হবে। এর ফলে সামাজিক সাম্য, নারী-শিশু ও প্রতিবন্ধীদের অধিকার নিশ্চিত করা হবে। তাদের জন্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সুযোগসুবিধা সহজলভ্য করা এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের সাহায্যে সমাজের অনগ্রসর শ্রেণীর জীবনযাত্রার মান উন্নত করাসহ কর্মসংস্থান নিশ্চিত করাও এই নীতিমালার উদ্দেশ্য হবে।

৪) এই নীতিমালা বাস্তবায়নের উদ্দেশ্য হবে সরকারী-বেসরকারী কৃষি-শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যসহ সকল ধরনের উৎপাদন, বিপনন, বিক্রয়সহ সকল পর্যায়ে তথ্যপ্রযুক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করা। এইসব খাতের সকল তথ্য ডিজিটাল পদ্ধতিতে পাওয়া নিশ্চিত করাও এই নীতিমালার অন্যতম উদ্দেশ্য হবে। এই নীতিমালার আওতায় এমনসব ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে যার সাহায্যে মেধাসম্পদ রপ্তানী ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাবে এবং দেশের অভ্যন্তরে মেধাসম্পদের সৃজন, সংরক্ষণ ও উন্নয়ন নিশ্চিত হবে। এই নীতিমালার অন্যতম উদ্দেশ্য হবে জাতীয় গড় উৎপাদনে মেধাজাত আয়ের পরিমাণ ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি করা।

৫) এই নীতিমালার উদ্দেশ্য হবে দেশের প্রতিটি নাগরিকের জন্য স্বাস্থ্যসেবাসহ তাকে প্রদত্ত সকল সেবায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার নিশ্চিত করা। এই নীতিমালার অন্যতম উদ্দেশ্য হবে সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি, সামাজিক সম্পর্ক, পারিবারিক ও ব্যক্তিগত জীবনধারাকে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির পরিবর্তনের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ করা।

৬) এই নীতিমালার উদ্দেশ্য হবে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের রাষ্ট্রভাষা বাংলা ভাষার উন্নয়ন, বিকাশ এবং তথ্যপ্রযুক্তিতে এই ভাষার ব্যবহারকে নিশ্চিত করা। এই নীতিমালার উদ্দেশ্য হবে বাঙালীর সাহিত্য সংস্কৃতির উন্নয়ন ও বিকাশকে তথ্যপ্রযুক্তি দিয়ে সহায়তা করতে হবে।

এই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যগুলোকে সামনে রেখে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের সময় উদ্দেশ্যগুলো আরও স্পষ্ট করা যেতে পারে। এরপর সেখান থেকে কৌশলগত বিষয়বস্তু নির্ধারণ করা যেতে পারে। এইসব লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য এই নীতিমালার সাথে প্রদত্ত কর্মপরিকল্পনাগুলোকে অর্থবছরভিত্তিক বিন্যস্ত করা যেতে পারে । অনুমোদিত নীতিমালায় অগ্রাধিকারও চিহ্নিত করা হয়নি-যা কোনভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়।

যাহোক, আমি এর আগেই বলেছি যে, এই নীতিমালার সাথে কার্যত নীতিগত কোন বিরোধ খোজে পাইনা। একে সাজানোর দিক থেকে ভিন্ন করা গেলে বা স্পষ্ট করে আরও কিছু কথা বলা হলে বিষয়টি অনেক ভালো হতে পারতো। নীতিমালার প্রণেতারা সেদিকে না গিয়ে তাদের মতো করে নীতিমালাটিকে সাজিয়েছেন। আমি মনে করি, যারা এটি প্রণয়নের সাথে জড়িত ছিলো তাদের যদি স্পষ্ট রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী থাকতো তবে নীতিমালার ভাষা ও সাংগঠনিক পরিবেশনা অন্যরকম হতো।

তবুও এই নীতিমালাটিকে ভিত্তি হিসেবে ধরে নিয়েই আমরা ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার কাজ করতে পারি। নীতিমালার বিধান অনুসারে প্রতি বছর এই নীতিমালার করণীয়গুলো পর্যালোচনা করা হতে পারে এবং ২০০৯-১০-এর বাজেট থেকেই এই কাজটি শুরু করা যায়। ২০১০ সালের মার্চ-এপ্রিল মাস থেকে এই নীতিমালা বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা শুরু করা হতে পারে এবং ২০১০-১১ সালের বাজেটকে সেভাবে সাজানো যেতে পারে।

মোট ৩০৬টি কর্মপরিকল্পনা রয়েছে মূল নীতিমালায়। তবে এসবের বেশ কটিই পুনরুক্তিতে ভরা। আবার বেশ কিছু বিষয় এতে নেই। অর্থমন্ত্রী জনাব এ এম এ মুহিত মনে করেন যে, এতে আরও কিছু কর্মপরিকল্পনা যুক্ত হতে হবে। (ধানসিড়ি আয়োজিত সেমিনার, ২৬ জুন ২০০৯, হোটেল সোনারগাও)

যেহেতু তথ্যপ্রযুক্তি নীতিমালা ২০০৮ কেই তথ্যপ্রযুক্তি নীতিমালা ২০০৯ এ রূপান্তর করা হয়েছে সেহেতু পূর্ববর্তী নীতিমালার দুর্বলতম দিকগুলো এতে বিদ্যমান রয়ে গেছে। আমার মতে দুর্বলতাগুলো নিম্নরূপ:

ক) নীতিমালাটি একটি অরাজনৈতিক অঙ্গীকারবিহীন সরকারের আমলে প্রতিশ্রুত নয় এমন লোকদের প্রাধান্য দিয়েই তৈরী করা। ওরা সমাজের খুব গুণী মানুষ হলেও তাদের কোন ধরনের লার্জ কমিটমেন্ট নেই জনগণের কাছে। তারা জনগণকে প্রতিনিধিত্বও করেন না। বরং এই প্রণেতা দলটি ডিজিটাল বাংলাদেশ ধারনাটিকেই প্রত্যাখ্যান করেছে। ফলে ডিজিটাল বাংলাদেশ ধারনায় জাতির প্রতি যে অঙ্গীকারটুকু করা হয়েছে নীতিমালায় তার পূর্নাঙ্গ প্রতিফলন নেই। একটি এনজিও ঘরানার এই নীতিমালা একটি রাজনৈতিক সরকার পুরোপুরি গ্রহণ করতে পারে না। একে পর্যালোচনা করে রাজনৈতিক সরকারের অঙ্গীকারের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ করা উচিত ছিলো।

খ) নীতিমালাটি জনগণের কাছে উপস্থাপিত হয়নি। প্রণেতারা ব্যতীত মন্ত্রীসভায় অনুমোদনের আগে এই নীতিমালাটি দেশের কোন পর্যায়ের কোন মানুষের সামনে পেশ করা হয়নি বা তাদের কোন মতামত নেয়া হয়নি। ফলে এর পেছনে কোন ধরনের জনসমর্থন নেই। মন্ত্রসিভায় অনুমোদনের মাধ্যমে এর পেছনে জনসমর্থন আরোপ করা হচ্ছে-কিন্তু প্রকৃতপক্ষেই সেটি জনগণের দলিল হয়নি।

গ) নীতিমালার কৌশলগত বিষয়বস্তুগুলোর আধিক্য ও কর্মপরিকল্পনায় পুনরুক্তি রয়েছে।

আইসিটি পলিসির প্রথম পর্যালোচনা: মন্ত্রীসভায় অনুমোদন করার পর সংসদে পেশ ও পাশ করার আগে গত ১৬ জুন ২০০৯ বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল একটি অর্ধবেলার কর্মশালার আয়োজন করে। কর্মশালায় বলা হয়নি যে এটি পর্যালোচনা করা হচ্ছে। তবে নীতিমালা বাস্তবায়নে করণীয় কি সেটি নির্ধারণ করার জন্য এই কর্মশালার আয়োজন করা হয়। এতে ১১ জন সচিবসহ ৭১ জন সরকারের কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন। কর্মশালার দুটি (উদ্বোধনী ও সমাপনী) অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের সাবেক সচিব জনাব নাজমুল হুদা। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ছয়জন সচিবসহ বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী স্থপতি ইয়াফেস ওসমান (প্রধান অতিথি হিসেবে) বক্তব্য প্রদান করেন। সৌভাগ্যক্রমে বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতির পক্ষ থেকে আমি ও আমাদের কোষাধ্যক্ষ শাহিদুল মুনির এতে অংশ গ্রহণ করি। সেই কর্মশালাটি আমাদেরকে একটি ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তোলার পক্ষে আমলাদের ইতিবাচক মানসিকতার প্রকাশ ঘটিয়েছে। আমাদের কাছে বিস্ময়কর মনে হয়েছে যে, তারা কেবল যে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার পক্ষে ইতিবাচক কথা বলেছেন তা-ই নয়, বরং তারা এরই মাঝে কি কি কাজ করেছেন এবং কোন কোন কাজ করা উচিত সেটিও বলেছেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর অংশগ্রহণকারী সকলকে মোট ছয়টি দলে ভাগ করে নীতিমালার বিষয়বস্তুগুলো বাস্তবায়নে করণীয় সুপারিশ করার জন্য বলা হয়। মজার বিষয় যে, বিষয়বস্তুর প্রেক্ষিতে এরই মাঝে স্থির করা ৩০৬টি কর্মপরিকল্পনার কথা এই দলগুলোকে বলা হয়নি। ফলে দলগুলো মাত্র দুই ঘন্টার মাঝে প্রায় শতাধিক করণীয় সুপারিশ করে। আমাদের হাতে যদি সেইসব করণীয় আসে তবে সেগুলো অবশ্যই উপস্থাপিত করা যাবে। এই প্রস্তাবনাগুলো বাস্তবে বিদ্যমান নীতিমালাটিকে একটি পর্যালোচনার মাঝে নিয়ে গেছে। মাত্র দুই ঘন্টাতেই সরকারের এই নীতি বাস্তবায়নকারীরা অনেকগুলো নতুন বিষয় তুলে ধরেছেন আবার কিছু বিষয়কে বাদও দিয়েছেন। আমি নীতিমালা প্রণয়নের সময় বারবার যে এটি জনগণের সামনে পেশ করার জন্য অনুরোধ করছিলাম সেটির মুল্য উদ্দেশ্য ছিলো এমনই। যদি এটি সমাজের সকল পর্যায়ের লোকজনের কাছে পেশ করা যেতো তবে নিশ্চয়ই একটি পূর্নাঙ্গ দলিল হতে পারতো।

ঢাকার এই সেমিনারের পর বিসিসি খুলনা (২২ জুন), চট্টগ্রাম (২৮ জুন) ও বরিশালে (২৯ জুন) এমন আরও তিনটি সেমিনারের আয়োজন করে। এইসব সেমিনারেও কিছু সংযোজন ও কিছু বিয়োজন করা হয়। অন্য বিভাগীয় শহরেও একই ধরনের অভিজ্ঞতা হতে পারে।

বাজেটে তথ্যপ্রযুক্তি ও ডিজিটাল বাংলাদেশ: নীতিমালার কথাই বলি আর কর্মপরিকল্পনার কথাই বলি, নির্বাচনী ইশতেহারে থাকুক বা সরকারের পাচশালা পরিকল্পনায় আসুক কিংবা বিশ একুশের প্রেক্ষিত পরিকল্পনায় আসুক, ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তোলার প্রথম কার্যক্রম আমরা ২০০৯-১০ সালের বাজেটে প্রতিফলিত হতে দেখি। অন্তত এখান থেকেই যাত্রা শুরু করার কথা। এককথায় বলা যেতে পারে, জাতীয় সংসদে ২০০৯-১০ সালের বাজেট পেশ করার মধ্য দিয়ে সরকার প্রাথমিকভাবে ২০২১ সালে সে কোথায় যেতে চায় তার একটি পথরেখা নির্দেশ করেছে। কার্যত বাজেটের দিকে তাকালে আমরা কিছুটা ধারণা পাবো যে, শেখ হাসিনার সরকারের কথা ও কাজের মাঝে কেমন মিল রাখা হয়েছে।

শুরুতেই একটি স্বপ্নের প্রসঙ্গ টানা যেতে পারে। যে সরকার ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়তে চায় সেই সরকার সংসদে বাজেট পেশ করার ক্ষেত্রে একটি ভিন্ন মাত্রা যোগ করতে পারতো। আমি তেমন একটি স্বপ্ন দেখেছিলাম। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সেটি হয়নি। ফলে আমার প্রথম স্বপ্নটি বাস্তবে দেখতে পাইনি।

আমার স্বপ্নটা এমন ছিলো: একটু সচেতন হলেই ২০০৯ সালের ১১ জুন বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের পরিবেশটি আলাদা হতে পারতো। বদলে যেতে পারতো সংসদ অধিবেশন ও বাজেট পেশের চিরাচরিত চেহারাটা। আমরা বাজেট অধিবেশনেই-বা বাজেট পেশের দিনেই দেখতে পেতে পারতাম ডিজিটাল বাংলাদেশের প্রথম সিড়িটি। বাংলাদেশের ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু, সংসদীয় গণতন্ত্রের কেন্দ্র ও জাতির সবচেয়ে বেশি আশা আকাঙ্ক্ষার স্থান সংসদ থেকেই ১১ জুন ২০০৯ ডিজিটাল বাংলাদেশের রূপায়ন শুরু হতে পারতো।

আমার স্বপ্ন অনুসারে সংসদের সেদিনের আবহটি হতে পারতো ভিন্ন রকম। আমরা ইচ্ছে করলে এমন কল্পনা করতে পারি যা ঘটলে দেশটি যে সত্যি সত্যি ডিজিটাল বাংলাদেশ কর্মসূচী গ্রহণ করেছে সেটি খুব সহজেই অনুমান করা

যেতো। ঘটনাটি যদি এমন হতো যে, শেখ হাসিনা সরকারের স্মার্ট অর্থমন্ত্রী হাতে একটি সাদামাটা ব্রিফকেসের বদলে একটি সুদৃশ্য ল্যাপটপ নিয়ে বাজেট অধিবেশনে প্রবেশ করলেন এবং সেই ল্যাপটপ থেকে সংসদের ভেতরে ও বাইরে স্থাপিত একাধিক প্রজেকশন স্ক্রিণে তিনি বাজেট সংক্রান্ত বক্তব্য প্রক্ষেপণ করলেন। এমন হলে কি বিষয়টি একেবারেই অন্যরকম মনে হতোনা? তার বক্তৃতার ফাকে ফাকে কিছু গ্রাফ বা চিত্র থাকলে আমাদের জন্য কি বোঝার সুবিধা হতোনা? কাগজে ছাপানো বক্তৃতা পাঠ করা অবস্থায় এসব গ্রাফ বা চিত্র দেখানো যায়না। কিন্তু উপস্থাপনায় সেটি খুব সহজেই করা যায়। যদি সাধারণ মানুষ সংসদ চত্তরে বসে থেকে বিশাল স্ক্রীণে অর্থমন্ত্রীর বাজেট বক্তৃতাটি পাঠ করতে পারতো (শুধু টিভি পর্দায় পাঠরত অর্থমন্ত্রী নয়, বাজেট বক্তৃতার পাঠ্য অংশ দেখানো যেতো।) তবে কি পুরো দেশটিকেই একটু ভিন্নরকম মনে হতোনা? কাজটি কি অসাধ্য ছিলো? না কোটি কোটি টাকার বিষয় ছিলো? না, এর কোনটাই নয়। যে দল তার নির্বাচনী প্রচারণা চলাকালে শেখ হাসিনার ভিডিও কনফারেন্সিং করতে পেরেছে, সেই দলটি সরকার গঠন করে এমন কাজটি করতে পারতোনা? নিশ্চয়ই পারতো। কিন্তু হতাশাজনকভাবে সেটি করেনি।

আমি জানি, অর্থমন্ত্রীর নিজের ল্যাপটপ কম্পিউটার রয়েছে। অর্থমন্ত্রী নিজে তার বাজেট বক্তৃতায় বলেছেন, তার মন্ত্রণালয় তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করে বাজেট প্রণয়ন করেছে। বাজেটের জটিল হিসাব নিকাশতো বটেই দেশের ৫৮টি জেলা যে কম্পিউটার নেটওয়ার্কের আওতায় সেটিও তিনি বলেছেন। সূতরাং তার হাতে একটি ল্যাপটপ থাকাটা মোটেই অস্বাভাবিক বা অবাস্তব মনে হতে পারেনা।

প্রশ্ন হতে পারে, আমাদের এই স্বপ্নটা কি অনেক বড়? না, তা নয়। তবে অর্থমন্ত্রী এমনভাবে সংসদে বাজেট পেশ করলে আমরা অন্তত একটি নতুন স্বপ্নের জগতে প্রবেশ করতে পারতাম। আমরা খুশী হতাম তার আচরণে এজন্য যে তিনি সত্যি সত্যি ডিজিটাল বাংলাদেশ করতে পারবেন। আমি একথা বলছিনা যে, এই কাজটি না করার জন্য তিনি ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়তে পারবেন না। এবারের বাজেটে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার এবং গড়ার পথের অনেক বাধার কাজ তিনি করেছেন। বাজেট বক্তৃতায় তিনি একদিকে ডিজিটাল বাংলাদেশের জন্য বরাদ্দ দিয়েছেন, অন্যদিকে কম্পিউটার, মোবাইল ফোনসহ ডিজিটাল যন্ত্রপাতির দাম বাড়িয়েছেন। সেই কথায় পরে আসা যাক।

আমরা ডিজিটাল বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে আরেকটি স্বপ্ন দেখতে পারতাম যে, জাতীয় সংসদের সকল সদস্যরা নিজেদের সাথে করে একটি ল্যাপটপ বহন করছেন এবং সেই ল্যাপটপে ওয়াইফাই সংযোগ দেয়া থাকতো, যার ফলে তারা নিজেরা পরস্পর যুক্ত থাকতেন এবং অর্থমন্ত্রীর বাজেট, অর্থ মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট, সংসদের ওয়েবসাইট বা অর্থমন্ত্রীর ল্যাপটপ থেকে তার বাজেট বক্তৃতা তারা পাঠ করতে পারতেন। যদি সংসদ এলাকাটি একটি ওয়াইফাই জোন হয় তবে কি আমরা খুশী হতামনা। এতে কি অনেক বেশি অর্থের দরকার হতো?

এমন হতে পারতো যে, সংসদ সদস্যরা অর্থ মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট থেকে যখন খুশী যে কোন দলিল ডাউনলোড করতে পারতেন। এটি এমনও হতে পারতো যে, তারা সিডি/ডিভিডিতে পেতে পারতেন এই বাজেটের কপি। ডিজিটাল বাংলাদেশ যারা করতে চায় তাদের সংসদে প্রতি সদস্যের জন্য একটি করে ল্যাপটপ প্রদান কি কঠিন ছিলো? বরং অর্থমন্ত্রী বাজেট বক্তৃতার আগেই তাদের জন্য কেনা ল্যাপটপ কম্পিউটারে বাজেটের কপি দিয়েই সংসদ থেকেই ডিজিটাল বাংলাদেশের সূচনা করতে পারতেন।

সংসদ সদস্যদের জন্য ল্যাপটপ কেনা হলেও প্রশ্ন ওঠতে পারতো, সংসদ সদস্যরা যদি কম্পিউটার ব্যবহার করতে না পারেন তবে ল্যাপটপ দিয়ে লাভ কি? এটি সত্য যে, আমাদের সকল সংসদ সদস্য ল্যাপটপ-ইন্টারনেট ব্যবহার করতে জানেনা। কিন্তু যদি আমাদেরকে মাত্র সাতদিন সময় দেয়া হতো তবে আমরা সকল সংসদ সদস্যদেরকে কম্পিউটার কেমন করে ব্যবহার করতে হয়, কেমন করে ইন্টারনেট ব্যবহার করতে হয় বা কেমন করে মেইল আদান প্রদান করতে হয় তা শিখিয়ে দিতে পারতাম।

আমরা জানি এখনও সেটি হয়নি-হবারও নয়। সেজন্য তিনি বাজেটের দলিলগুলো এমনকি কাগজের পাশাপাশি সিডি/ডিভিডিতেও দিতে পারেননি। এমনকি তিনি ১৫ কোটি বাংলা ভাষাভাষী মানুষের দেশে, বাংলা একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হবার পরও তার মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটটির ভাষা এখনও বাংলা করতে পারেননি। যে সরকার ডিজিটাল বাংলাদেশের কথা বলে তার অর্থ মন্ত্রণালয়ের ইংরেজী ওয়েবসাইট সাধারণ মানুষকে হতাশ করে-কারণ ডিজিটাল বাংলাদেশ বাংলা ভাষাভাষী সাধারণ মানুষের জন্য-ইংরেজী ভাষাভাষী কিছু মানুষের জন্য নয়। সেজন্যই মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে বাজেটের সকল দলিলপত্র বাংলায় থাকার পরও, পুরো ওয়েবসাইটটি বাংলায় হলে জনগণের প্রশংসা পেতো।

ডিজিটাল বাংলাদেশ নিয়ে যাদের আগ্রহ আছে তারা ১১ জুন ২০০৯ বিকালে এসব বিষয় ছাড়াও প্রচণ্ড আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছিলেন অর্থমন্ত্রী কেমন বাজেট পেশ করেন এবং তাতে ডিজিটাল বাংলাদেশ বিষয়টি কতোটা গুরুত্ব পায় তার জন্য।

বাজেট বক্তৃতা ও বরাদ্দ: এটি অবশ্যই আনন্দের বিষয় যে বাজেট পেশের পরিবেশের স্বপ্ন পূরণ না হলেও আমরা একেবারে হতাশ হইনি। তার সুদীর্ঘ বাজেট বক্তৃতার গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অবশ্যই ছিলো ডিজিটাল বাংলাদেশ। আমি মাননীয় অর্থমন্ত্রীকে ধন্যবাদ দিতে চাই এজন্য যে, তিনি ২০১০-২১ সালের প্রেক্ষিত পরিকল্পনা প্রণয়নের কাজ হাতে নিয়ে এবারের বাজেট পেশ করেছেন। এই সরকার তার আইসিটি নীতিমালা গ্রহণ করার সময় এটি ভাবেনি। এই নীতিমালার দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্য দশ বছর রাখা হয়েছে। অথচ সেটি ২০২১ সাল পর্যন্ত সম্প্রসারিত করা উচিত ছিলো। আইসিটি নীতিমালার এই দুর্বলতা মুহিত সাহেবের প্রেক্ষিত পরিকল্পনায় কেটে যাবে। তার এই সিদ্ধান্তের ফলে মহাজোট সরকার ২০২১ সালের রূপকল্পে কেমন করে যেতে চায় সেটি আমরা চোখের সামনে দৃশ্যমান দেখতে পাবো। আশা করি, ২০০৯-১০ সালে বাজেটের সংশোধিত রূপে সেই মহাপরিকল্পনার প্রভাব পড়বে এবং ২০১০-১১ সালের বাজেট এই মহাপরিকল্পনার আলোকে পেশ করা হবে। হতে পারে ২০১০-১১ সালের বাজেটই হবে ডিজিটাল বাংলাদেশের প্রথম বাজেট। তিনি যে ২০১০-১৫ সালের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাও প্রস্তুত করছেন তার জন্য আমি তাকে ধন্যবাদ দিতে চাই।

মুহিত সাহেব ধন্যবাদ পেতে পারেন বাজেট পেশের বিষয়টি থেকেই। বাজেট বক্তৃতায় তিনি অত্যন্ত সুন্দরভাবে বাজেট প্রণয়নে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহারের কথা বলেছেন। তার ভাষায়, "আমি অত্যন্ত আনন্দের সাথে জানাচ্ছি যে সরকারি বাজেট ও হিসাব সংক্রান্ত আর্থিক উপাত্ত ও সঙ্কলনে ব্যাপকভাবে তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহৃত হচ্ছে।................এর ফলে বর্তমানে আমরা সময়োচিত ও নির্ভুল প্রতিবেদন প্রণয়ন ও প্রকাশ নিশ্চিত করতে পারছি। বর্তমান ব্যবস্থায় বাংলাদেশের ৫৮টি জেলাসহ বিভাগীয় সদর দপ্তরের হিসাব অফিসসমূহের সাথে ওয়াইড এরিয়া নেটওয়ার্ক এর মাধ্যমে সংযোগ স্থাপন করা হয়েছে।.......আগামীতে এ তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবস্থা আরও সম্প্রসারিত করে দেশের সকল উপজেলাকে তথ্যপ্রযুক্তি নেটওয়ার্ক-এর আওতায় আনা সম্ভব হবে।" (অনুচ্ছেদ ৭৯, অর্থমন্ত্রীর বাজেট বক্তৃতা)। অর্থমন্ত্রীর এই প্রতিশ্রুতি কার্যত একটি ডিজিটাল সরকারের স্বপ্নকে বাস্তবায়নের ইঙ্গিত বহন করে। এই কাজটি যদি তিনি সরকারের সকল অঙ্গে করতে পারেন তবে ডিজিটাল বাংলাদেশ কেবল স্বপ্ন থাকবেনা। তবে আমরা আগেই আলোচনা করেছি যে তিনি তার আগের অর্থমন্ত্রীরা যে সুযোগ তৈরী করে গেছেন সেটি ব্যবহার করেছেন মাত্র। যদি তিনি তথ্যপ্রযুক্তি দিয়ে জাতয়ি সংসদকেও শক্তিশালী করতে পারতেন তবে তার কৃতিত্ব আরও বেশি বলে আমি মনে করতে পারতাম।

বাজেট বক্তৃতা দেবার আগে অর্থমন্ত্রী বেশ কয়েক স্থানে এমন মন্তব্য করেছেন যে, বিদ্যুৎ সম্পর্কে তিনি যতোটা আশাবাদী হয়ে আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহার প্রণয়ন করেছিলেন, বাস্তব অবস্থা তার চাইতে খারাপ। কিন্তু বাজেট বক্তব্য শুনে আমি তাকে ধন্যবাদ দিতে চাই। বাজেটে বক্তৃতার পর নিশ্চিতভাবেই অর্থমন্ত্রীকে ধন্যবাদ দিতে হবে বিদ্যুৎ ও খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের সাহস করার জন্য। ডিজিটাল বাংলাদেশ তৈরীর প্রথম বাধা হিসেবে আমি নতুন প্রজন্মের মানুষদের কাছ থেকে একটি খাতের কথা বারবার শুনছি-সেটি হলো বিদ্যুৎ। তরুণরা ব্যাপকভাবে লোডশেডিং-এর সমালোচনা করে থাকে। তারা এটি বুঝতে চায়না যে, লোডশেডিং এই সরকারের তৈরী করা নয় বা এটি একদিনে তৈরী হয়নি। তবুও নতুন প্রজন্মের মানুষদের প্রত্যাশা, স্বপ্ন ও কষ্টটার কথা ভাবতে হবে। অর্থমন্ত্রী তার বাজেট বক্তৃতায় উল্লেখ করেন যে, ২০০৮ সালে বেসরকারি খাতে ৩০৭ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন শুরু হয়। শেখ হাসিনার সরকার ২০০১ সালে বিদায় নেবার পর সম্ভবত এটিই বিদ্যুতের নতুন সংযোজন। তিনি জানান যে, ২০০৯ সালে সরকারী খাতের ৪টি প্রকল্পে ৫০০ এবং বেসরকারী খাতের ১১টি প্রকল্পে ৪৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদিত হবে। আমি ধারণা করি, এর ফলে ২০০৯ সালের বাড়তি চাহিদা পূরণ করে লোডশেডিং কিছুটা কমে আসবে। তিনি ২০১১ সালে বিদ্যুতের নূনতম চাহিতা পূরণ সম্ভব হবে বলে আশ্বাস প্রদান করেছেন। যদিও ২০১১ সাল এখন থেকে আরও আড়াই বছর দূরের, তবুও এমন একটি সময়সীমা দিতে পারার জন্য অর্থমন্ত্রীকে ধন্যবাদ দিতে চাই। ২০২১ সালে দেশের বিদ্যুতের চাহিদা ২০ হাজার মেগাওয়াট হবে বলে উল্লেখ করে তিনি জানান যে, ২০১৩ সালে সরকারি খাতের ১৩টি প্রকল্পে আরও ২৮১০ মেগাওয়াট ও বেসরকারী খাতের ৩টি প্রকল্পে ১৩৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদিত হবে। (অনুচ্ছেদ ১২৪ ও ১২৫, অর্থমন্ত্রীর বাজেট বক্তৃতা)।

তিনি তার বক্তৃতায় ২০১২ সালে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনেরও ঘোষণা প্রদান করেন। আমি মনে করি, একটি সুদৃঢ় ইচ্ছাশক্তির অধিকারী সরকারের পক্ষেই কেবল এমন সুনির্দিষ্ট অঙ্গীকার ব্যক্ত করা সম্ভব।

তার বাজেট বক্তৃতার শুরুতেই তিনি বলেন, "আমাদের রূপকল্প অনুযায়ী ২০২০-২১ সাল নাগাদ আমরা এমন এক বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করতে চাই, যেখানে অর্থনীতির চালিকা শক্তি হবে উন্নত প্রযুক্তি এবং উচ্চতর প্রবৃদ্ধি।

সেই সম্ভাব্য বাংলাদেশে স্থিতিশীল থাকবে দ্রব্যমূল্য, আয় দারিদ্র ও মানব দারিদ্র নেমে আসবে ন্যূনতম পর্যায়ে, সবার জন্য শিক্ষা ও স্বাস্থ্য অধিকার নিশ্চিত হবে, ব্যাপকভাবে বিকশিত হবে মানুষের সৃজনশীলতা এবং সক্ষমতা, সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা পাবে, হ্রাস পাবে সামাজিক বৈষম্য, প্রতিষ্ঠা পাবে অংশীদারিত্বমূলক গণতন্ত্র এবং অর্জিত হবে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সৃষ্ট বিপর্যয় মোকাবেলায় সক্ষমতা। সেই বাংলাদেশ তথ্যপ্রযুক্তিতে বিকশিত হয়ে পরিচিত হবে ডিজিটাল বাংলাদেশ হিসেবে।" (অনুচ্ছেদ ৭, অর্থমন্ত্রীর বাজেট বক্তৃতা)

আমার ভাবনার ডিজিটাল বাংলাদেশ সম্পূর্ণ না হলেও কিছুটা হলেও প্রতিফলিত হয়েছে অর্থমন্ত্রীর বাজেট বক্তৃতায়। প্রযুক্তি তথা ডিজিটাল প্রযুক্তিকে অর্থনীতির চালিকা শক্তি হিসেবে চিহ্নিত করার দূরদৃষ্টির জন্য আমি অর্থমন্ত্রীর প্রশংসা করতে চাই। একই সাথে তিনি মানুষের সৃজনশীলতা ও সক্ষমতার বিকাশের পাশাপাশি সামাজিক সাম্য ও অংশীদারিত্বমূলক গণতন্ত্রের কথা বলে বর্তমান সরকারের সচেতনতাকে চমৎকারভাবে প্রতিফলিত করেছেন। ধন্যবাদ অর্থমন্ত্রীকে।

তিনি অনুচ্ছেদ ৮-এ ডিজিটাল বাংলাদেশের অন্যতম প্রত্যাশা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার দুই সংখ্যায় যাবার বিষয়েও স্পষ্ট করে বলেছেন যে, ২০১৭ সাল নাগাদ এটি ১০ শতাংশে উন্নীত হবে। আমি ডিজিটাল বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখার সময় এই স্বপ্নটিও দেখেছি। কারণ এছাড়া কোনভাবেই জনগণের জীবনমান উন্নত করা যাবেনা, জাতীয় আয় বাড়ানো যাবেনা এবং দারিদ্র দূর করা যাবেনা। আর এসব না হলে ডিজিটাল বাংলাদেশ হবেনা।

অনুচ্ছেদ ১৪-এ অর্থমন্ত্রী অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বলেন, "কর্মসংস্থানের সুযোগ, সরকারী ব্যয়ের প্রসার এবং বিনিয়োগের হার বৃদ্ধি ছাড়া দারিদ্র বিমোচনে অগ্রগতি সম্ভব নয় বলে আমরা সবিশেষ নজর দিয়েছি। সর্বোপরি দ্রুত উন্নয়নের লক্ষ্যে আমাদের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিকে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করতে হবে। তাই আমরা ২০২১ সালে ডিজিটাল বাংলাদেশের স্বপ্ন নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছি। ডিজিটাল বাংলাদেশ উৎপাদনের প্রবৃদ্ধি যেমন সহজতর করতে পারে, তেমনি দুর্নীতি প্রশমনে অগ্রগতি নিশ্চিত করতে পারে। সর্বোপরি কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিতে তথ্য-প্রযুক্তি বিনিশ্চায়ক ভূমিকা পালন করবে। ২০২১ সালে কাপড় ও পোশাক শিল্পের পরেই তথ্যপ্রযুক্তিতে নিয়োজিত থাকবে দেশের সর্বোচ্চ জনশক্তি।" (অনুচ্ছেদ ১৪, অর্থমন্ত্রীর বাজেট বক্তৃতা)

মহাজোট সরকারের অর্থমন্ত্রী যেভাবে স্পষ্ট করে অতি সুন্দরভাবে এই কথাগুলো বলেছেন তাতে আমার বুকটা বড় হয়ে ওঠেছে। একটি দেশে কৃষিভিত্তিক অর্থনীতির বিকাশের কথা বলা হচ্ছে, কৃষিতে গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে, অন্যদিকে জনসংখ্যার মূল স্রোতকে সেবাখাতের দিকে নিয়ে যাবার স্বপ্ন দেখা হচ্ছে। বাংলাদেশের জন্য কৃষি যুগ থেকে শিল্পযুগ মিস করে ডিজিটাল যুগে যাবার এই প্রচেষ্টাটিকে স্মরণীয় ও মাইলফলক বলে চিহ্নিত করতে হবে।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শিরোনামে তিনি ডিজিটাল বাংলাদেশের কথা বলেছেন। অনুচ্ছেদ ১৯২ থেকে তার এই বক্তব্যটি শুরু হয়। ১৯২ অনুচ্ছেদে তিনি ২০১৩ সালে মাধ্যমিক স্তরে এবং ২০২১ সালে প্রাথমিক স্তরে কম্পিউটার শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করার অঙ্গীকার করেছেন। ১৯২ অনুচ্ছেদে তিনি ২০১২ সালে ই-কমার্স এবং ২০১৪ সালে ই-গভর্নেন্স ব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। ১৯৪ অনুচ্ছেদে তিনি ডিজিটাল প্রশাসন গড়ে তোলার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ১৯৫ অনুচ্ছেদে বিজ্ঞান ও গবেষনায় ব্যাপক বিনিয়োগের কথা বলেছেন। ১৯৬ অনুচ্ছেদে তিনি আইটি খাতের বিভিন্ন প্রকল্পের জন্য ১০০ কোটি টাকার থোক বরাদ্দ এবং ইইএফকে ১০০ কোটি থেকে ২০০ কোটি টাকা করার প্রস্তাব করেছেন। যদিও আমরা ১০০ কোটি টাকার বদলে ৩৩৮ কোটি টাকার প্রত্যাশা করেছিলাম তবুও অর্থমন্ত্রীকে ধন্যবাদ।

অর্থমন্ত্রীর ধন্যবাদ পাবার বিষয়টি আরও সম্প্রসারিত করা যায়। ২৯৪ অনুচ্ছেদে অর্থমন্ত্রী একটি যুগান্তকারী ঘোষণা দিয়েছেন। এতে তিনি বলেছেন যে, ভূমি ব্যবস্থাপনাকে তিনি ডিজিটাল করতে চান। অন্যদিকে ৩০৮ অনুচ্ছেদে (উপ অনুচ্ছেদ ৬) তিনি কর প্রশাসনে তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারের ঘোষণা দিয়েছেন। ৩১৫ ও ৩২০ অনুচ্ছেদেও তিনি সেই অঙ্গীকারের কথা আবার উল্লেখ করেছেন। অনুচ্ছেদ ৩২১ (৬) এ তিনি অনলাইনে আয়কর রিটার্ন জমা দেওয়া এবং কম্পিউটার ও ল্যাপটপের ব্যবহার সহজলভ্য করা এবং সফটওয়্যার খাতের উন্নয়নের জন্য কিছু প্রস্তাব করেছেন। আমরা জানিনা, তিনি এই প্রস্তাবনায় কি কি বিষয় বা কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তবে প্রস্তাবগুলো ডিজিটাল বাংলাদেশের সহায়ক হোক সেই প্রত্যাশা আমাদের রয়েছে। আমরা পরে খবর নিয়ে জেনেছি যে, ইন্টারনেটে আয়কর জমা দেবার সুযোগটি এবার পাবে কেবলমাত্র ১০০০ বড় প্রতিষ্ঠান-যাদেরকে কর্পোরেট সংস্থা বলা হয়। সাধারণ জনগণ এই কার্যক্রমের সুযোগ পাবেনা। ল্যাপটপ ও কম্পিউটার কিনলে আয়কর রেয়াত পাওয়া যাবে বলেও বাজেটে ব্যবস্থা রাখা হয়েছে বলে আমরা জেনেছি।

অর্থমন্ত্রীর বক্তৃতার ডাক ও টেলিযোগাযোগ অংশটি সরাসরি ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার সাথে জড়িত। তিনি ১৬৪ নং অনুচ্ছেদে গ্রামে গঞ্জে ইন্টারনেটের প্রসারের কথা বলেছেন। এই অংশে তিনি ইন্টারনেটের আওতা বাড়ানো ও সেবার মূল্য কমানোর পাশাপাশি ৫ বছরের মাঝে সব কটি উপজেলাকে ইন্টারনেটের আওতায় আনার ঘোষণা প্রদান করেন। আমি এই জায়গাটিতে বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছি। কার্যত বাংলাদেশের শতকরা ৯২ ভাগ ভূমি এখন ইন্টারনেটের (মোবাইল নেটওয়ার্কের মাধ্যমে) আওতায় আছে। অর্থাৎ সবকটি উপজেলা এখন ইন্টারনেটের আওতাতেই আছে। অর্থমন্ত্রী পাচ বছরে তাহলে এই দেশের আর কোন অঞ্চলকে ইন্টারনেটের আওতায় আনবেন? শতকরা ৮ ভাগ, যা বাকী আছে? আমি নিশ্চিত এর জন্য তার নিজের কোন প্রচেষ্টা প্রয়োজন হবেনা। পার্বত্য চট্টগ্রামের যেসব এলাকায় মোবাইল নিষিদ্ধ আছে সেই এলাকাগুলোতে মোবাইল চালু করলেই এই পরিবর্তনটি ঘটে যাবে।

আমি ধারণা করি, বাজেট বক্তব্যে মাননীয় অর্থমন্ত্রী সরকারী খাতের ইন্টারনেট সেবার কথা বলেছেন। আমি মনে করি, যদি সেটি হয়ে থাকে; তবে এটি কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা নয়। কারণ আমরা ইন্টারনেট চাই-কে দিলো সেটি বড় কথা নয়। সরকার না দিলেও সেটি যদি ক্রয় ক্ষমতার মাঝে হয় তবে তাতেই আমরা খুশী। দুর্ভাগ্যজনকভাবে ইন্টারনেট এখনও জনগণের ক্রয় ক্ষমতায় নেই। সম্প্রতি একটি বিদেশী সংস্থা জেট্রো এশিয়ার ১৫টি শহরে তাদের জরীপ কাজ চালিয়ে বলেছে যে, বাংলাদেশে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেটের মাসিক ফিস ও প্রথম কানেকশন ব্যয় এশিয়ার মাঝে সবচেয়ে বেশি। এই সংস্থাটি এশিয়ার সিউল, বেইজিং, সাংহাই, গোয়াংজু, হংকং, জাকার্তা, তাইপে, সিঙ্গাপুর, ব্যাঙ্কক, কুয়ালালামপুর, ম্যানিলা, হ্যানয়, হোচি মিন সিটি, ইয়াঙ্গুন, নয়া দিল্লী, করাচি, মুম্বাই ও ঢাকায় এই জরীপ পরিচালনা করে। (সূত্র ডেইলি স্টার ১৯ জুন ২০০৯, পৃষ্ঠা বি৩) এজন্য সাবমেরিন ক্যাবলের ব্যান্ডউইদথ দশ হাজার টাকায় কমিয়ে আনতে হবে। ইন্টারনেটের সেবাদানকারীদের লাইসেন্স ফিসসহ অন্যান্য ব্যয় কমাতে হবে।

এই বাজেটে ৩৪৭ অনুচ্ছেদে তিনি শিক্ষা খাতে ব্যবহৃত ইন্টারনেটের ওপর থেকে ভ্যাট প্রত্যাহারের ঘোষণা দিয়েছেন। সেটি সকল ব্যবহারকারীর জন্য কেন নয়, এটি আমি বুঝতে অক্ষম। অন্যদিকে তিনি ইন্টারনেটের ব্যান্ডউইদথ অপচয় করার পরও শিক্ষাখাতে বিণামূল্যে ইন্টারনেট সেবা কেন দিচ্ছেন না সেটি আমাদের বোধগম্য নয়।

অন্যদিকে মোবাইলের ওপর ২৫+৫ ভাগ করারোপ করে কেমন করে গ্রামে-গঞ্জে ইন্টারনেট পৌছানো যাবে সেটি বোঝা সম্ভব নয়। প্রাপ্ত উপাত্ত অনুসারে প্রস্তাবিত কর কাঠামোতে চোরাচালানী হবে শতকরা ৯০ ভাগ, বর্তমানে যেটি শতকরা মাত্র ১৫ ভাগ। চলতি অর্থ বছরে পাকিস্তানে মোবাইল সেটের ওপর ৭০০ টাকা থেকে ২৫০ টাকা এবং ভারতে শতকরা ৪ ভাগ করের তূলনায় এটি ভয়ংকর রকমের খারাপ। বিশেষ করে ভারত থেকে আমাদের হাজার হাজার মাইল সীমান্ত দিয়ে বিপুল পরিমাণ মোবাইল সেট চোরাচালানী হবে বলে ধারণা করা যায়। বলা ভালো যে, মোবাইলের ৮০০ টাকার সিম করও মোবাইলের ব্যবহার বাড়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে। এর ফলে ২৩০০ কোটি টাকার হুন্ডি ব্যবসা হবে বলে মোবাইল আমদানীকারকগণ মনে করেন। তারা এর ফলে সরকারের রাজস্ব বাড়ার বদলে কমবে।

তার বক্তৃতার ১৬৫ ও ১৬৬ অনুচ্ছেদে তিনি দ্বিতীয় সাবমেরিন ক্যাবল ও গ্রোথ সেন্টারে-উপজেলায় ডিজিটাল এক্সচেঞ্জ স্থাপনের কথা বলেছেন। তিনি এক বছরে দেশের ভেতরে ফাইবার সংযোগ স্থাপনের ঘোষণা দিয়ে আমাদেরকে উৎসাহিত করেছেন। কিন্তু তিনি ২০০৯-১০ অর্থ বছরে টেলিডেনসিটি ৩২ থেকে কতোতে নিতে চান সেটি বলেননি। একইভাবে ৩২৯ (জ) অনুচ্ছেদে তিনি মোবাইলের ওপর শতকরা ২৫ ভাগ হারে কর আরোপ করেছেন এবং সিমের কর কমাননি বা প্রত্যাহার করেননি। আমি মনে করি, ডিজিটাল বাংলাদেশের কথা বলে মোবাইলের ওপর শতকরা ২৫+৫ ভাগ করারোপ করা একেবারেই স্ববিরোধী কাজ। মুহিত সাহেব কিভাবে এমন কাজটি করেছেন সেটি আমার কাছে মোটেই বোধগম্য হয়নি। ডিজিটাল বাংলাদেশের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে টেলিফোনের পেনিট্রেশন। বাংলাদেশে সরকারী খাতের স্থবির ফিক্সড ফোন এবং বেসরকারী খাতে অক্ষম তথাকথিত ফিক্সড ফোনের বিপরীতে বিগত এক দশকে মোবাইলের অগ্রগতি হয়েছে আশাতীত। সরকারের নীতিনির্ধারক ও বিশেষজ্ঞদের সকল ধারণাকে মিথ্যা প্রমাণিত করে দেশে প্রায় পাচ কোটি সচল মোবাইল সংযোগ রয়েছে। কিন্তু সিমের ওপর উচ্চহারে কর থাকায় সেটি সাম্প্রতিককালে ব্যাহত হতে থাকে। আমরা গোড়া থেকেই এই কর প্রত্যাহারের কথা বলেছি। অর্থমন্ত্রী সেই কর প্রত্যাহার না করে গোদের ওপর বিষফোড়ার মতো মোবাইল সেটের ওপর সর্বোচ্চ হারে করারোপ করেছেন। এর ফলে শুধু যে মোবাইল খাত ক্ষতিগ্রস্ত হবে তা নয়, বরং সরকার এখন যে রাজস্ব পায় সেটিও পাবেনা। মোবাইল কার্যত আবার চোরাচালানের পণ্যে পরিণত হবে। আমি মনে করি মুহিত সাহেবের উচিত মোবাইল সেটের ওপর পচাত্তর ডলার পর্যন্ত দামের জন্য কোন কর না রাখা এবং পচাত্তরের

ওপর দামের মোবাইল সেটের জন্য পাচ শত টাকা কর ধার্য করা। মোবাইলের ওপর অগ্রিম আয়কর থাকা উচিত তবে কোনভাবেই ভ্যাট থাকা উচিত নয়।

বাজেটে মনিটর, প্রিন্টার, টোনার ও রিফিল নিয়ে তুঘলকি কাণ্ড হয়েছে। বাজেটের প্রথম তফশিলে ২৯৬ পৃষ্ঠায় অত্যন্ত স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা আছে যে ৮৫২৮.৪১.০০ ও ৮৫২৮.৫১.১০ এইচএস কোডের মনিটরে শতকরা ২৫ ভাগ কর রয়েছে। অন্যদিকে তিনি তার বাজেটের ৩২৯ (গ) অনুচ্ছেদে শতকরা ২৫ ভাগ করসম্পন্ন দ্রব্যাদিতে শতকরা ৫ ভাগ রেগুলেটরি কর আরোপ করেছেন। আবার ভ্যাটমুক্তির তালিকায় প্রিন্টার, টোনার ও রিফিল নেই। খুব সঙ্গত কারণেই বাজেট ঘোষণার পরের শনিবার বাজার খোলার সাথে সাথে মনিটর গায়েব হয়ে যায় বা দাম বেড়ে যায়। খুব সঙ্গতকারণেই এই দুটি সিদ্ধান্তকে আত্মঘাতি বা স্ববিরোধী বলে চিহ্নিত করা যায়। অন্যদিকে একে বলা যায় এক বালতি দুধে দু ফোটা চুনা। বিষয়টি অর্থমন্ত্রীর বাজেট বক্তৃতায় ছিলোনা বলে মিডিয়া দাম বাড়ার তালিকায় কম্পিউটারের মনিটর ছিলোনা।

কিন্তু আমি চুপ করে থাকিনি। প্রথম তফশিল দেখেই অর্থমন্ত্রীর বাজেট বক্তৃতা চলাকালেই আমি অর্থমন্ত্রীকে এ বিষয়ে আমার হাতশার কথা জানিয়ে এসএমএস করি। এরপর আমি বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রতিমন্ত্রীকেও এসএমএস করি। তাকে ফোন করে অবশ্যই নো রিপ্লাই পাই। তিনি পরে কলব্যাকও করেননি। যাহোক সেই রাতেই একুশে টিভির একুশে রাতে অনুষ্ঠানে আমি এ ব্যাপারে তীব্র প্রতিবাদ করি। পরের দিন আরটিভিতেও একইভাবে আমি এই করও ভ্যাট আরাপের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করি। ইন্টারনেটে বিষয়টি ছড়িয়ে যায় এবং নতুন প্রজন্মের মানুষেরা হতাশা ও ক্ষোভ প্রকাশ করতে থাকেন।

বাজেট বক্তৃতার পরদিন অর্থাৎ শুক্রবার দিন আমি প্রধানমন্ত্রীর অর্থ বিষয়ক উপদেষ্টা ডঃ মশিউর রহমানকে বিষয়টি অবহিত করলে তিনি এক বাক্যে বলেন যে, এটি থাকবেনা। এরপর আমরা আরও অনুসন্ধান করি। কারণ আমি নিশ্চিত ছিলাম মাননীয় অর্থমন্ত্রীর জ্ঞাতসারে এমন কাজ করতে পারেন না। কেননা যদি কম্পিউটার ও প্রিন্টারের ক্ষেত্রে এমন কিছু করার থাকতো তবে সেটি অর্থমন্ত্রী তার বাজেট বক্তৃতায় উল্লেখ করতে পারতেন এবং আমরা তার কাছ থেকে এর যৌক্তিকতা পেতাম। সেটি না করে সকলকে ফাকি দিয়ে কেন এমন কাজটি করা হলো তা আর যাদেরই হোক ডিজিটাল বাংলাদেশের সৈনিকদের বুঝে ওঠার কথা নয়। আমি সন্দেহ করেছিলাম যে, আওয়ামী লীগ সরকারকে সমালোচনার মুখে ফেলার জন্য বা একটি ভালো বাজেটের গায়ে কালো দাগ ফেলার জন্য এটি কোন অন্তর্ঘাতমূলক কাজ কিনা। আমাদের সাথে অর্থমন্ত্রী, বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রীর যতোবারই আলোচনা হয়েছে, আমরা তাদের ইতিবাচক মনোভাবই দেখেছি। এমনকি আমি জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যানের সাথে যখন আলোচনা করেছি তখনও তাকে ইতিবাচকই দেখেছি। এমনকি তিনি এই খাতের আমদানীর ওপর অগ্রিম আয়কর আমার সাথে আলোচনা করেই আরোপ করেন। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর ইন্টারনেট ব্যবহারের ওপর থেকে ভ্যাট প্রত্যাহারের বিষয়টিও তিনি আমার সাথেই আলোচনা করে স্থির করেছেন। সেখানে এই নেতিবাচক সিদ্ধান্ত কার কাছ থেকে এলো সেটি বুঝে ওঠা দায়। শনিবার সকালে আমি অর্থমন্ত্রীর সাথে আলাপ করলে তিনি জানান যে, এটি তিনি জানেননা। এমনকি এটিও জানান যে, প্রয়োজনে এসআরও দিয়ে এটি বাতিল করা হবে। কিন্তু মনিটরের বাজারে ওলট পালট হয়ে যায়। মনিবারে মনিটরের দাম বাড়ে। রোববার সকালে আমি আবার অর্থমন্ত্রীকে ফোন করলে তিনি জানান যে, এনবিআর তাকে একটি ব্যাখ্যা দেবে। রোববার রাতে তিনি জানান যে, এসআরও দিয়ে এনবিআর সেটি আগেই বাতিল করেছে।

আমরা এ বিষয়টি আগেই অনুসন্ধান করেছিলাম। শনিবারেই আমরা বিসিএস-এর নির্বাহী পরিষদের সভা চলাকালে এটি নিশ্চিত হই। এসআরও নং ১৭৭ ও ১৩৩ এর রেফারেন্স ছাড়াও কমিশনার/মহাপরিচালকগণের উদ্দেশ্যে শুল্ক সংক্রান্ত নির্দেশিকায় আমরা দেখতে পাই যে, ২২ ইঞ্চি পর্যন্ত মনিটরের রেয়াতি শুল্ক বহাল করা হয়েছে। (অনুচ্ছেদ ১২, পৃষ্ঠা ১৪)। রোববার তাই মনিটরের বাজার ঠিক হয়ে যায়। রোববার রাতে অর্থমন্ত্রী আমাকে এই বিষয়টি অবহিত করার পাশাপাশি ক্ষোভ প্রকাশ করেন। আমরাও বুঝিনা, প্রথম তফশিলে করের কথা বলে কেন এসআরও দিয়ে তা রহিত করা হয়। বাজেট পেশকালে প্রকাশিত প্রথম তফশিল কি তাহলে এসআরওর চাইতে দুর্বল? এটি আমার কাছে বিস্ময়কর মনে হলো যে ২০০৮ সালের এসআরও কেমন করে ২০০৯ সালের প্রথম তফশিলের চাইতে অধিক কার্যকর হয়। ২০০৯ সালের প্রথম তফশিল কি অতীতের সকল এসআর-এর চাইতে সর্বশেষ আপডেট হওয়া উচিত নয়? এই তুঘলকি কাণ্ড কেন বহাল থাকে সেটি আর যার বোধগম্য হোক-অন্তত আমার বোধগম্য হয়নি। অর্থমন্ত্রী জানালেন যে, তিনি এই অবস্থার পরিবর্তন করতে যাচ্ছেন। এসআরও দিয়ে বাজেট নিয়ন্ত্রন না করাই তার ইচ্ছা- সেকথা তিনি আমাকে জানালেন। আমি আন্তরিকভাবে কামনা করবো, রাজস্ব সংক্রান্ত কার্যক্রমের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও স্পষ্টতা রাখার জন্য এসআরও কালচার বর্জন করা হবে।

অন্যদিকে কম্পিউটারের ওপর বিরাজ করা শতকরা তিনভাগ কর প্রত্যাহার করা উচিত। কারণ আমরা সরকারকে অগ্রিম আয়কর বাবদ শতকরা তিনভাগ রাজস্ব প্রদান করছি। এখন যদি বিদ্যমান করটি থাকে তবে এইসব যন্ত্রপাতির দাম বাড়বে। মুহিত সাহেব ৩০ জুনে এই কর প্রত্যাহার করবেন বলে সকলেই প্রত্যাশা করেন।
বাজেটে আরও কিছু খাতে তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারের কথা বললে সেটি ডিজিটাল বাংলাদেশের সাথে সঙ্গতিপুর্ণ হতো। স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় তিনি টেলি মেডিসিন ব্যবস্থার কথা ও হাসপাতাল ব্যবস্থাপনায় আইসিটি ব্যবহারের কথা বলতে পারতেন। অবশ্য স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডাঃ রুহুল হক গত ১৮ জুন ২০০৯ ই-হেলথ ব্যবস্থায় দেশ যাচ্ছে বলে ঘোষণা দিয়ে অর্থমন্ত্রীর বাজেট বক্তৃতার ঘাটতি পূরণ করেছেন। পুলিশ ও বিচারব্যবস্থায় আইসিটি ব্যবহারের কথা তিনি বলতে পারতেন। ডিজিটাল পদ্ধতিতে কৃষি তথ্য ও সরকারী সেবা প্রদানের কথা তিনি বাজেটে উল্লেখ করতে পারতেন। স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাপনা ও সরকারী নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার কথা তিনি বাজেটে উল্লেখ করতে পারতেন। জাতীয় পরিচয়পত্র, মেশিন রিডেবল বা ই-পাসপোর্ট ইত্যাদি বিষয়কে জনগণের কাছে খুব স্পষ্ট করে বলা উচিত ছিলো। ডিজিটাল নির্বাচন পদ্ধতি নিয়েও কথা বলা উচিত ছিলো। পরিবহনের তথ্য ও দুর্নীতি প্রতিরোধে ডিজিটাল ব্যবস্থার বিষয়টি অর্থমন্ত্রী গুরুত্ব দিয়ে ভাবতে পারতেন। শিক্ষা খাতে তথ্যপ্রযুক্তির প্রয়োগ সম্পর্কে সুস্পষ্ট কিছু থাকলে আমরা অনেক খুশী হতে পারতাম। তিনি কেন যে ডিজিটাল শিক্ষাব্যবস্থাকে এড়িয়ে গেলেন সেটি আমি বুঝিনি। ২০০৯ সালের জানুয়ারী থেকে দেশে নবম শ্রেণী থেকে কম্পিউটার বিষয় বাধ্যতামূলকভাবে পাঠ্য হলে তার জন্য কম্পিউটারের কি ব্যবস্থা হবে বা শিক্ষকের কি ব্যবস্থা হবে সেটি অর্থমন্ত্রীর বলা উচিত ছিলো। ৩০ জুন ২০০৯ বাজেট পাশের আগে তার বিবেচনার জন্য আমি কিছু বিষয়ের প্রতি অর্থমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।
টরাজস্ব প্রস্তাবনা: ট১) মনিটরসহ কম্পিউটার, প্রিন্টার, টোনার ও সকল ধরনের নেটওয়ার্ক সামগ্রীর ওপর থেকে শতকরা ৩ বা ২৫; সকল কর, অতিরিক্ত কর ও এটিভিসহ খুচরা পর্যায়ের ভ্যাট প্রত্যাহার করা হোক। এর ওপর কেবলমাত্র অগ্রিম আয়কর ও পিএসআই রাখা হোক।
২) মোবাইল সেটের ওপর ১০০ ডলার পর্যন্ত শুল্ক শূণ্য শুল্ক করা হোক। এর ওপরের দামের সেটের ওপর সর্বোচ্চ ৩০০ টাকার কর আরোপ করা হোক। টেলিকম যন্ত্রপাতির কর কমানো হোক। দেশে যাতে করে মোবাইল ফোন সংযোজন করা যায় তার জন্য মোবাইলের যন্ত্রাংশ আমদানীর কর কমাতে হবে। একই সাথে মোবাইলের সিম কর সম্পূর্ণ প্রত্যাহার করা হোক বা বর্তমান হার থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে কমানো হোক।
৩) ইন্টারনেট ব্যবহারের ওপর থেকে ভ্যাট সম্পূর্ণ প্রত্যাহার করা হোক। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য বিণামূল্যে ইন্টারনেট দেবার ব্যবস্থা করা হোক।
টউন্নয়ন প্রস্তাবনাঃ ট৪) বাংলা ভাষার উন্নয়ন গবেষণা ও ডিজিটাল যন্ত্রে প্রয়োগের জন্য সুনির্দিষ্ট বরাদ্দ রাখা হোক। বাংলা ভাষায় ডিজিটাল পাঠ্যপুস্তক প্রনয়ন এবং অন্যান্য ডিজিটাল কনটেন্ট তৈরী করার ব্যবস্থা করা উচিত। একই সাথে অর্থ মন্ত্রণালয়সহ সরকারের সকল ওয়েবপেজ/ পোর্টাল বাংলায় করার জন্য সুনির্দিষ্ট বরাদ্দ রাখা হোক।
৫) সাধারণ মানুষ যাতে স্বল্পসুদে (শতকরা ৫ ভাগ) কম্পিউটার কিনতে পারে তার জন্য কমপক্ষে ২০০ কোটি টাকার তহবিল ঘোষণা করা যেতে পারে। বাংলাদেশ ব্যাঙ্ক এই অর্থ বরাদ্দ করতে পারে। বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলো সামান্য সার্ভিস চার্জ নিয়ে এই ঋণ প্রদান করতে পারে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার ল্যাব তৈরি করার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক একটি তহবিল গঠন করতে পারে। এর পরিমাণ ৫০০ কোটি টাকা হতে পারে। এই তহবিল থেকে ঘূর্ণায়মান ঋণ দেয়া হতে পারে। ২৪ কিস্তিতে ঋণ পরিশোধ করে যে কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তাদের কম্পিউটার ল্যাব গড়ে তুলতে পারে। এই ঋণের সুদের হার কোনভাবেই শতকরা পাচ ভাগের বেশি হবেনা।
৬) কম্পিউটার প্রোগ্রামার তৈরির সংখ্যাটি ৪ হাজার নয়, শেখ হাসিনার ঘোষণা অনুযায়ী ১০ হাজার হওয়া উচিৎ। সেজন্য প্রস্তাবিত তিনটি সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়কে আইসিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তর করা হোক। এজন্য শিক্ষানবিশি, প্রশিক্ষণ, সার্টিফিকেশন ছাড়াও প্রোগ্রামারদের জন্য বিশেষ ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।
৭) ইন্টারনেটে পেমেন্ট ও ই-পেমেন্ট গেটওয়ে এখনই চালু করা হোক। আইসিটি এ্যাক্ট ২০০৬ সংশোধন করে সেটি কার্যকর করলেই এটি করা যেতে পারে। এজন্য ২০১২ সাল পর্যন্ত ই-কমার্স-এর জন্য অপেক্ষা করা উচিত নয়।
৮) ডিজিটাল বাংলাদেশের ধারণার সাথে সঙ্গতি রেখে আইন সংস্কারের জন্য আইন সংস্কার কমিশন গঠন করে তার জন্য বিশেষ বরাদ্দ রাখা উচিৎ।
৯) ডিজিটাল সরকার গড়ে তোলার জন্য সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা বাজেটে নেই। ২০১৪ সালে ডিজিটাল সরকার বা ই-গভর্নেন্স ব্যবস্থা প্রচলনের কথা বলেছেন। ২০১৪ সাল পর্যন্ত এজন্য অপেক্ষা করার প্রয়োজন নেই। এজন্য অত্যন্ত স্পষ্ট করে খাত-মন্ত্রণালয়ভিত্তিক প্রকল্প প্রস্তুত করে সুনির্দিষ্ট বরাদ্দ রাখা উচিত। সরকারের কম্পিউটারাইজেশন ও

নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক। ডিজিটাল সরকারের বড় অঙ্গীকার হচ্ছে নাগরিকদেরকে সেবা প্রদান করা। বাজেটে সেই সেবা প্রদানের বিষয়ে কোন দিক নির্দেশনা নেই। এটি স্পষ্ট করতে হবে।

১০) সফটওয়্যার ও সেবা খাতের জন্য প্রণোদনা দিতে হবে এবং দেশের সুবিধাজনক স্থান সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক, তথ্যপ্রযুক্তি পল্লী, হাইটেক পার্ক এসব স্থাপনের জন্য প্রকল্প গ্রহণ করে তার জন্য সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। এই খাতের উন্নয়নে আইসিটি নীতিমালা ২০০৯ অনুসারে উন্নয়ন বাজেটের শতকরা ৫ ভাগ ও রাজস্ব বাজেটের শতকরা ২ ভাগ ব্যয় করা উচিত।

এসব সংশোধন করার সুযোগ থাকার পরও আমাকে একথা বলতেই হবে যে, মুহিত সাহেবের মতো করে ডিজিটাল বাংলাদেশকে এখন পর্যন্ত আর কেউ উপস্থাপন করেনি। এটি পুর্নাঙ্গ না হলেও এতে ডিজিটাল বাংলাদেশের ভিত্তিটা আচ করা যায়। আমি মনে করি, আগামীতে আমরা তার কাছ থেকে আরও স্পষ্ট করে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার অঙ্গীকার পাবো।

বাজেট আলোচনা ও পাশ: আমরা জানি যে এরই মাঝে ৩০ জুন পার হয়েছে এবং বাজেটও পাশ হয়েছে। বাজেট পেশ হবার পর এই বিষয়ক আমার একটি লেখা দৈনিক জনকণ্ঠে দুই কিস্তিতে ছাপা হবার পাশাপাশি দৈনিক ইত্তেফাকের অর্থনীতির পাতায় ২৯ জুন ২০০৯ সংক্ষিপ্ত আকারে ছাপা হয়। আমার নিজের কাছে মনে হয়েছে ডিজিটাল বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে আমার সেই লেখাটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিলো। তবে লেখাটির গুরুত্ব আরেকটু বেশি এজন্য যে, এটি নিয়ে ঢাকার ধানসিড়ি কমিউনিকেশন নামক একটি প্রতিষ্ঠান গত ২৬ জুন ২০০৯ ঢাকার সোনারগাও হোটেলের ব্যালকনি নামক রুমে একটি জাতীয় গোলটেবিল বৈঠকের আয়োজন করে। মূল প্রবন্ধ আকারে উপস্থাপিত এই লেখাটি পাঠ ও আমার উপস্থাপনা শোনার পর এর ওপরে আলোচনা করেন অর্থমন্ত্রী ডঃ আবুল মাল আব্দুল মুহিত, অর্থনীতি সমিতির সভাপতি ডঃ কাজী খালিকুজ্জামান, অর্থনীতিবিদ ডঃ দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য, সাবেক উপদেষ্টা ডঃ আকবর আলী খান, সাবেক উপদেষ্টা মীর্জা আজিজুল ইসলাম ও সাবেক উপদেষ্টা ডঃ রাশেদা কে চৌধুরী প্রমুখ। শুরুতেই তাদেরকে ধন্যবাদ যে, তারা সকলেই ডিজিটাল বাংলাদেশ ধারণাটিকে গ্রহণ করেছেন এবং এর বাস্তবায়নের প্রতি গুরুত্ব দিয়েছেন। ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত থাকার সুবাদে আমি তাদেরকে অভিনন্দন জানাই।

ডঃ দেবপ্রিয় যেভাবে আলোচনা করেন তার সাথে মার্চ মাসে বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতি আয়োজিত সেমিনারে অনন্য রায়হানের প্রস্তাবনার মিল আছে। অনন্যর মতোই তিনি মনে করেন, ডিজিটাল বাংলাদেশের অগ্রাধিকার চারটি। তার মতে, প্রথমটি হলো ডিজিটাল সরকার, দ্বিতীয়টি ডিজিটাল ব্যবসা, তৃতীয়টি ডিজিটাল শিক্ষা এবং চতুর্থটি ডিজিটাল নাগরিক। তিনি অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বলেন যে, পুজির উৎপাদনশীলতা বাড়াতে ডিজিটাল পদ্ধতির দরকার। তিনি এটি বলেন যে, বাস্তবে বাংলাদেশ ডিজিটাল যুগেই আছে। তিনি দৃষ্টান্ত দিয়ে বলেন, গ্রামের একটি মহিলাকে যখন আমি মোবাইলে কথা বলতে দেখি তখন আমি ডিজিটাল বাংলাদেশ দেখি।

শুধু দেবপ্রিয়র কথাই কেন, বলা বস্তুত সেদিনের সেমিনারে অত্যন্ত চমৎকারভাবে ডিজিটাল বাংলাদেশ নিয়ে কথা বলেন প্রায় সকলেই। অর্থনীতি সমিতির সভাপতি ডঃ কাজী খালিকুজ্জামান, যিনি শিক্ষা কমিটির কো চেয়ারম্যান, তিনি বলেন যে, ৪৯ ভাগ শিক্ষার হারকে শতকরা একশো ভাগে নিয়ে যাওয়াটা একটি বিরাট চ্যালেঞ্জ। তিনি জানান যে, কমিটি অচিরেই প্রাথমিক শিক্ষাকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত উন্নীত করবে এবং মাধ্যমিক শিক্ষাকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত নিয়ে যাবে। তিনি বাধ্যতামূলক কম্পিউটার শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথাও বলেন। তিনি বলেন নবম-দশম ও একাদশ দ্বাদশ শ্রেণীতে কম্পিউটার বাধ্যতামূলক করার জন্য যেমন করে ২০১৩ সাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবেনা তেমনি প্রাথমিক স্কুলের জন্যও ২০২১ সাল পর্যন্ত অপেক্ষা করার দরকার নেই। এ প্রসঙ্গে তিনি ডিজিটাল ডিভাইডের প্রতিও সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি জানান যে তার কমিটি প্রতি উপজেলায় ডিজিটাল পাঠাগার গড়ে তোলার ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সুপারিশ করবে। সাবেক উপদেষ্টা ডঃ আকবর আলী খান ডিজিটাল বাংলাদেশ রূপকল্প তুলে ধরার জন্য আমাকে ধন্যবাদ জানান এবং ডিজিটাল ডিভাইড বিষয়ে সতর্ক থাকার আহ্বান জানান। ডঃ আকবর আলী খান একটি গুরুত্বপূর্ন বিষয়ের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি বলেন যে, ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার প্রতিপক্ষ সরকারের ভেতরেই আছে। তিনি ডিজিটাল সরকার প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে আমলাদের অনীহা ও প্রতিরোধের কথা বলেন। তিনি কম্পিউটার বিষয়ক শিক্ষক প্রশিক্ষণকে বেসরকারী খাতের হাতে ছেড়ে দেবার অনুরোধ করেন। একইসাথে তিনি এসবের মনিটরিং করার ব্যবস্থা করারও অনুরোধ করেন।

সাবেক উপদেষ্টা রাশেদা কে চৌধুরী কপিরাইট আইন বলবৎ করার আহ্বান জানান এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের সহায়তায় পাঠ্যপুস্তকের সফটওয়্যার তৈরী করার উদ্যোগের ভূয়সী প্রশংসা করেন। মীর্জা আজিজুল ইসলাম ডিজিটাল ডিভাইড নিয়ে তার আশঙ্কার কথা উল্লেখ করেন।

এসব আলোচনার পর অর্থমন্ত্রী জানান যে, তিনি এসব বিষয়ে মনযোগ দিয়েছেন এবং যেখানে সংশোধন দরকার সেখানে সংশোধন করবেন। তিনি বলেন যে, বাজেট বরাদ্দ বড় কথা নয়, এখন বাজেট বাস্তবায়ন করা বড় বিষয় হয়ে ওঠেছে।

এই সেমিনারটি অনুষ্ঠিত হবার মাত্র তিনদিন পর ২৯ জুন ২০০৯ রাতে অর্থমন্ত্রী সংসদে বাজেটের সমাপনী বক্তৃতা প্রদান করেন। সেই বক্তৃতার মাধ্যমে তিনি কম্পিউটারের ওপর আরোপিত শতকরা তিন ভাগ অগ্রিম আয়কর প্রত্যাহার করেন এবং ল্যাপটপের জন্য এক লাখ ও ডেস্কটপের জন্য ৫০ হাজার টাকার আয়কর রেয়াত ঘোষণা করেন। একই সাথে তিনি মোবাইলের জন্য সাকুল্যে ১২ শতাংশ করারোপ করেন। মোবাইল সেটের ওপর অন্য সকল কর ও ভ্যাট প্রত্যাহার করা হয়। তিনি মোবাইলের সিম কর তিনি কমাননি বা প্রত্যাহার করেননি। শুধু তাই নয়ং তার এই ঘোষণার আমাদের প্রত্যাশার অনেক কিছুই থাকেনি। যদিও কম্পিউটার আমদানীকে অগ্রিম আয়কর থেকে রেহাই দেয়া হয়েছে-তথাপি আমরা আসলে সেটি চাইনি। আমরা অগ্রিম আয়কর থাকুক কিন্তু আমদানী কর প্রত্যাহার করা হোক এটিই চেয়েছিলাম। অন্যদিকে ইন্টারনেটের সাধারণ ব্যবহারের ওপর থেকে তিনি ভ্যাট প্রত্যাহার করেননি। রাজস্ব বিষয়ে তার কাছে এর বেশি কোন দাবী আমাদের ছিলোনা।

তার এই ভাষণের পর মোবাইল অপারেটরদের কোন প্রতিক্রিয়া (তীব্র প্রতিবাদ) আমরা শুনতে পাইনি। তবে তাদের কাজের মধ্যে দেখতে পেলাম যে, বাজেট পাশ হবার পর ১৯৯ টাকায় একটি সিম বিক্রি করে তারা ২৫০ টাকার টকটাইম ফ্রি দিচ্ছে। এর অর্থ হলো, মোবাইল অপারেটররা আবার সিমকরে ভতুর্কি দেয়া শুরু করেছে। একটি-দুটি করে সকল মোবাইল অপারেটরই এই ভর্তুকি দেবেন বলে আশা করা যায়। এর ফলে ১৯৯ টাকায় সিম কিনে ২৫০ টাকার টকটাইম ফ্রি পাওয়া গেলে মোবাইলের প্রবৃদ্ধি এবং সিম কর নিয়ে যে বিতর্ক ছিলো সেটির অবসান হবে। এর অর্থ দাড়াবে, মোবাইল অপারেটরগণ আসলে সরকারকে কর দেয়া থেকে বাচার জন্য সিম কর প্রত্যাহারের কথা বলে আসছিলেন-মোবাইলের প্রবৃদ্ধি অব্যাহত রাখার জন্য তাদের হাতে যে এখনও আরও বেশ কিছু জায়গা আছে সেটি আমরা উপলব্ধি করতে সক্ষম হলাম।

আমি নিজে মনে করি, অর্থমন্ত্রী তার বিশাল বাজেটে আয়ের একটি নিশ্চিত উৎস্য-সিমকরকে নষ্ট করতে চাননি। ফলে তিনি সিম কর প্রত্যাহারের ব্যাপারে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেননি। আমরা একটি প্রান্তিক গেলেই দেখতে পাবো যে, এর ফলে সরকারের প্রকৃত লাভের পরিমাণ আছে, নাকি এর ফলে বরং সরকারের রাজস্ব কমে গেছে।

যাহোক অর্থমন্ত্রী আমাদের উন্নয়ন প্রস্তাবনাগুলো নিয়ে কোন কথা বলেননি। এমন হতে পারে যে, সমাপনী ভাষণে তিনি বাজেট বরাদ্দ বা উন্নয়ন বরাদ্দ নিয়ে কথা বলতে চাননি। এমনও হতে পারে যে, বাজেটের সমাপনী ভাষণে এসব বিষয়ে সুনির্দিষ্ট আলোকপাত না করলেও উন্নয়ন খাতে কাজ করার সুযোগ তিনি প্রতিদিনই পাবেন বলে এসব বিষয়ে কথা বলেননি।

যদি আমরা খাতওয়ারী বরাদ্দের বিষয়টি চুলচেরা বিশ্লেষণ করতে চাই তবে অর্থমন্ত্রী ডিজিটাল সরকার, ডিজিটাল শিক্ষা বা ডিজিটাল বাণিজ্য খাতে কোন মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে কতো টাকা বরাদ্দ দিয়েছেন সেটি খোজে বের করা কঠিন হবে। তবে বাজেট বক্তব্যে তিনি যে বিষয়গুলোকে উল্লেখ করেছেন বাজেটে যদি সেইসব বাস্তবায়নের ব্যাপারে যথাযথ বরাদ্দ প্রদান করে থাকেন তবে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার প্রাথমিক কাজটি নিশ্চয়ই এই অর্থ বছরেই শুরু হবে। তবুও আমি মনে করি আমাদের প্রস্তাবিত বিসয়গুলোকে এড়িয়ে গিয়ে তিনি আর যাই করুন ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়তে পারবেন না। আমাদের প্রস্তাবিত বিষয়গুলো হলো:

ক) বাংলা ভাষার উন্নয়ন গবেষণা ও ডিজিটাল যন্ত্রে প্রয়োগের জন্য সুনির্দিষ্ট কাজ করা ও বাংলা ভাষায় ডিজিটাল পাঠ্যপুস্তক প্রনয়ন এবং অন্যান্য ডিজিটাল কনটেন্ট তৈরী করার ব্যবস্থা করা। মোবাইলে বাংলা চালু করা, বাংলার এনকোডিং ও কীবোর্ড প্রমিতকরণ বিষয়ে সংকট দূর করা ও এর গবেষণার জন্য যথাযথ পদেক্ষেপ নেওয়া একটি জরুরী বিষয়। এই কাজগুলোর পাশাপাশি যেভাবেই হোক আগামী ডিসেম্বরের মাঝে সরকারের সকল ওয়েবপেজ/ পোর্টাল বাংলায় করার জন্য সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ নিতে হবে।

খ) বাজেটের বাইরে অর্থমন্ত্রী শুধুমাত্র বাংলাদেশ ব্যাঙ্ককে কাজে লাগিয়ে সাধারণ মানুষ, পেশাজীবি ও ছাত্রছাত্রীদের কম্পিউটার কেনার সহায়ক পদক্ষেপ নিতে পারেন। আমরা প্রস্তাব করেছি, সাধারণ মানুষ যাতে স্বল্পসুদে (শতকরা ৫ ভাগ) কম্পিউটার কিনতে পারে তার জন্য কমপক্ষে ২০০ কোটি টাকার তহবিল ঘোষণা করা যেতে পারে। বাংলাদেশ ব্যাঙ্ক এই অর্থ বরাদ্দ করতে পারে। বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলো সামান্য সার্ভিস চার্জ নিয়ে (সর্বোচ্চ শতকরা ৫

ভাগ) এই ঋণ প্রদান করতে পারে। সৌরবিদ্যুৎ বিষয়ে অর্থমন্ত্রী এমন একটি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার ল্যাব তৈরি করার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক একটি তহবিল গঠন করতে পারে। এর পরিমাণ ৫০০ কোটি টাকা হতে পারে। এই তহবিল থেকে ঘূর্ণায়মান ঋণ দেয়া হতে পারে। ২৪ কিস্তিতে ঋণ পরিশোধ করে যে কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তাদের কম্পিউটার ল্যাব গড়ে তুলতে পারে। এই ঋণেরও সুদের হার কোনভাবেই শতকরা পাচ ভাগের বেশি হবেনা। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ থেকে মাসে ৫০ টাকা করে আদায় করে এই ঋণ শোধ করতে পারে।

গ) আমি মনে করি অর্থমন্ত্রী বাজেটে প্রস্তাবিত তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়কে আইসিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করে আমাদের মানবসম্পদ উন্নয়নের ক্ষেত্রে একটি যুগান্তকারী ভূমিকা পালন করতে পারেন।

ঘ) ইন্টারনেটে পেমেন্ট ও ই-পেমেন্ট গেটওয়ে এখনই চালু করতে অর্থমন্ত্রী কোথায় বাধা পাচ্ছেন সেটি আমি জানিনা। আমি মনে করি, তিনি এখনই ডিজিটাল কমার্স চালু করতে পারেন এবং এজন্য কেবল নির্বাহী আদেশ প্রয়োজন।

ঙ) বাজেট বরাদ্দের কথা বিবেচনায় না এনেই তিনি ডিজিটাল বাংলাদেশের ধারণার সাথে সঙ্গতি রেখে আইন সংস্কারের জন্য আইন সংস্কার কমিশন গঠন করে তাকে কার্যকর করতে পারেন।

চ) এছাড়াও ডিজিটাল সরকার গড়ে তোলার জন্য সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা তিনি এখন পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে পারেন। প্রতিটি মন্ত্রণালয়কে এখন বলা যেতে পারে তোমরা ডিজিটাল সরকার গড়ে তোল এবং এজন্য প্রকল্প প্রণয়ন কর-টাকা যা লাগে সেটি আমি দেবো।

ছ) তিনি এখন সফটওয়্যার ও সেবা খাতকে সহায়তা দিতে পারেন এবং সরকারের যেসব কাজ এ বছর করার আছে সেইসব কাজ যাতে দেশীয় কোম্পানীগুলো যাতে করতে পারে তার সুযোগ দিতে পারেন।

জ) সম্ভবত একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হবে অর্থমন্ত্রীর বরাদ্দকৃত ১০০ কোটি টাকার থোক বরাদ্দ কিভাবে কোন মন্ত্রণালয় কোন খাতে বা কোন প্রকল্পে ব্যয় করবে সেটি নির্ধারণ করা। বাজেটের আগেই আমরা বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে টাকা খরচের দায়িত্ব নেবার ক্ষেত্রে অনীহা দেখে আসছি। তারা তেমন কোন প্রকল্পও গ্রহণ করেনি। ফলে পুরো একশো কোটি টাকা কিভাবে ব্যয় করা হবে সেটি একটি আলোচ্য বিষয় হয়ে আছে।

সবচেয়ে প্রয়োজনীয় কথাটি অর্থমন্ত্রী নিজেই বলেছেন, বাজেটের বরাদ্দটি বড় কথা নয়, বড় কথা হলো বাজেট বাস্তবায়ন করা। আমিও মনে করি, বাজেট বাস্তবায়ন করা হলেই আমরা কোন না কোনভাবে সামনে যাবো।

আমি মনে করিনা এসব বিষয় তিনি বাজেটে উল্লেখ করেন নাই বলে আর কোনভাবে সেই শূণ্যস্থানটি পূরণ করা যাবেনা। বরং ২০০৯-১০ অর্থ বছরের কাজ দিয়ে এর পরের বছরের বাজেটে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তোলার ভিত্তি নির্মাণ করা যেতে পারে। আমি কামনা করবো যে, সরকার সেদিকে মনযোগী হবে।

ডিজিটাল বাংলাদেশ ধারনাটি ২০০৮ সালের ডিসেম্বর থেকে প্রকাশ্যে ব্যাপকভাবে আলোচিত হওয়া শুরু হবার পর নানা সময়ে নানা জন বিভিন্ন মতামত দিচ্ছেন। এর মাঝে এক ধরনের স্বতস্ফূর্ততা আছে। সরকারের রাজনৈতিক অংশ যা মন্ত্রী, সাংসদ বা দলীয় নেতা-কর্মীদের নিয়ে গঠিত সেটির মাঝেও ডিজিটাল বাংলাদেশ এখন সর্বাধিক আলোচিত বিষয়। সেদিন একজন মন্ত্রী জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলার সাথে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ডিজিটাল বাংলাদেশের স্বপ্নের তুলনা করলেন। এর অর্থ দাড়াচ্ছে যে, ডিজিটাল বাংলাদেশ একটি বড় মাপের স্বপ্ন। বস্তুত বিষয়টি এমন বড় মাপের যে, একে পুরো জাতির একটি আকাঙ্ক্ষায় পরিণত হয়েছে। এতে এটিও প্রমাণিত হয় যে, বিষয়টি এখন সরকারের সকল স্তরের মানুষের কাছেই দারুনভাবে গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠেছে। কদিন আগে একজন বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ এটি প্রমাণ করার চেষ্টা করলেন যে, ডিজিটাল বাংলাদেশ যে আওয়ামী লীগের ইশতেহারে প্রবেশ করেছে তার সাথে তিনিও যুক্ত ছিলেন। ঘটনাটি সত্য না হলেও তার প্রচেষ্টা থেকে ডিজিটাল বাংলাদেশ ধারণার গ্রহণযোগ্যতা প্রমাণিত হয়েছে। জাতীয় পর্যায়ের এই ধারনাটি সফল হবার পেছনে এটি একটি বড় বিষয় হিসেবে কাজ করছে যে, সকলেই এই ধারণার সাথে কিছু না কিছু ইনপুট দিচ্ছেন। এটি সাধারণ মানুষের জেগে ওঠার লক্ষণ। হতে পারে, একেকজন একে একেকভাবে দেখছেন-কিন্তু তার যে এই বিষয়ে একটি মতামত বা মন্তব্য আছে- এটি মোটেই কম কথা নয়। কেউ কেউ মনে করেন, বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় পুরো দেশের মানুষ এমনভাবে একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে তাদেরকে সংযুক্ত করেছিলো। এরপর অনেক রাজনীতিক বা দল অনেক কর্মসূচী দিয়েছেন। কারও উনিশ দফা, কারও একুশ দফা বা কারও খাল খনন কর্মসূচী, কারও গরু-ছাগল পালন কর্মসূচী, কারও একটি বাড়ী একটি খামার ইত্যাদি কর্মসূচী প্রকাশিত হয়েছে। সাধারণ মানুষ দূর থেকে এসব কর্মসূচী বা বক্তব্য কান পেতে হয়তো শুনেছেন। কিন্তু সেইসব কর্মসূচী নিয়ে তারা নিজেরা

কিছু ভাবেননি। অন্যদিকে বিগত নির্বাচনের সময় যে অবস্থাটি ছিলো সেটি হচ্ছে-ডিজিটাল বাংলাদেশ পণ্ডিত ব্যক্তিদের কাছে তেমন কোন গ্রহণযোগ্যতা পায়নি। এটি প্রধানত নতুন প্রজন্মের মানুষ, যারা কম্পিউটার চর্চা করে বা যারা জীবনের নতুন সীমানার কথা ভাবে তাদের কাছে ডিজিটাল বাংলাদেশ একটি বড় সম্ভাবনা হিসেবে পরিগণিত হয়। তবে এটি একেবারেই ভিন্ন প্রেক্ষিত তৈরী হয় তখন যখন আওয়ামী লীগ নির্বাচনে জয়ী হবার পর সরকার গঠন করে। এখন কার্যত পণ্ডিত ব্যক্তিরাও ডিজিটাল বাংলাদেশের কথা সগর্বে বলে থাকেন।

আমরনা লক্ষ্য করেছি যে, সাধারণ আলোচনায় কথা বলার পাশাপাশি কেউ কেউ লিখিত নিবন্ধও পেশ করেছেন। গত মার্চ মাস (২০০৯) থেকে ৫ই জুলাই ২০০৯ পর্যন্ত আমি যেসব আলোচনা শুনেছি তার মধ্য থেকে তিনটি নিবন্ধকে গুরুত্ব দেয়া যেতে পারে। নিবন্ধ তিনটি হলো-

ক) অনন্য রায়হানের ICT For Development: Immediate doable.

খ) অধ্যাপক ডঃ মুহম্মদ আলমগীরের ডিজিটাল বাংলাদেশ: আমাদের করণীয়।

গ) ডঃ মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম মীর এর ভিশন ২০২১: ডিজিটাল বাংলাদেশ এবং কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা।

নিবন্ধ তিনটি উপস্থাপনা হয় ২০০৯ সালের মার্চ থেকে জুন মাসের মধ্যে। ডঃ অনন্য রায়হান গত ২৯ মার্চ ২০০৯ সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগের সম্মেলনে উপস্থাপন করেন। এটি সিপিডির সম্মেলন-পরবর্তী প্রকাশনা হিসেবে একটি বইতেও যুক্ত হয়েছে। জুলাই ২০০৯-এ বইটি আমার হাতে আসে। ডঃ মুহাম্মদ আলমগীর তার নিবন্ধটি পেশ করেন গত ২২ শে জুন ২০০৯ খুলনায়। খুলনার জিয়া হলে খুলনা বিভাগীয় কমিশনার আয়োজিত সেমিনারে তিনি এটি উপস্থাপন করেন। ডঃ মীর গত ২৪ শে জুন ২০০৯ বাংলাদেশ পলিটেকনিক শিক্ষক সমিতি আয়োজিত সেমিনারে তার নিবন্ধটি পাঠ করেন। আমরা আমাদের আলোচনায় নিবন্ধগুলো থেকে প্রাপ্ত অনন্য বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করবো।

অনন্য রায়হান: ডিনেট-এর নির্বাহী পরিচালক এবং বাংলাদেশ টেলিসেন্টার নেটওয়ার্ক-এর মহাসচিব ডঃ অনন্য রায়হান ২৯ মার্চ ২০০৯ বাংলাদেশ চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে আয়োজিত সিপিডির আলোচনায় তথ্যপ্রযুক্তিতে দেশে বিরাজমান অবস্থা সম্পর্কে আলোকপাত করেন। তিনি তার নিবন্ধে (ইংরেজীতে লেখা) অনুচ্ছেদে Conceptualizing Digital BangladeshÕ এ লিখেন, The coining of the term Digital Bangladesh belongs to Mustafa Jabbar, who wrote an article on 'Towards Digital Bangladesh' in the BCSICTWORCD published in November 2008......... He defined Digital Bangladesh as Digital Government, Digital Education and Digital fascines.

অনন্য রায়হান এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করেন যে, ডিজিটাল সরকার যেহেতু তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে জনগণকে সেবা প্রদানকে কভার করে না সেজন্য ডিজিটাল বাংলাদেশের অংশ হিসেবে ডিজিটাল নাগরিক যুক্ত করা উচিৎ। প্রসঙ্গত তিনি ডিজিটাল সরকার, শিক্ষা, ব্যবসা ও নাগরিক কি তাও উল্লেখ করেন। আমি তার নিবন্ধ পাঠ করে দেখেছি যে, তিনি বস্তুত নতুন কিছুই যুক্ত করেননি। বরং আমার ধারনাটিকেই তিনি তার নিবন্ধে বিবৃত করেন। তবে তিনি তার নিবন্ধে এই মুহূর্তের করণীয় কি সেটিও উল্লেখ করেন। তার রচনা অনুসারে যেসব করণীয় আছে সেগুলো হলো:

ক) মহাপরিকল্পনা: ডিজিটাল বাংলাদেশ ধারনার বাস্তবায়নের জন্য সরকার ২০১০-২১ সময়কালের জন্য একটি মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন করতে পারে। এজন্য তিনি ২০০৮ সালে প্রস্তাবিত ও ২০০৯ সালে মন্ত্রীসভায় অনুমোদিত তথ্য প্রযুক্তি নীতিমালাকে ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করেন। তিনি বিস্তারিত বিবরণসহ একটি পাঠশালা পরিকল্পনা প্রণয়নেরও প্রস্তাব করেন।

খ) ডিজিটাল বাংলাদেশ সচিবালয়: ডঃ অনন্য রায়হান প্রধানমন্ত্রীর অধীনে একটি ডিজিটাল বাংলাদেশ সচিবালয় প্রতিষ্ঠা করার প্রস্তাব করেন। তিনি এর চারটি বিভাগ প্রস্তাব করেন। প্রসঙ্গত তিনি বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল বিলুপ্ত করার পক্ষে মত প্রকাশ করেন।

গ) আইসিটি অবকাঠামোর জন্য সিঙ্গেল পয়েন্ট স্থাপিত হওয়া উচিৎ বলে অনন্য রায়হান মনে করেন। এই প্রসঙ্গে তিনি প্রথমত টেলিকম, তথ্য মন্ত্রণালয়, বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়কে পুনর্বিন্যস্ত করে একটি শক্তিশালী আইসিটি মন্ত্রণালয় স্থাপনের প্রস্তাব করেন। এজন্য তিনি বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের বিজ্ঞান অংশটি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সম্প্রচার অংশটিকে আইসিটি মন্ত্রণালয়ে যুক্ত করার প্রস্তাব করেন। একই সাথে তিনি বিটিআরসিকে আইসিটি মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ করার প্রস্তাব করেন।

ঘ) ই-গর্ভনেন্সের জন্য সিঙ্গেল পয়েন্ট: অনন্য রায়হান ডিজিটাল বাংলাদেশ সচিবালয়ের চারটির একটি বিভাগ হিসেবে ই-গভর্নমেন্ট ফোকাল পয়েন্ট প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করেন। তিনি পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের এসআইসিটি বিলুপ্ত করার প্রস্তাব করেন।

ঙ) অনন্য রায়হান তার নিবন্ধে প্রধানমন্ত্রীর অফিসে ই-সিটিজেন সেল প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করেন।

চ) তিনি ই-এডুকেশনের জন্য একটি পয়েন্ট স্থাপনের প্রস্তাব করেন।

অনন্য রায়হান তার এই আলোচনায় যেসব সুপারিশ করেছেন তার মূল বিষয়বস্তু হচ্ছে ডিজিটাল সরকার প্রতিষ্ঠা ও ডিজিটাল শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলনের জন্য সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর সমন্বয় সাধন করা। তিনি আলাদাভাবে ই-সিটিজেনের কথাও বলেছেন। খুব সঙ্গতকারণেই তিনি ডিজিটাল বাণিজ্য বিষয়ে কোন প্রস্তাব পেশ করেননি। পরবর্তী অনুচ্ছেদে ডঃ অনন্য রায়হান ই-সিটিজেন বিষয়ে কতগুলো করণীয় সুপারিশ করেন। এসব প্রস্তাবগুলো হলো;

ক) জাতীয় পরিচয়পত্র ডাটাবেজ তৈরী করা খ) করের আওতা বাড়ানো গ) টেলিসেন্টার নেটওয়ার্ক স্থাপন ঘ) দেশব্যাপী ইন্টারনেট সংযোগ দান ঙ) ডিজিটাল কনটেন্ট প্রস্তুত চ) বাজারদরের তথ্য প্রদান ছ) ভূমি ব্যবস্থাপনা ডিজিটাল করা ইত্যাদি।

এসব প্রকল্পকে তিনি প্রথম টাস্ক বলে উল্লেখ করেন। দ্বিতীয় টাস্ক হিসেবে তিনি ই-বিজনেসের বিষয়গুলোর কথা বলেন। এই প্রসঙ্গে তিনি আইসিটি এ্যাক্ট ২০০৬ বাস্তবায়ন (আইনটি এখন আইসিটি এ্যাক্ট ২০০৯ হয়ে গেছে। নবম জাতীয় সংসদের বাজেট অধিবেশনে এটি সংশোধিত হয়েছে) ও ই-পেমেন্টের ব্যবস্থা করার প্রস্তাব করেন। ডিজিটাল সরকার প্রতিষ্ঠায় তিনি অনলাইন প্রকিউরমেন্ট ও ই-টেন্ডার ইত্যাদি চালু করার প্রস্তাব করেন। এটি তার পক্ষ থেকে সরকারের তৃতীয় টাস্ক হিসেবে প্রস্তাবিত।

অনন্য রায়হান তার চতুর্থ টাস্ক প্রস্তাবনায় ডিজিটাল শিক্ষার কথা বলেছেন। তার প্রস্তাবে তিনি বলেন, E-learning as an intermediate solution to quality education: Quality of education is now prime concern for the future of the country. The vision 2021 will remain in paper if quality of education is not addressed."

জনাব অনন্য রায়হান অবশ্য মনে করেন যে, শিক্ষার মূল সংকটের সাথে আইসিটির কোন সম্পর্ক নেই। তিনি বরং এটি মনে করেন যে, আইসিটি একটি অন্তবর্তীকালীন সমাধান হতে পার। তিনি শিক্ষার মুল সমস্যার মাঝে শুণগত মানসম্পন্ন শিক্ষকের অভাব, শিক্ষকদের দক্ষতা বৃদ্ধি, দারিদ্র ও অপুষ্টি দূর করা, অনাকর্ষণীয় শিক্ষাদান পদ্ধতি এবং শিক্ষার যথাযথ অবকাঠামো না থাকাকে চিহ্নিত করেন।

তিনি প্রস্তাব করেন যে, পাঠ্যপুস্তককে ডিজিটাল কনটেন্টে পরিণত করতে হবে। এনসিটিবি তাদের প্রণীত বইকে ডিজিটাল ফরমাটে রুপান্তর করে এমনকি ইন্টারনেটে দিতে পারে বলেও তিনি প্রস্তাব করেন। অনন্য রায়হান তার সর্বশেষ প্রস্তাবে প্রতিটি উপজেলায় একটি করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে (স্কুলকে) আদর্শ তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে বাছাই করার ও সেখানে কম্পিউটার শিক্ষাদানের সকল উপকরণ প্রদানের প্রস্তাব করেন।

সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ-এর সভায় উত্থাপিত এসব প্রস্তাবনা এরই মাঝে বই আকারে প্রকাশিত হয়ে নীতি নির্ধারকদের কাছে পৌছেছে। সরকারের একটি ধারণা থাকে যে, সিপিডি বাস্তবানুগ প্রস্তাব পেশ করে থাকে। এজন্য অনন্য রায়হানের প্রস্তাবগুলো গুরুত্ব পেতে পারে। সরকার এসব প্রকল্প বাস্তবায়নের কথাও ভাবতে পারে। এরই মাঝে বেশ কিছু পদক্ষেপ বাস্তবায়নের পথেও আছে। কোন কোন খাতে এবারের বাজেটে বরাদ্দও থাকতে পারে। এর বাইরেও প্রকল্প বাস্তবায়িত হতে পারে। বাজেট বরাদ্দে অন্তত ১০০ কোটি টাকার থোক বরাদ্দ রয়েছে। সরকার অনন্য রায়হানের কোন কোন প্রকল্প থোক বরাদ্দ থেকে বাস্তবায়ন করতে পারেন।

আইসিটি টাস্কফোর্স ও ডিজিটাল বাংলাদেশ: একেবারে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে ১৮ আগস্ট ২০০৯ প্রধানমন্ত্রীর মুখ্যসচিবের সভাপতিত্বে জাতীয় আইসিটি টাস্কফোর্সের নির্বাহী কমিটির সভার নোটিশ আমার হাতে পড়ে। এমনকি ১৯ আগস্ট ২০০৯ সেই সভাটি অনুষ্ঠিতও হয়। এর আগে আমি ২০০৮ সালে টাস্কফোর্সের সভা এবং টাস্কফোর্সের নির্বাহী পরিষদের দুটি সভায় উপস্থিত ছিলাম। তখন তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতায় ছিলো। আমি তৎকালীন মুখ্যসচিব এবং প্রধান উপদেষ্টা উভয়কেই আইসিটি বিষয়ে অত্যন্ত সিরিয়াস দেখতে পেয়েছি। কিন্তু এবার নির্বাহী পরিষদের সভায় সভাপতিত্বকারী মুখ্যসচিব করিম সাহেব মহোদয় যেন অতীতের সকল অবস্থাকে ছাপিয়ে গেলেন। বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতি, এম-চেম্ব ও ঢাকা চেম্বারের সাবেক সভাপতি জনাব আফতাবুল ইসলাম, যিনি সেদিন এফবিসিসিআইকে প্রতিনিধিত্ব করতে এসেছিলেন, তিনি সেকথা সরাসরি বলেই ফেললেন। তার মতে, এর আগে তিনি আরও পাচটি এমন সভায় উপস্থিত ছিলেন-কিন্তু তার মতে, আর কেউ এমন চমৎকারভাবে আইসিটিকে গুরুত্ব দেয়নি। বলা যেতে পারে, আফতাব সাহেব সত্যভাষণই প্রদান করেছিলেন। আমি খুবই অবাক হয়েছিলাম, যখন দেখছিলাম আমার জন্য পতাকা যুক্ত করে একটি চমৎকার ফাইল দেয়া হয়েছে যাতে সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র সহ সভার কার্যপত্র দেয়া হয়েছে। তথ্যপ্রযুক্তি নীতিমালা ২০০৯ ছাড়াও এই টাস্কফোর্স গঠনের ইতিহাস, লক্ষ্য এবং সভার

বিবেচ্য বিষয়গুলো বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের সচিবের পক্ষ থেকে অত্যন্ত চমৎকার ভাবে উপস্থাপন করা হয়েছিলো সেই ফাইলে। আমি অবাক হয়েছিলাম, যখন দেখলাম যে, আইসিটি পলিসির ৩০৬টি কর্মপরিকল্পনার কোনটি কার এবং কতোটা কোন মন্ত্রণালয়ের তার বিবরণও মন্ত্রণালয়ভিত্তিক বিন্যস্ত করা হয়েছে। এমওএসআইসিটি সচিব মহোদয় জানালেন যে, তিনি এই বিষয়গুলো আরও বিস্তারিত করে প্রতিটি মন্ত্রণালয়ের জন্য আলাদাভাবে একটি একটি করে বই বানিয়ে তাদের কাছে পাঠাবেন।

তবে সেই সভার সবচাইতে গুরুত্বপুর্ণ দিক ছিলো যে, মুখ্যসচিব মহোদয় প্রতিটি মন্ত্রণালয়ের করণীয়, বিদ্যমান অবস্থা এবং কি কি পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে সেই সম্পর্কে সংশ্লিষ্টদের কাছে জবাবদিহিতা চাইছিলেন। তিনি তাৎক্ষণিকভাবে কিছু সিদ্ধান্তও গ্রহণ করেন। এর মাঝে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণটি ছিলো বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়কে ডিজিটাল বাংলাদেশ বিষয়টি অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বর্ণনা করার জন্য অনুরোধ করা। আমি যখন বললাম যে, আইসিটি পলিসিই ডিজিটাল বাংলাদেশ এই কথাটি সত্য নয় এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ ধারণাটি বা তার ক্যানভাস এই নীতিমালার চাইতে অনেক বড় তখন আমাকে ডাক ও তার মন্ত্রণালয়ের সচিবও সমর্থন করেন। সেই সময়ে মুখ্যসচিবও আমাদেরকে সমর্থন করেন এবং তিনি মন্তব্য করেন, এমওএসআইসিটিকেই বলতে হবে যে, আইসিটি পলিসিই ডিজিটাল বাংলাদেশ কিনা। তিনি এজন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও বেসরকারী খাতের মতামত গ্রহণেরও সিদ্ধান্ত প্রদান করেন।

আমি মনে করি, প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বাধীন জাতীয় আইসিটি টাস্কফোর্স ও তার নির্বাহী পরিষদ এমন যে ভূমিকা পালন করছে তার সাথে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণভাবে ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার সম্পর্ক রয়েছে। বিষয়টিকে আজকের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাই এখন থেকে আট বছর আগে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মনে করেছিলেন। কার্যত এখনকার বাংলাদেশে জাতীয় আইসিটি টাস্কফোর্স তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতের সর্বোচ্চ সংস্থা। এর সভাপতি হলেন সরকার প্রধান। ২০০১ সালের ৪ঠা জানুয়ারী জননেত্রী শেখ হাসিনা নিজে উদ্যোগী হয়ে এই টাস্কফোর্স গঠন করেন। সেই সময়ে এই টাস্কফোর্স গঠন করার লক্ষ্য হিসেবে বলা হয়েছিলো, "তথ্য প্রযুক্তি সম্প্রসারণ উন্নয়ন ও বিকাশের রূপরেখা প্রনয়নসহ বাংলাদেমের অর্থনৈতিক, সামাজিক, বাণিজ্যিক ও বৈজ্ঞানিক পরিমণ্ডলে তত্র প্রযুক্তির অবদতানের সম্ভাবনাকে চিহ্নিতকরণ ও দেশে তথ্যপ্রযুক্তির প্রয়োগ ও সম্প্রসারণ বৃদ্ধি করা।" (১৯ আগস্ট ২০০৯-এর কার্যপত্র)। এরপর ২১ মার্চ ২০০২ বেগম খালেদা জিয়ার সরকার এই টাস্কফোর্সের একটি কার্যনির্বাহী কমিটি গঠন করে। ১৯ জুন ২০০৬ তত্ত্বাবধায়ক সরকার এই কার্যনির্বাহী কমিটি পুনর্গঠন করে।

আমি স্মরণ করতে পারি, ২৯ জানুয়ারী প্রধানমন্ত্রী ক্ষমতা গ্রহণ করার একমাসের মাঝেই আমি প্রধানমন্ত্রীর সাথে দেখা করেছিলাম। তাকে আমি অনুরোধ করেছিলাম, তিনি যেন তার সময়ে গঠন করা ও তার নেতৃত্বে পরিচালিত জাতীয় টাস্কফোর্সকে সক্রিয় করেন। তিনি তখন আমাকে বলেছিলেন-প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বাধীন টাস্কফোর্স সক্রিয় করে লাভ হয়না। বস্তুত প্রধানমন্ত্রীর সময় হয়না এবং আলটিমেটলি টাস্কফোর্সের সভাই হয়না। এটি সত্য যে, বেগম খালেদা জিয়ার আমলে পাচ বছরে মাত্র দুটি সভা হয়েছিলো। কিন্তু শেখ হাসিনার আমলে অবস্থা ছিলো ভিন্ন। তিনি এই টাস্কফোর্সের সভা আহ্বান করতেন ঘন ঘন এবং সেখানে বিষয়গুলো খুবই গুরুত্ব দিয়ে আলোচিত হতো। আমি তাকে সেই কথা স্মরণ করিয়ে দিই। তিনি আমাকে শুধু বললেন, দেখি চিন্তা করে, আগে ইয়াফেস (বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী) কতোটা কি করতে পারে দেখা যাক, পরে না হয় টাস্কফোর্স নিয়ে চিন্তা করা যাবে, যদি ইয়াফেসকে সহায়তা করার দরকার হয়। তখন আমি আর কথা বাড়াইনি। সরকারের আট মাস পার হবার আগেই যখন নির্বাহী পরিষদের সভা আহ্বান করা হলো তখন বুঝতে অসুবিধা হলোনা যে শেখ হাসিনা এই কমিটিটিকে কার্যকর করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছেন।

আমি আনন্দিত হয়েছি, তার এই সিদ্ধান্তের জন্য। কারণ তিনি ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করার বা বাংলাদেশকে ডিজিটাল বাংলাদেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হলেও সরকারের কোন সংস্থাটি এই কাজটির সমন্বয়, পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের পেছনে কাজ করবে তা এখনও ঠিক হয়নি। সরকার গৃহিত আইসিটি নীতিমালায় সেই নীতিমালার স্বত্ত্বাধিকার ও দায়িত্ব বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়কে দেয়া হয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন দেখা দিয়েছে যে, সরকারের অন্য সকল মন্ত্রণালয় কি একজন প্রতিমন্ত্রীর নেতৃত্বাধীন এই মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা বা সুপারিশ বা সমন্বয় মানতে চাইবে? আসলে তারা কি সেটি মানছে? বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় কি অন্য মন্ত্রণালয়গুলোকে সেভাবে সম্পৃক্ত করতে পারছে? এছাড়া ডিজিটাল বাংলাদেশ একটি মন্ত্রণালয়ের বিষয় নয়। সরকারের সকল মন্ত্রণালয় এর সাথে জড়িত।

বাস্তব অবস্থা হচ্ছে, সকল সচিব মুখ্য সচিবের কথা শুনতে পছন্দ করেন। এমনকি সকল মন্ত্রী প্রধানমন্ত্রীর কথা পছন্দ করেন। সেই অবস্থায় সকল মন্ত্রণালয়কে সম্পৃক্ত বা সক্রিয় করার জন্য প্রধানমন্ত্রী এবং তার সচিবারয়কেই কেন্দ্রবিন্দুতে কাজ করতে হবে।

ডিজিটাল বাংলাদেশ একটি জাতির স্বপ্ন এবং রূপকল্প। সেই স্বপ্নটি প্রধানমন্ত্রীর দ্বারাই বাস্তবায়নের বিষয়। একজন প্রতিমন্ত্রী তার মন্ত্রণালয়কে নিয়ে এই প্রসঙ্গে কি এবং কতোটা কাজ করতে পারবেন সেটি নিয়ে বার বার প্রশ্ন ওঠছে। তার সকল আন্তরিকতা এক সময়ে চড়ায় আটকে যেতে পারে। বিভিন্ন মহল থেকে বারবার একথা বলা হচ্ছে যে, এজন্য ডিজিটাল বাংলাদেশ সচিবালয় প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে, যেটি সকল মন্ত্রণালয়ের কাজের তদারকি করবে। এই সচিবালয় মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন করবে, বাস্তবায়নের জন্য তাগিদ দেবে এবং পুরো কমকাণ্ড মনিটর করবে। আমরা শ্রীলঙ্কায় এমন একটি অবস্থা দেখে এসেছি। ২০০২ সালে শ্রীলঙ্কা ই-শ্রীলঙ্কা কর্মসূচী গ্রহণ করে এবং সেই কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য আইসসিটিএ নামক একটি সংস্থা স্থাপন করা হয় যার চেয়ারম্যান প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করেন।

আমিও মনে করি যে, ডিজিটাল বাংলাদেশ সচিবালয় প্রধানমন্ত্রীর অধীনে থাকবে এবং সেখান থেকেই ডিজিটাল বাংলাদেশ কর্মসূচি বাস্তবায়িত হবে। এজন্য এমওএসআইসিটির সাথে কোন বিরোধ দেখা দেবেনা। বরং আইসিটি নীতিমালায় এই মন্ত্রণালয়ের যে ৯৪টি কাজ রয়েছে এটিই তাকে সম্পন্ন করতে হবে সবার আগে। একই সাথে আমি মনে করি, যতোদিন পর্যন্ত এমন কোন ব্যবস্থা গড়ে ওঠবেনা ততোদিন পর্যন্ত এমওএসআইসিটির পাশাপাশি জাতীয় আইসিটি টাস্কফোর্স সমন্বয়ের কাজ করবে। যেহেতু টাস্কফোর্সের একটি নির্বাহী পরিষদ রয়েছে সেহেতু প্রধানমন্ত্রীর নিজের সভাপতিত্বে বছরে একটি বা দুটি সভা হতে পারে। অন্যদিকে টাস্কফোর্সের নির্বাহী পরিষদ মাসে অন্তত একটি সভা করতে পারে। এর অধীনে একটি সচিবালয় থাকতে পারে যে সচিবালয়ের দায়িত্ব হবে ডিজিটাল বাংলাদেশ কর্মসূচির বাস্তবায়নে পরিকল্পনা প্রনয়ন, অনুমোদন ও বাস্তবায়নে মনিটরিং করা।

মাত্র দুটি মহাপ্রকল্প ও কিছু উদ্যোগ: ডিজিটাল বাংলাদেশ ঘোষণা দিয়ে সরকার প্রতিষ্ঠিত হবার পর এই ঘোষণা বাস্তবায়নের জন্য উদ্যোগের অভাব নেই। নানা জন নানাভাবে কাজের তালিকা বা উইসলিষ্ট তৈরী করছেন। যদিওবা বাস্তবানুগ তেমন ভালো কোন পরিকল্পনা এখনও আমাদের চোখে পড়ছেনা, তবু আমি এদেরকে সমন্বিত করার জন্য উৎসাহিত করতে চাই। কারণ একটি সুনির্দিষ্ট কেন্দ্রবিন্দু ব্যতীত এসব পরিকল্পনা কোনভাবেই ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়তে সহায়তা করবেনা। বরং অনেক ক্ষেত্রেই বিভ্রান্তি তৈরী করবে।

আমরা লক্ষ্য করেছি যে, প্রধানত সরকারের পক্ষ থেকেই ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের কথা বলা হচ্ছে। অন্যদের কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করারও কোন সুযোগ নেই। কারণ সরকার অন্যদের করণীয় সম্পর্কেও স্পষ্ট করে কিছু বলতে পারেনি। আমরা এর আগে সরকারের সবচেয়ে বড় যে পরিকল্পনা, বলা যায় মহাপরিকল্পনা, সেটি অর্থাৎ তথ্যপ্রযুক্তি নীতিমালা ২০০৯ নিয়ে আলোচনা করেছি। বলার অপেক্ষা রাখেনা যে, এই নীতিমালাটি আসলে ফখরুদ্দিনের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের তৈরী করা এবং এতে কেবলমাত্র কসমেটিক সার্জারী করেই এই সরকারের হাতে অনুমোদিত হয়েছে। এটি অনেকটা স্বাধীনতাউত্তরকালে পূর্ব পাকিস্তান স্টাম্পের ওপর বাংলাদেশ সীল দেবার মতো। এই নীতিমালাটিতে বিস্তারিতভাবে ৩০৬টি কাজের মধ্য দিয়ে ডিজিটাল বাংলাদেশ কর্মসূচী বাস্তবায়নের বিষয়টির কথা বলা হয়েছে। এতে উদ্দেশ্য-বিধেয় যা ছিলো তাতে কেবল ডিজিটাল বাংলাদেশ শব্দ দুটি যুক্ত হয়েছে। কিন্তু আমরা আমাদের আলোচনায় এটি স্পষ্ট করে বলেছি যে, এসব কর্মপরিকল্পনায় বেশ কিছু ডুপ্লিকেশন আছে এবং কাজগুলোর অগ্রাধিকার নির্দিষ্ট করা নেই। সবচেয়ে বড় কথা, এর মাঝে রাজনৈতিক অঙ্গীকারটি নেই। এছাড়াও সবগুলো কাজই প্রায় বিচ্ছিন্নভাবে পরিকল্পিত। এর ফলে আমরা তথ্যপ্রযুক্তিতে এগিয়ে যেতে পারলেও লক্ষ্যহীন গন্তব্যে পৌছাতে পারি যা ডিজিটাল বাংলাদেশ হবেনা, হয়তো অন্য কিছু হবে। ১৯ আগস্ট ২০০৯ সর্বশেষ আইসিটি টাস্কফোর্সের নির্বাহী পরিষদের সভায় যে কার্যপত্র দেয়া হয় তাতে কিছু কর্মপরিকল্পনাকে অগ্রাধিকার হিসেবে তারকাচিহ্নিত করা হয়েছে-কিন্তু যেটি আমি লক্ষ্য করেছি সেটি হচ্ছে সমন্বয়হীনতা। আমি মনে করি, এতোসব শত শত কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের আগে সরকারের কিছু অগ্রাধিকার নির্দিষ্ট করা দরকার। আমি সরকারকে কেবলমাত্র দুটি মহাপ্রকল্প ও কিছু অবকাঠামোগত কর্মকাণ্ডকে অগ্রাধিকার দিতে অনুরোধ করবো। অন্য সকল কাজের গতি তাতে দ্রুততর হবে। নীচে সেগুলো সংক্ষেপে বর্ণিত হলো:

ডিজিটাল সরকার ॥ একটি মহাপ্রকল্প

ডিজিটাল বাংলাদেশের দুটি বিশাল স্তম্ভের একটি ডিজিটাল সরকার। যতোক্ষণ সরকার ডিজিটাল না হবে ততোদিন ডিজিটাল বাংলাদেশের কথা ভাবাই যাবেনা। ফলে সরকারকে ডিজিটাল বাংলাদেশের গোড়াপত্তন করতে হবে ডিজিটাল সরকার দিয়ে।

ঢাকা শহরের তোপখানা রোডের প্রধান সচিবালয়, শেরে বাংলানগর ও অন্যান্য এলাকায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা সরকারী অফিস ও সচিবালয়সমূহসহ সকল সরকারী প্রতিষ্ঠান, বিভাগ, সংস্থা ও সরকারী আধা সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং দেশের বিভাগ, জেলা, উপজেলা, উন্নয়ন কেন্দ্র, ইউনিয়ন পরিষদ, গ্রাম বা ওয়ার্ড পর্যন্ত বিস্তৃত স্থানীয় সরকারসহ পুরো সরকারটিকে একটি স্থায়ী ও নিরাপদ ফাইবার অপটিক্স/ওয়াইম্যাক্স/ওয়াইফাই/থ্রিজি এবং ভিওআইপি ফোনের নেটওয়ার্ক ব্যবস্থার আওতায় আনতে হবে। এই কাজটির জন্য একাধিক সংস্থা বা পদ্ধতি জড়িত থাকলেও পুরোটি হতে হবে একটি সমন্বিত নেটওয়ার্ক।

এটি বাস্তবতা যে, কোন মহাপরিকল্পনা ছাড়াই দেশে এখন নানা ধরনের নেটওয়ার্ক বা কানেক্টিভিটি রয়েছে। নানা সংস্থা এসব তৈরী করছে। নানাজন এর স্বত্তাধিকারী। সরকারের প্রথম কাজটি হলো, সেইসব কানেকশন বা নেটওয়ার্কের বিদ্যমান অবস্থা জরীপ করে বিদ্যমান অবকাঠামোর কতোটা ব্যবহার করা যায় তা নিশ্চিত করা এবং সরকার একেবারে নিজস্ব নেটওয়ার্ক তৈরী করবে, না বেসরকারী অবকাঠামো ব্যবহার করবে সেটিও নির্ধারণ করা ।

ইতিমধ্যে বিদ্যমান নেটওয়ার্কসমূহের বাইরে টিএন্ডটি মন্ত্রণালয় পাচ বছর মেয়াদী ইনফোবাহন নামের একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। পাচ বছর মেয়াদী এই প্রকল্পটি দেশের বিরাট অংশকে যুক্ত করবে। অন্যদিকে বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় বাংলা গভ নেটওয়ার্ক নামে একটি প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য উদ্যোগ নিয়েছে। প্রকল্প দু'টি একই ধরনের এবং এই কর্ম-পরিকল্পনা দুটি বাস্তবায়নের ফলে প্রস্তাবিত নেটওয়ার্ক ব্যবস্থা স্থাপিত হবে। ফলে এই দু'টি প্রকল্পের মাঝে ডুপ্লিকেশন করা যাবে না। বরং যেসব স্থানে ইনফোবাহন নেটওয়ার্ক তৈরী হচ্ছে সেসব স্থান ব্যতীত অন্যত্র বাংলা গভ নেটওয়ার্ক স্থাপন করতে হবে। বরং দুটি প্রকল্পকে একটি মহাপ্রকল্পে রূপান্তর করা যেতে পারে।

সরকারের প্রস্তাবিত এই নেটওয়ার্কটি কেবলমাত্র হার্ডওয়ার হবে না-এতে সরকার পরিচালনার জন্য উপযুক্ত সফটওয়্যারও থাকতে হবে। সফটওয়্যারটিকে সম্পূর্ণভাবে বাংলা ভাষা কম্প্লাটিবল হতে হবে। এই প্রকল্পের অধীনে উল্লেখিত সকল প্রতিষ্ঠানে তথ্যপ্রযুক্তির সকল সামগ্রী স্থাপনের ব্যবস্থা করতে হবে। এজন্য ইনফো বাহন ও বাংলা গভ নেটওয়ার্ক প্রকল্পকে একটি মহাপ্রকল্পে রূপান্তর করে একে দীর্ঘমেয়াদী করে তার পরিধি আরও সম্প্রসারিত করতে হবে এবং মোট তিনটি স্তর বিন্যাস করতে হবে।

এই মহাপ্রকল্পের এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ সকল প্রকল্পের প্রথম স্তরটি হবে ২০১৪ সালের এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহ অবধি পরবর্তী জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠান ও নতুন সরকার দায়িত্ব গ্রহণ করার পূর্ব পর্যন্ত বিস্তৃত হবে। বিদ্যমান শাসনতান্ত্রিক কাঠামোতে এই সরকারের মেয়াদ শেষে তত্ত্বাবধায়ক সরকার দায়িত্ব গ্রহণ করার ফলে নির্বাচন ও নতুন সরকারের দায়িত্ব গ্রহণ ২০১৪ সালের এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত বর্ধিত হতে পারে। প্রথম স্তরে সরকারের অবকাঠামোগত সংযুক্তিকরণ ও অন্তত জেলা পর্যায়ের অফিসগুলোকে সম্পূর্ণভাবে ডিজিটাল করতে হবে। উপজেলা বা তার নীচের পর্যায়ের কিছু কাজও এই স্তরে থাকতে হবে।

মহাপ্রকল্পের দ্বিতীয় স্তরটি হবে ২০১৪ সালের এপ্রিল থেকে থেকে ২০১৯ সালের আগস্ট পর্যন্ত এবং তৃতীয় স্তরটি ২০১৯ এর আগস্ট থেকে থেকে ১৬ ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত। দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজটি গ্রাম পর্যন্ত বিস্তৃত হবে। তৃতীয় পর্যায়ে শুধু যেসব কাজ দ্বিতীয় পর্যায়েও সম্পন্ন করা যাবেনা তা সমাপ্ত করতে হবে। বস্তুত দুটি স্তরেই এক দশকে সকল কাজ সম্পন্ন করার পরিকল্পনা নিতে হবে। এবং যেহেতু আমরা কোন কাজই যথাসময়ে শেষ করতে পারিনা সেই কারণে তৃতীয় স্তরটি ব্যাকআপ হিসেবে থাকবে।

প্রথমত এটি হচ্ছে ডিজিটাল সরকারের অবকাঠামো। এই নেটওয়ার্কটি সরকার ব্যবস্থাকে একটি দেশব্যাপী জালের মতো ছেয়ে ফেলবে। সরকারের সকল কাজ এই নেটওয়ার্ক ব্যবস্থায় সম্পন্ন হবে এবং একটি সমন্বিত ও মানসম্মত এপ্লিকেশন প্রোগ্রাম দিয়ে পুরো সরকার কাজ করবে। এই ব্যবস্থায়, ভয়েস, ডাটা, অডিও এবং ভিডিও পারাপারের সমন্বিত ব্যবস্থা থাকবে। এই ব্যবস্থায় বর্তমানে বিদ্যমান সকল প্রযুক্তির সুযোগ নেবার পাশাপাশি ভবিষ্যতে আসতে পারে এমন প্রযুক্তি গ্রহণ করা বা বিদ্যমান ব্যবস্থাকে আপডেট করার ব্যবস্থা থাকবে।

ডিজিটাল সরকার ব্যবস্থার মাঝে ডিজিটাল ভূমি ব্যবস্থা, ডিজিটাল স্থানীয় সরকার ও উন্নয়ন ব্যবস্থা, ডিজিটাল বিচারব্যবস্থা, ডিজিটাল আইনশৃঙ্খলা ব্যবস্থা, ডিজিটাল দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, ডিজিটাল পরিচিতি ব্যবস্থা, ডিজিটাল স্বাস্থ্যসেবা, অটোমেটেড কর, ভ্যাট ও রাজস্বব্যবস্থা, ডিজিটাল অর্থব্যবস্থা, ডিজিটাল পরিবহন ব্যবস্থাপনা, সামাজিক সেবা ইত্যাদি সকল বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকবে এবং সরকারের প্রতিটি মন্ত্রণালয় মূল মহাপরিকল্পনার আলোকে তাদের নিজস্ব কার্যক্রম বাস্তবায়ন করবে।

একই প্রকল্পের আওতায় বিদ্যমান সকল সরকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে কম্পিউটার শিক্ষিত করতে হবে এবং বিশেষত সরকার তার নেটওয়ার্কে যে পদ্ধতিতে কাজ করবে তাতে প্রশিক্ষিত করতে হবে। একই সাথে ২০১০ সাল থেকে সরকার কম্পিউটার শিক্ষিত নয় এমন কাউকে রিক্রুট করবে না- এমন সিদ্ধান্ত কার্যকর করবে।

ডিজিটাল সরকারের একটি বড় লক্ষ্য হবে জনগণের দোরগোড়ায় সেবা পৌছানো। সরকারের কাজ ডিজিটাল পদ্ধতিতে সম্পন্ন হলে এবং সরকারের তথ্য ডিজিটাল পদ্ধতিতে থাকলে গ্রাম পর্যন্ত সকল সেবা সরকার ইন্টারনেটের মাধ্যমে বা ডিজিটাল পদ্ধতিতে দিতে পারবে। সরকার তার নিজের একটি একক ওয়েব পোর্টাল তৈরী করবে। সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, অধিদপ্তর, সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের তথ্য ও সেবা এই পোর্টালে অন্তর্ভুক্ত থাকবে। জনগণ সরকারের এই একটি ঠিকানায় পৌছে সরকারের সাথে ইন্টারএ্যাকটিভ পদ্ধতিতে সেবাগ্রহণ করবে বা সরকারের কাজে অংশগ্রহণ করবে। তারা সেখানে ব্লগ লিখবে ও মতামত দেবে এবং সংশ্লিষ্ট স্থানে সে মতামত পৌছাবে।

সরকারের প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর বিভিন্ন সরকারী সংস্থার মাধ্যমে এই মহাপ্রকল্পটি বাস্তবায়ন করবে এবং এই দপ্তর থেকে সকল মন্ত্রণালয় ও বিভাগকে তাদের নিজেদের করণীয় নির্দেশ আকারে প্রদান করা হবে। সরকার সকল ক্ষেত্রেই একটি স্ট্যান্ডার্ড বা প্রমিত মান নির্ধারণ করে দেবে এবং বিদ্যমান সকল কম্পিউটারাইজেশনকে সরকারের এই মহাপরিকল্পনার সাথে সমতুল্য করার জন্য নির্দেশ প্রদান করবে।

ডিজিটাল শিক্ষা ॥ আরও একটি মহাপ্রকল্প: ডিজিটাল বাংলাদেশের জন্য ডিজিটাল সরকারের পাশাপাশি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজটি হবে ডিজিটাল শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলা। সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও প্রাথমিক গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় ডিজিটাল শিক্ষা ব্যবস্থার একটি মহাপ্রকল্প গ্রহণ করবে। ডিজিটাল সরকারের সময়বিন্যাসের মতো করে তিনটি স্তরে এই মহাপ্রকল্পটিও বাস্তবায়িত হবে। এই প্রকল্পের একাধিক লক্ষ্য থাকবে। একটি লক্ষ্য হবে, দেশের সকল ছাত্র, শিক্ষক ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার ও অন্যান্য ডিজিটাল ডিভাইস প্রদান করা। শিক্ষা মন্ত্রণালয় একটি মহা-পরিকল্পনার অধীনে প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার ল্যাব গড়ে তোলা ও প্রতিটি ছাত্র-শিক্ষকের হাতে কম্পিউটার প্রদানের জন্য কার্যকর ব্যবস্থা নিবে।

একই সাথে প্রকল্পের আরও কিছু কার্যক্রম থাকবে। কার্যক্রমগুলো হলো:

-পর্যায়ক্রমে শিক্ষার প্রথম স্তর (শিশু শ্রেণী) থেকে কম্পিউটার শিক্ষা বাধ্যতামূলক করতে হবে। এজন্য তিনটি পর্যায়ে কম্পিউটার ল্যাব গড়ে তুলতে হবে, শিক্ষক প্রশিক্ষণ দিতে হবে, কারিকুলাম তৈরী করতে হবে, পাঠ্যপুস্তক ও ডিজিটাল কনটেন্ট প্রণয়ন করতে হবে।

- পর্যায়ক্রমে শিক্ষা দানের জন্য তথ্যপ্রযুক্তি ক্লাশরুম পর্যন্ত নিতে হবে। এজন্য কম্পিউটার সরবরাহ করার পাশাপাশি পাঠ্য বিষয়ের ডিজিটাল কনটেন্ট তৈরী করতে হবে। দেশের সকল শিক্ষককে ডিজিটাল কনটেন্ট প্রস্তুত ও ব্যবহারের জন্য প্রশিক্ষিত করতে হবে। শিক্ষার বাহন হিসেবে টিভি, রেডিও ইত্যাদির পাশাপাশি ইন্টারনেট ব্যবহার করতে হবে।

-সকল ছাত্র-শিক্ষক ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিণামূল্যে ইন্টারনেট দিতে হবে এবং শিক্ষার ব্যবস্থাপনা, পরীক্ষা ও পাঠ্যবিষয় ইন্টারনেটভিত্তিক হতে হবে।

কৃষি-শিল্প-ব্যবসা-বাণিজ্য ॥ সরকারী সহায়তা ও বেসরকারী উদ্যোগ: ডিজিটাল সরকার ও ডিজিটাল শিক্ষাব্যবস্থা চালু হলে দেশের কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য ব্যবস্থায় ডিজিটাল প্রযুক্তির বিকাশ ঘটবে। এই খাতে প্রধান ভূমিকা হবে বেসরকারী খাতের। তবে এর জন্য সরকারকে আইন ও অবকাঠামো এবং লাইসেন্সিং পর্যায়ের কাজ করতে হবে। এই কাজে অন্তত দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ওপর আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি;

-ডিজিটাল পেমেন্ট ও স্বাক্ষরসহ ডিজিটাল বাণিজ্য ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে।

-তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি পণ্য ও সেবা রপ্তানীতে সর্বপ্রকারের সহায়তা করতে হবে ও এজন্য প্রয়োজনীয় মানবসম্পদ তৈরী করতে হবে।

অন্যান্য: -প্রতিটি নাগরিকের কাছে তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি সুলভ করতে হবে। গ্রামে ও শহরে, ধনী ও দরিদ্রে, পুরুষ ও মহিলায় বা অন্য কোন কারণে এর কোন বিভেদ থাকতে পারবেনা।

ওপরের আলোচনার প্রেক্ষিতে আমি মনে করি সরকারের কেবলমাত্র দুটি মহাপরিকল্পনা গ্রহণ করা দরকার এবং এর বাইরে কিছু সহায়তা উদ্যোগ দরকার। সেই উদ্যোগগুলোর মূল লক্ষ্য হবে বেসরকারী খাতকে সহায়তা করা। এই কাজগুলো করার জন্য ৩০৬টি কেন, আমরা হাজার হাজার ছোট ছোট পরিকল্পনা গ্রহণ করতে পারি। কিন্তু পরিকল্পনাগুলো যদি মহাপরিকল্পনার অংশ না হয় তবে ছোট ছোট কাজের কোন সুদূরপ্রসারী সুফল আমরা পাবোনা।

আমি লক্ষ্য করেছি যে, ডিজিটাল বাংলাদেশের নামে প্রণীত আইসিটি পলিসিতে আমরা সরকারের ডিজিটাল চরিত্র ও ডিজিটাল শিক্ষার বিষয়টিকে পাশ কাটিয়ে শত শত পরিকল্পনার কথা বলছি। এর ফলে মূল ফোকাসটি একেবারেই অকার্যকর হয়ে যেতে পারে।